১৬

১৯২৯-১৯৫০

যুবকমন্ত্রী আসন

চিত্র লুইয়েরী কলামাঝা
প্রকাশক:
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইবেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট
কলকাতা-৬

কপিরাইটঃ  শ্রীমতী লীলা রায় ১৯৬০

প্রচ্ছদপত্রঃ  শ্রীমতী লীলা রায়ের আকাঙ্ক্ষার অংশকরিত্বঃ  শ্রীমতী শীতা রায়

প্রথম সংবরণঃ
জ্যষ্ঠ—১৩৬৭

পাঁচ টাকা

মুদ্রকরঃ
প্রধানেকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
০৩, মাণিকভূলা স্ট্রিট
কলকাতা-৬
উৎসর্গ

প্রকৃতির পরিহাস

শ্রীমন্তেনেদ্রনাথ সেনপ্রথম বর্জনবর্জযু

মনপন্বনে ছুঁকানকাটা ও সবার উপর মানুষ সত্য

শ্রীমুক্ত যামিনী রায়কে

মনপন্বনে মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না ও বর্ষের ঘরের

পিসী কনের ঘরের মাসী

শ্রীমুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে

মনপন্বনে জল্লী দিলু ও অজ্ঞাতশক্ত

শ্রীমুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে

মনপন্বনে হাসনসখী

শ্রীমনন্দনুমার মৈত্রকে

যোগজালা

শ্রীগোপালদাস মজুমদার করকমলেশ

দূরের মানুষ

কবি কাশ্মীর গোষ্ঠ স্মরণে
<table>
<thead>
<tr>
<th>সূচী</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>হর্জনায়</td>
<td>যৌবনজালা</td>
<td>১</td>
</tr>
<tr>
<td>বালিকাবধূ</td>
<td>৩</td>
<td>১৯</td>
</tr>
<tr>
<td>পুজ্জাচরিত</td>
<td>এক্সুভির পরিহাস</td>
<td>২৫</td>
</tr>
<tr>
<td>১৭১ হেনরিয়েটা রোড</td>
<td>৩</td>
<td>৩৩</td>
</tr>
<tr>
<td>নজরবন্ধী</td>
<td>৪</td>
<td>৪২</td>
</tr>
<tr>
<td>গাথা পিঠের ঘোড়া</td>
<td>৫</td>
<td>৫৬</td>
</tr>
<tr>
<td>উপপাঠিকা</td>
<td>৬</td>
<td>৭১</td>
</tr>
<tr>
<td>স্ত্রীর দিনি</td>
<td>৭</td>
<td>৮৬</td>
</tr>
<tr>
<td>মনন্দর</td>
<td>৮</td>
<td>৯৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বিভূমিকা</td>
<td>৯</td>
<td>১০৬</td>
</tr>
<tr>
<td>চুপি চুপি</td>
<td>১০</td>
<td>১১২</td>
</tr>
<tr>
<td>নিমন্ন</td>
<td>যৌবনজালা</td>
<td>১১১</td>
</tr>
<tr>
<td>মন মেলে তা মনের মার্গ</td>
<td>মনপ্রবন</td>
<td>১২৬</td>
</tr>
<tr>
<td>হুকানকাটা</td>
<td>১৪০</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>খোঁজালি</td>
<td>যৌবনজালা</td>
<td>১৫৫</td>
</tr>
<tr>
<td>সবার উপর মার্গ সত্য</td>
<td>মনপ্রবন</td>
<td>১৭০</td>
</tr>
<tr>
<td>হাসনপাশী</td>
<td>১৭৮</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>জুধুমা দিলু</td>
<td>১৯২</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>বরের ঘরের পিসী</td>
<td>২০৪</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>অজাতশত্রু</td>
<td>২১৭</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>রূপদর্শন</td>
<td>যৌবনজালা</td>
<td>২২৮</td>
</tr>
<tr>
<td>নারী</td>
<td>২৪১</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>অপরা</td>
<td>২৪৯</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>যৌবনজালা</td>
<td>২৫৯</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>দূরের মার্গ</td>
<td>সংবোধন</td>
<td>২৭৫</td>
</tr>
</tbody>
</table>
এই সংকলনের শামিল

প্রকৃতির পরিবাস
প্রথম সংস্করণ ১৩৪১
বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৩

মনোরম
প্রথম সংস্করণ ১৩৫৩

যৌবনজাল
প্রথম সংস্করণ ১৩৫৭

দূরের মাহুষ
পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত
"পূর্বাশায় প্রকাশিত ১৩৫৭"

ছুঁকানকাট| পুস্তিকাকারে প্রকাশিত ১৩৫০

হাসনহী পুস্তিকাকারে প্রকাশিত ১৩৫২

নারী গল্পটির রচনাকাল ১৯৪২
ভাবনা

পতিচ্ছ বাহর বনলে লেখা “দু’জনায়” আমার প্রথম ছোট গল্প। বিলেতে খাঁকে ১৯২৯ সালে লিখিল। তারপর দেশে ফিরে এসে বালিকাবহুল।
সাংস্কৃতিক। তারপর “সত্যাগত এইয়াদি” উপন্যাস নিয়ে মেটে উষ্ট। তুলে যাই যে এ ছোট গল্পের কোনো দিন লিখিলি। বিখান হারিয়ে ফেলি যে ছোট গল্প আমার হাত দিয়ে হবে। বদুজ্বর অভিজ্বপ্লাবনের আমাকে আধুনিক দেখ। এবার লেখা হয় “প্রকৃতির পরিহাস” পর্যায়ের নয়টি ছোটগল্প। ১৯৩৩-৩৪ সালে।

এরপর আট বছর গল্পবিন্যাস। “সত্যাগতে” শেষ হয় ১৯৪২ সালে। বারো বছর ধরে দম রাখতে পারে একই তো কঠিন। তারপর চলিল “ম্যান অফ স্যাঙ্কশন” হবার দুমাঝে। লিখি কথন? তার জন্যে তাঁরি কথন? ছোট গল্পের আট উপন্যাসের চেয়ে কম কঠিন নয়। তার প্রস্ততি ভিন। ছোট গল্পের দাবী এমন যে চেরবের মতো অত বড় শিল্পী একথানিও উপন্যাস লেখেননি। তেমনি উপন্যাসের দাবী এমন যে ভাষিত্যভূষিত মতো মহাশিল্পীকে দিয়ে ছোটগল্প বড় একটা হলো না।

হঠাং একদিন “মন মেলে তেন মনের মাহুষ মেলে না” লেখা হয়ে গেল ১৯৪২ সালে। একদিন করে শুরু হলো “মনস্বর” পর্যায়। একে যেরূপায়া” পর্যায়ের বিদ্যাদাতা। আমার মনে হলো আমি পথ পেয়ে গেছি। বিশেষ করে “হ’কারাভাষা। আম হাসনকেভীতে। আমার জীবনশৈল বললে যায়। সেইজন্যে সাহিত্যকর্ম। ভাষা ও শৈলী। ইচ্ছা করেই আমি গ্রিট ও চরিত্র উদ্ভাবন বর্জন করার কথা। ঔষধ্য বর্জন করি। সমাজসংস্কারে প্রভূতি উদ্দেশ্য বর্জন করি। এক একটি গল্প ভূরিপরিমাণ ভাষার উপর প্রভূতি।

এটি ঠিক সমাপন নয়। একাডেমি। ১৯২২ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত লেখা সব গল্পই আছে এতে। শেষেরটি সংযোজন, আমার সব পূর্বে গ্রিথিত। এখানে বলে রাখি যে “দূরের মাহুষকে বন্ধু বন্ধনের ছোটগল্প বলে বীকার করতে নারাজ। আসলে এটি একটি ভাষাকাহিনী। কিছু একটি সংস্কার করলেই
গল্ল হয়ে ঝাড়ায়। সেটাকো আমি আর করলুম না। “বালিকারাঘুৌ”কে
সাহুভাষার অবতারনমূলক করেছি। এইপর্যন্ত আমার সংখ্যারচেটা। কবি
কাজ্জিচন্দ্র ঘোষ আমাকে নিষেধ করেছিলেন এক বছরের রচনা ভেঙে আরেক
বছরের করতে। তিনিই আমাকে আমার প্রথম ও দ্বিতীয় গল্লের সমান
হেন। তাকে স্পর্শ করি।

শাস্তিনিকেতন,
৯ই বৈশাখ ১৩৬৭

আল্লাহকান্দল রায়
গোপী

১২২৯-১২৫০
হুঁজ্জাহার

১

সেদিনও এমনি একটি বসেছিলুম, পড়ার বইখানি কোলের উপর পড়েছিল, কিন্তু তার উপর চোখ পড়েছিল না। কান্দিলুম আর একজনের কথা, অজ্ঞ যেমন ভাবিছি। মনে হচ্ছে, মিলনের পূর্বে আর অপরাধ বুঝাই সমান ব্যাঙ্কের ছালছল।

টেলিফোনের ঝটিতে বেল। সকালবেলা তার চিঠিও পাইনি, ফোনও জুরিন। সকালের আলো তুলিয়ে সিমিয়ে পড়েছে। কে আমার কার ফোন! গা তুললুম না। মিলে ফিশার বুঝিকে তার কাছে কিংবা মুদি স্বর্ণ করছিল ভেবেছিলুম। কিন্তু রুদ্রে ভেকে বললে, "মিটার চৌধুরী, তোমার সেই বড়ুনী।"

"সেই বড়ুনীটির জন্য মিটার চৌধুরীর কিছুমাত্র মাধ্যমে ছিল না। কেন যে তিনি এ হল্কাহল্ক মাঝে মাঝে আপ্যায়ন করেন তিনিই জানেন। কোন পদে নম্বর নেটপাতে ফোনের বিসিভার কানে তুলে নিলুম। কান্টাকে রাখিয়ে নিয়ে কে যে কথা বলে গেল, বুঝলুম। অর্থাৎ কে তা বুঝলুম, কী তা বুঝলুম না। বাচ্চা গেল যে, "সেই বড়ুনী" নন। ইনি ফিশ ফিশ করে কথা বলেন না। ইনি কথা বিত্রে যেন কান মলে দেন।

বাকে লেখার জন্য এত বায়ে ছিলুম, সে যে কী বললে, তা শোনার বৈধ ছিল না। তোমার প্রশ্নের উত্তরে একটা করে "হা" দিয়ে গেলুম। বললুম, "হা, আজ বিকেলে তুমি যেখানে নিয়ে যাবে দেখানে যাব।" গেলুম যখন তখন গোয়ে ছিল অর্থক্ষাটা টেলিফোনের পোশাক, অর্থক্ষাটা মায়াবালি। আর হাজে একবার "কাননসিন্স তমসন।" বাড়ি চারটের সময় অমূল অপরাধের যেখা করবার কথা। অমূল অপরাধের পায়চারি করে গিয়ে দেখতে লাগলুম, যদি তাকে দুর থেকে দেখতে পাই। তবে মনে বড়ুনির ভাবার শান দিয়ে থাকলুম।

আঁধার মাইল দূর থেকে অবশেষে দেখা গেল কে একজন অজ্ঞাত আসছেন। এত ঘোরে ঘোরে পা ফেলছেন, যেন ধান ভাঙছেন, আর এত
গল্প

ঘরে ঘরে, যখন প্রতি বারে দুপুর ভিক্ষা দিওয়া হয়ে ছিলে। খাবিকটে কাঁচে যখন এলেন তখন দেখি হাটে একটা বেড়ের ব্যাপ রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে ছিনিয়ে নিলুম। বললুম, “কত দেরি করেছ, জানেন?”

সে একটা ফাঁকিরিয়া দিল। দু'জনে দিলে খেটের অভিযুক্ত ছটলুম। পথে খেয়ে দেয়ে বললে, “তোমার সঙ্গে কিছুই আসলেনি কেন?”

আমি বললুম, “এর বৈষ্ণব কি আনন্দুম?”

সে বললে, “তোমাকে বেধ হয় অন্য একটা বাড়িতে রাত কাটাতে হবে। এক বাড়িতে ছুটো। ঘর পাওয়া যাবে না।”

আমি বললুম, “ব্যাপার কি? রাতে ফিরে আসব মিসেস ফিশারকে বলে এলেছি যে।”

“এ কেমন কথা? তখন না বলে আমার সঙ্গে সোমবার অবধি উইকেতে আসছ?”

“টিক জন্যে পাইনি বেধ হয়। তেবেহিলুম তোমার সঙ্গে আলোচনা করে ফির করব।”

“এখন—”

“এখন এই বেশই যেতে রাজি আছি। কোথাও একটা ফোন করে বুড়োকে বলে দিতে হবে আজ রাতে ফিরব না।”

“সঙ্গে কিছুই যে নাওনি। অন্যত একটা টুথব্রাশও তো দরকার।”

“তোমার টুথ পেন্টের খাবিকটা দিয়ো।”

“এক বাড়িতে থাকলে তো। তার চেয়ে বরং রাজায় কিনে নিয়ে। একটা।”

রাতের পোশাকের নাম মুখে আলোক না। বললুম, “একখানা ছুর কিন্তু অবন্নক দরকার কাল সকালে। বাড়ির কেউ দেখে না? কিংবা কাছে কোথাও নামিত পাব না?”

“পাগল! চারার বাড়ি বাছু থেকায় নেই। আর গ্রাম কিংবা শহর সেখানে কোথায়! ফার্ভ হাউস!”

আমি বললুম, “তবে দেখা যাক কি হয়।” এই বলে “ফ্রানসিস টমসন” খুলে বললুম। এতক্ষণে আমরা খেটে উঠে রেখেছি। বললুম, “বেশ মজা, না? কতকটা ইলেগিয়েন্সের মতো লাগছে।”

সে বললে, “মুর।”
চুক্তনায়

ওয়াটারলু সেটশনে মিসেস ফিশারকে কোন করতে করতে ট্রেন ছেড়ে দিল। অগামী ট্রেনের জন্য আপনাকে করবার ফাকে সে বললে, “টাকাও তো আমাদি। নাও এই যা দিছি। কী কিনতে চাও কি কিনে কেল।”

একথানা রাইটিং প্যাড কিনলুম। “ফ্রান্সিস টমসনের” সাথী। ট্রেনের বালি কামরা দেখে উঠলুম। কখন একটি মুক্ত উঠে পড়ছে। আতএব সামুদ্রিক কথাবার্তা। যুগকালে নেমে গেলে দুটি গ্রোট আরোহণ করলেন। তারা নামে নামেই অনেকের গ্রামে ভ্রমণ করলেন। অবশেষে অমরাই চেরে জন্য নামলুম।

সে বললে, “এবার কিছু ফ্রান্সিস টমসন পড়ে শোনাও।”

আমাদের ট্রেন এলে পড়ল। বই ও ব্যাগ নিয়ে আমরা যে কাশরাটার উঠলুম সেটাতে কে একজন বাঁধার শরণ মতো টের ও বাঁধিয়েলা। প্রথম বলেছিলেন। অন্তত লোক ভিড় করে চুকল। কিছুক্ষণ পরে সে বললে, “এই দেখ একটি হিলু। পাহাড়টা চক খড়িয়ে। যেখানে সেখানে বাগ উঠে গেছে। চক দেখতে পাচ্ছ না?”

“পাচ্ছি।”

“এই শোনো একটা কুকু ভা কুচ। শুনতে পাচ্ছ?”

“না।”

“থেমে গেছে।”

ভরকিং নেমে আমরা বাসঃ দর্শন। তার পাস্পার্টা ভক্তকে আমার হয়েছিল। উত্তর হাচের চিকটি। তখন স্থানটা বেঁধে গেছে, কিন্তু রোড বন চুপর বেলার রোদ। লীথিলের উপর দিয়ে গায়ে এছাড়া পথ দেখ বনের মধ্যে। তার চোখ কান গান করছ আত্যন্তে গাছ পাখি কুলা সেকে তমাই হয়ে গেল। “উভ পিজনের ভাক শনেছ তোমাদের ভারতবর্ষের কুকু বুঝি অনন্য ভাকে?”

“না, ভারতবর্ষের কুকু ভাকে কুউড়। একটা নেমেলুি। তোমাদের কুকু বলে কুউউ। দুটো নোট। আর তোমাদের উভ পিজন ভাকে কুকুটা। আমারের ঘুরুর মতো।”

“দেখ দেখ, বুঝে বেলা ফলু দিয়ে ছাওয়া। জমিটুলু যেন একখানি গলিচা।”

“জলের বর বর পাচ্ছ?”

“তা আর জন্মেনি?”
গল্প

বনের শেষে যেখানে পৌঁছল সেটার নাম মাইল-তে ক্রুট, কিন্তু শহর নেই, এখানে নেই। জলার ধারে একটি সরাই, নাম স্টিফান ল্যাঙ্গটান। সেখানে গাছ সরাইতে বসে আমার লোক গান করছে। কাহাকারি এক আপাতগাছ বলে আমারা কিছু দেখে। গ্রেন (prunes) খেলুম, আর কিছু কিসমিস। গোটাকুইক ওয়ালার ফাইল ডান। সাপের জল সরাইতে রেখেছিল। তবু তার হ'ল একটি লাভ লাভ করে মাথা তুলছিল না তা নয়। অবশিষ্ট অনেক তাকে দিয়ে বললুম, "জানে তো, শেষের কুঁড়েরা বা বলতা যে খার নে বছরে হাঙ্গার পাইও বা হুঁড়র বামী যেটা হেক একটা পায়।" সে মিটি হাসল।

জিনিসপত্থ হাতে ধরে ও বুলিয়ে আমরা উঠলুম। অনেক চাঁদাই উঁচুজাগের পরে আমাদের ফাহ্য হাঁড়ে পৌঁছানো। পথে একটি গ্রাম ফেলে হয়ে টেনিস বল দিয়ে ক্রিকেট খেললো। ফাহ্যগাছে যখন পৌঁছই তখন ভর ভরে। কিন্তু গোয়ুলর আত্মা বিগন্ননার মুখ চিহ্ন দেখাচ্ছে যখন আমার সীমিনার মুখ।

২

dবজায় টোকা দিকেই ভিতর থেকে দরজা খুলে গেল। মহিলাটির চলনে বললে চাহিনে কেমন এক ঘরের হিয়ে। যখন বুকের উপর পাশা চেপে রয়েছে। আমার সীমিনার বললে, "আমার বাবা-বাবি মির লাইনের আজ এখানে আসার কথা ছিল। তার অন্থে। তার বদলে আমি এসেছি। আমার এই বড়টি কে একান্ত দিতে পারেন কি?" মহিলাটি তেরে বললেন, "বেশ হয় পারব।"

মহিলাটি ঘর তৈরি করে চলে গেলে পর আমি পা চুড়িয়ে দিয়ে আলাম করে বললুম। বললুম, "দের পাওয়া গেছে ভালোই, নাইলে পারাহত্ত ভাল। নামা। করে আর-কোথাও ঘরের খোঁজে বেরোলে। আমার সাত্ত্বেও কুলোত না। হী, যেতুম বলে বাড়ি ফুটতে যদি একখানা। ট্যাক্সি করে আমাকে পাণ্ডার থেকে নামান। কিংবা একখানা এরোপ্লেন করে।"

"ছুঁড়ের বিষয় দশ মাইল না এটলে কোনোখানাই পাওয়া যায় না।"
“অগ্ন্যা তোমাকেই গোলাঘরে গাঠিয়ে তোমার ঘর আমি ভুল করতুম।”

এবার আমরা হাত মুখ ধুতে গেলুম। মহিলাটি আমাদের জন্য ভিড় রুটির বেশী আর কিছু যোগাড় করতে পারলেন না। সে ভিড় খায় না বলে মুখিলেই পড়ত যদি না। কোটাবন্ধ সারভিন বাড়িতে ধাক্ত। সে বললে, “তোমার জন্যে কোকোকো করতে বলেছি।”

আমি বললুম, “খালি ছুটুই সব চেয়ে পড়ছ।”

“তোমাকে না মিসেস নরউজ রোজ্জ রাতে কোকো খাইয়ে ঘুম পাবার তুলি?”

“ও বল অভ্যাসটা মিসেস ফিশার ছাড়িয়েছে। এবার খালি ছুট ধরেছি।”

“সেই ভালো। ফার্ম হাউসে খাটি ছুট পাবে, আর তাজা।”

সত্যই ছুটি ছিল সুন্দর। সে কিন্তু ছুট খায় না।

সাপায়ের শেষে খানিকটা বাইরে যেড়েছেন। আধার হয়ে আসছে দেখে সে বললে, “তবে উপরেই যাওয়া যায় আমার ঘরে।”

তার ঘর থেকে পশ্চিম আকাশের তখনো কিছু আত্ম দেখা রাখিল।

যত দূর চোখ যায় গাছপালা। ফার্ম হাউসের মাঠে একটা ঘোড়া চরতে চরতে স্বর হয়ে বাড়িয়ে রইল ঘুমের বোঝায়। কুকু তখনা ভাঙ্গিয়াছি।

সে বললে, “ছুটি কুকু।”

আমি বললুম, “একটা।”

রাকি বাড়ির কঠে হালকি সুর। বাতাস বয়ে আঁচলিল গাড়ি (gorse) এর স্বগুণ। ঘোড়াটা বসল। তার পরে গড়াগড়ি দিতে দিতে মড়ার মতো শুলা। আমরা এই উপকরণে কিছু পশ্চিম আলোচনা করলুম। একটা ব্যাঁচ ভাঙ্গিয়া কতক দূরে। একটা রিকি পোকা কিছু কাছে।

অন্ধকার যখন সবাইকে ঘুম পাড়ালে তখন সে বললে, “এবার তোমার ঘুমোনায় সময় হয়েছে।”

আমি ঠিক করে ফেললুম আর মায়া বাড়ার না। এই পর্যন্ত আমরা আমরা। এর পর থেকে সে সে, আমি আমি। বোধহই একটু কিছু গতিতে তার ঘর থেকে নিকটে হলুম। তাকে কোনো কিছুর অবকাশ না দিয়েই বললুম, “ওড়-নাইট।”

সে প্রত্য ছুটে এলো, আমার মাথাটিকে ছ’ হাতে ধরে, ছুই পালে ছুটি
চুল খেলো। আমি কুতক্ষত্র তারে তার বাহতে ভেঙে পড়লুম। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে বললুম, “আজ সারা সকাল। তুমি কী ভেবেছি আমি?”

“কী ভেবেছি?”

“ভেবেছি, আজ যদি তাকে না দেখি তো বাচব না। তুমি দিন দেখিনি। প্রায় দুই বছর” সে চুপ করে রইল। বললুম, “কোনো প্রাথমিক নিশ্চিত হয় না। একবার তাকে সাড়া মেলে।”

বিষয় নিতেই হলো। তবু মনটা তরি রইল। গাছ পাখি ফুল থেকে তার মন গোলাপ ফিরিয়ে এনে সে আমার গালে ধরে দিল। আমার ঘর যখন প্রেম তখন ঘোলা আমালা দিয়ে গোলাপের স্বাগ এবং আমার বিহানায় মিলিয়ে বাঁচিল। আমি দেখতে দেখতে ধুমিয়ে পড়লুম। তখন শেষের দিকে হাঁট হস্তিন পাড় কাঁকায় আমরা এলাম। মাহাদেবের দোয়ালাটাকে মায়া বলে উড়িয়ে দিলে আমরা একই ঘরে পাশাপাশি যায়।

সকাল উঠে প্রথম ভাবনা, দীর্ঘ মাঝো কেমন করে? মুখ ধোঁয়ার আঘাত যে সামান্য ছিল তাই দিয়ে কাজ চালাতে গেল। চুল আঁচড়াই কেমন করে? মোমবাতির সঙ্গে যে দেশলাইটা ছিল তার গোটা পাচ্ছে কাঠি মিলিয়ে চিনির মতো করলুম। কিন্তু দাড়ি কামাবার উপয়ে কিছুতেই খুঁজে পাইনি। সবকোন্দ নিচে নামলুম। পাওয়া জমিদারের তুলনিতে অন্য তথ্য মুরারীর ছানা। কিন্তু বলে দেয় বেড়ালাম ছিল। যিনি তুগ সঙ্গ তুমি থেকে ভিজিয়েছেন তারই ব্যাপার তত বেশী। বাড়ীটা অনেকক্ষণ উঠেছে। পাখিরা একজনের অর্থে কাজ বা অকাজ করে রেখেছে। ন'টা বাজে। তারা উঠেছে চারটের আগে। গোড়ুলির সঙ্গে।

সে নিচে নেমেই বলল, “তোমাকে একটা তুমুলন পাখির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। Yellow Hammer.”

জিজ্ঞাসা করলুম, “কেমন হয়েছে?”

“একবারেই যুথুতে পারিন। নতুন জায়গা বলেই বেধ হয় কেমন কেমন লাগল। এ বাড়িতে একটা থোকা আছে দেখেছ?”

“না। পুরুষ মাঝে এক আমি হাড়া আর কেউ আছে বলে তো মনে হয়নি।”

কালের সেই মহিলাটি আমাদের কেকফাস্ট দিয়ে গেলেন। পাক্তা, রাইস যা ছিল তা একেবারের মতো। বললুম, “তুমি যখন ভিড় থাকে না। এবং
ছুঁজনায়

বেকন যখন ছ’ঁজনায় যায় তখন ওটা তোমারই ভাগে গড়ে। তা ছাড়া অন্য নয়। মুঁড়ি তরলের লোকের মুখে রেখে না। আমাদের মুঁড়ি মুঁড়ি মুঁড়ি করে না।

সে আমাকে চা চেলে দিল। আমি তাকে রাস্তে় কিলামে জেলে। জেলের করে একটু বিশালে বেকন দিতে গেলে। উনটে আমারই পাতে কেলে দিলে। বললুম, “বেকন আমার ভালো লাগে না।”

“ওঃ, জানতুম না। আরেকে পেয়ালা চা?”

“না। তুমিই নাও।” সে আরো ছ’ পেয়ালা কমাবে নিলে। বললুম, “একটা কমলালের খাবে কমলালের খাবে।” চমৎকার কমলালের একটা।

“না। ফল আমি আগালা খেতে ভালোবাসি। রাত দশটায়।”

অগভূত। আমি সেখানে একলা।

ব্রেকফাস্টের পর তার ঘরে যাওয়া গেল ব্যাপ নিয়ে বাইরে যাবার জন্য। আচ্ছাদ। আমার মাথাটি টেনে নিয়ে কোথা থেকে একটা চিকির বার করে আঁচাড়া পুড় করে দিলে। “দেখ দেখি কেমন হবে সেখানে তোমাকে মীম মাথায়। কেন মীম মাথারো?”

বললুম, “মীম মাথায় চুল ওঠে। তোমার চুলের মতো শক্ত চুল নয় তা আমার। সিংহের কেপর তা নয়।” তার চুলগুলিতে নিয়ে নাড়া চালাতে প্রস্তুত বললুম। “আচ্ছা, আরেকটু লব্ধ চুল রাখো না কেন?”

“বয় করতে বয়লাছ।”

“আমিই বয়লাছ, কাজের রাম।” আমি তোমাকে দেখেছিলাম।

“না। এ হলো ষিঙ্গল। দাওকের কিনে আরেকটু লা ঘলে বয়লাছ।”

ভেবে বললুম, “এই ভালো। ষিঙ্গল ছাড়া আমি কিছুতে তোমাকে মানাবে না। অর্থাং আমি কিছুতে তোমার ক্যারিকটার ব্যক্ত হবে না।”

“কা নয়। আমার ষিঙ্গলালো কোনো মতোই বাগ মানবে না। লোহার শিরের মতো পো ও খাড়া থাকবে, সেইজন্যই বখাদিয়ে এখন করা।”

ব্রেকফাস্টের দেহকে গেলুম। গোটা পাচাকর পুষ্কায় গোটা। একটা নাদুমহুয়া খুঁড়ি। একটা ছেলে বয়ল চালিয়ে টার্মিন কুচি কুচি করিয়ে। অনেকগুলো! হেবে। টাব্লিয়ে মাটি পেরিয়ে লা। পাতা মাছিয়ে আমার বেলে ভিতর দিয়ে চলেছি। শহর থেকে উইকে গাটাতে এলে করা। সব মাঠের কোনে গাড়িরের ভিতরেই তাদের শোবার ঘর,
গল্প
খাবার ঘর, রান্না ঘর, কিন্তু দিন তালো ধাকলে তার। বাইরে চেয়েলে গেলে খায়, খেলা করে। আমি বললুম, “কারাভানেই যদি ধাকতে হবে তবে ফিসোরের মতো সমন্দ্ব ইংল্যান্ড ঘুরে বেড়ানো। উচিত। যেমন সেখানে নিন্দোল্লাস লুফিস বেড়িয়েছিলেন।”
নে বললে, “এরাও ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু এক বছরে সবটা নয়, প্রতি বছর একটা করে তারা খুরে। আগামী বছর এলেও কারাভানে আর এখানে ধাকতে না।”
আমার বনের ভিতর এক জায়গায় বসে পড়লুম। বসতে বসতে অঝ্মিন। পাইন গাছের তলায়। তার মাঝে ছায়ায় ফাটে সামান্তই, রোদ যার ভিতর দিয়ে পড়ে, এমন গাছের তলায়। গাছের উপর নয়, পাইনের ছোচের উপর বসতে তার তালো লাগে। বললে, “ফ্রানসিস টমসন পড়ে শোনাও।”
বললুম, “তোমার গলার খুঁট মিউট, তুমিই পড়ে। আমি বেছে দিই।”
ঝাউয়ে অথচ হেভন।
বললে, “বিষম বড়। ছোট নেই?”
বললুম, “আঁচল, দেওয়া।”
নে পড়ে চলল। যখন শেষ করল তখন আমি বললুম, “কয়েকটা লাইন যার হমর। না? এটা যেখানে বলছেন, ‘The rose’s scent is bitterness to him that loved the rose’ আর ‘We are born in others’ pain and perish in our own.’
“কাছেই ফ্রানসিস টমসন বাস করতেন। Meynellরা তাকে যত্নে রেখেছিলেন। বেচারার প্রথম জীবন কিন্তু বড় কষ্টে কেটেছিল। লালনের রান্নার রান্নায় দিন কাটিয়েছেন। রাতে নদীর বাঁধের উপর পড়ে ঘুমেন। কিন্তু সব অবস্থাতেই করিবার লিখতেন।”
“তবু ভাগ্য তালো বেঁচে ধাকতেই যাচ পেলেন। এখন তো যশ বাড়তে লেগেছে। যেখানে যাও সেখানে তার স্বখানি।”
“বড় অন্য্যাটিকল মানুষ ছিলেন। ভোলা মন। কখন কোথায় ঠিক করতেন—একবারে চেলিয়েছিলেন।”
“ওটা কবিরক্ষি। ব্যতিক্রম ঘটেছিল কেবল শেক্সিয়রের বা ভিকটর বাডের মতো মহাকবিদের বেলা। তাদের ব্যবসায় বুদ্ধিতা ছিল কবিরক্ষির মতোই জোরালো।”
“এখান দেখ ক’টা বেছেছে। উঠতে হবে।”

সাড়ে এগাছেটা। ওঠা গেল। চলতে চলতে কত কথা। একটা টাওয়ার। সেকালে যারা মানুষ এতদিন জাহাজের জিনিস ধরাতলে চালান বিত তাদেরই গড়া কিংবা তাদের ধরবার জন্যে গড়া। গোটাকুটি কমলালেরু কিনতে গেয়ে কিনলো। মাত্রতে বলে বহু দূরুখিত সমুদ্রের কিছু তাকালুম। সে বললে, “সমুদ্র ত্রিশ মাইল দূরে।”

আমি বললুম, “অন্ত না।”

প্রথম লেটুটি গ্রাম পাচ। সে বললে, “আর একটা খাও।” তাকে আর একটা খেতে বলায় সে কিছুতেই খেলো না। তখন সেটাকে বিতরণ করার জন্যে তুলে রাখলুম।

সে বললে, “কবি টিভিলিয়ানের নাম জানে নিশ্চয়। সেই যিনি গীতের বিষয়ে লেখেন। তার বংশের সবাই ভিড়ালো। বা পলিটিসমান। তিনি কিন্তু দৈত্যকুলের একজন। কেবল কবি না, গীতের কবি। বিদে করেছেন এক ভাষা চিত্রকরক। রন্ধ দম্পতী। এই গানাড়ের তলায় তাদের বাড়ি।”

রবিবার। লগন থেকে বহু লোক বেড়াতে আসছে। গাছতলায় বসে একটি স্ত্রী পুরুষ বনভোজন করছে। দুর্বীণ চোখে দিয়ে কেউ কেউ সমুদ্র দেখছে। কেবল সে মেহে চকলোটে ও কমলালেরু বিকি করছিল তার ছুটি নেই। বনের খানিটা কাটা গেছে অর্থাৎ যুদ্ধের বন্ধীদের দিয়ে। যুদ্ধের সময় নরওয়ে থেকে কাঠ আসা। বন্ধ ছিল বলে বনের সোঁবাল হৃদ।

সে কঠিন নয়নে চেয়ে রইল। যেন বনের ব্যাপ তারও ব্যাপ। কারা সব বনভোজন করে রাজিশ হাঁটতে গেছে দেখে তার যা রাগ। কেন ছোরা নিজেদের রাজিশ নিজেরা বাড়ি নিয়ে যায় না? ওদের গ্রেপ্তার করা উচিত।

আমরা পথ হাজিরেছিলুম। বীরে পথে গুরু ফিরে এক জায়গায় দেখি কতগুলি ছেলেমেয়ে গেছে চড়ছে ও গাছের তলায় খেলা করছে। আমার হাতের সেই কমলালেরুটাকে বিতরণ করার সময় এলো। তিনটি খুঁকির সামনে গিয়ে বললুম, “কাকে এই কমলালেরু দিয়ে বল তো?” একটি খুঁকি একটুও বিড়া না করে বললে “আমাকে।” তাকেই দিলুম। সম্ভবত তাকে অচ্ছন্ন করলে অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে যেতে। মজা এই কোন হাত বলতে ছুটি চার পাঁচ। তবু তার বাবার বলতে গেটার কমলালেরুটি।
পর্ব

খুঁটীদের কাছ থেকে গথের সম্ভাষণ বোঝাড়ে করে আবার সেই কারাভানওয়ালাদের মাঠ বেয়ে বাগায় ফেরা গেল। ছুটে বোঝাড়ে ছুটি খুঁটী কোন বেনা খাওয়াচ্ছিল, বোঝা ছুটি অর্থে মনোনগর সহজের বাচ্ছিল।

আমরা ফিরতেই খুঁটীকেই ডিনার দিয়ে গেলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা আরস্তু করে পারলুম না।

৩

রোট বীফ, ভাজা আলু, সিদ্ধ শাক। ভিম কাউটার্ক, জুজমেরী, কবর্ব।

সে খুব আগ্নে আগ্নে খায়। বকবক করবার অবসর আমাকেই বিশেষ।

আমি বললুম, “রেভেকা ওরেলেট এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, ‘মেয়েরা বড় বেশি ব্যক্তিভেদে হয়ে উঠছে। এটা কাম্য নয়।’ কিন্তু আমার মনে হয় পুরুষরাও যখন অভাবহীন বেশি ব্যক্তিভেদে হয়ে উঠছে মেয়েরাও না হয়ে পারে না। ভাইয়ের পক্ষে এক নিয়ম ও বোনের পক্ষে আরেক নিয়ম ধাট না। এই জলে ধাটে না যে ওরা একই মালমশলা দিয়ে তৈরি। বোনের মধ্যেও খানিকটা পুরুষ আছে, ভাইয়ের মধ্যে খানিকটা নারী।”

সে সেই বললে, “ভাই বোঝা হয় কেউ কেউ বলে থাকে রেভেলম যদি পুরুষ না হয়ে মেয়ে হতে। লাম রোটালিও হতে। মেয়ে না হয়ে পুরুষ তবেই তাদের ঠিক মানা না।”

“প্রকৃতি তো এগারো ঘটা ধরে সেই চেষ্টাই করে এসেছিল। এগারোটার সময় হাতাত তার হাত থেকে গেল, সব উল্টোপাট। হয়ে গেল। তোমার উপর ভুল করে খানিকটা নারীতের আরেক চেলে দিয়ে দেখে, সরনাশ! এবে পুরুষালি মেয়ে।”

“আমার, তুমি কি সত্যি মনে করে যে নারী হয়ে বা পুরুষ হয়ে কারাভান একটা আকারিক ঘটনা? এর পিছে বিদ্যাভূত অভিপ্রায় বা নিজের মন্ত্রামনি নেই?”

“একশোবার আছে। আমি ঠান্তা করছি না। নিচক ঠান্তও নয়। আমার কথা, আমাদের মধ্যে যেটি বাজিক। সেটি গভীরতর। যেটি নারী বা পুরুষ নেটি ভালোভাবে। আমি যে আমি এইটে আমার চরম পরিচয়। আমি যে পুরুষ এটা আমার শুণ।”
ছুঁজনায়

সে এবার আর একটি কবার্বের রস চেলে দিলে। যত বললুম, "আমার একটি কাস্টার্ড খাওঃ", খেলে না। ছ'ংটা পরে জনলুম আমার কথা না রেখে আমাকে বাচিয়েছে। কাস্টার্ডের ভিম তার মাথা ধরার কারণ।

খাওয়া শেষ হলে সে বললে, "আমি যাচ্ছি। একটি বোধ পোঁছাতে পোঁছাতে যুবমার। কাল রাতে যুব হয়নি।" এই বলে একটি বালিশ চেয়ে আনল। যেখানে গঙ্গের কাটা পড়ে গাছ থেকে নরমত চলে গেছে, যেখানে মাটি আরও গাছা ও আগাছা পরগাছা গায়ে ও গায়ে বোঝার মতো বিখ্যে সেইখানেই তার শোষার ইচ্ছা। আমি কিং অমন আরো হিসাবের বসতে পারব না, তাই অনেক ঘুরে তার ও আমার উদ্দেশ্যের রচি মিলিয়ে। অনেক কষ্টকে এক অধিক কাটাবন ও অধিক নরম জমি আবিষ্কার করা গেল।

আমার রাতিতে প্যাড়েখানকে উটেগালে দেখলে। দেখে বললে, "একাকো কবিতা লেখেনি যে। এই বলা লেখা বলে।" এই বলে বালিশ গুটে মাথা রাখলে। তৈবালুম সে আর কথা বলবে না, যুমিয়ে পড়বে, কিন্তু কেমন করে কী জানি তবে উঠল আমাদের ইহকালের অভিজ্ঞতাগুলো। আমারা পরকালে নিয়ে যাব কিনা। আমি বললুম, "কখনো না। অভিজ্ঞতার বোঝা। বয়ে নিয়ে গেলে সেই বোঝার ভাবে হুছে পড়ব, নতুন অভিজ্ঞতা কুড়োব কেমন করে?

সে বললে, "এত কষ্ট করে যা কিছু শিখলুম তার কিছুই যদি সত্য না নিলুম তবে শিখলুম কেন?"

আমি বললুম, "শিখলুম শেখানোর জন্য। নিলুম দেবার জন্য। জন্যের পরে যা কিছু হয়েছে মরণের আগে সব হওয়ার অগ্রে ধরে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে আমরা খালাস। দেহ বলে, মন বলে, মুখি বলে, শিখা বলে। ইহকালের কোনো হারী পরকালে ধারব নাও।"

সে ভীষণ অবাক হয়ে রহল। তার চিরন্তন হাসি মুখ থেকে নিবল না বে, তার চিরন্তন শিক্ষা-চেখ রক্ষনের পাঠালপুরীতে মুক্তা খুঁজতে নেমে গেল।

"কি ভাবছ?"

"ভাবছি তুমি যা বললে তা কি সত্যি?"

"কেন সত্যি নয়? মহুয়েরের বোঝা বয়ে কাহাতক আমরা অনন্তকাল চলব? এখনো কত হওয়াই বাকী। ফুল হতে হবে, ফুল হতে হবে, তারা?
একবার সে চোখ বুকে বললে, “ধামো। ঘুমোতে দাও। কাব্য লেখ।”

কাব্য লেখার ইচ্ছা আমার আলপণেই ছিল না। কাব্য ভোগ করতে এই বি হয়ে একে আমি যেতে যেত না আজ। তার মুখ সুখানির দিকে নির্দিষ্ট চেয়ে রইলুম। কোনো সমস্যা যেন শায়ি পাথর কুঁদে গড়েছে। নিলাম হয়ে শক্ত। চোখ ছুটি পদার্পণারকে মাত্র। বড় না, বড় নির্ভর। তার চরিত্রের দৃষ্টিত তা হলে কী সবে ব্যাখ্যা হবে?” ছুল দিয়ে।
শোক আর আসে না পা থেকে জুরতে ও মোজা খুলে ফেলেছিল। তার খালি পা দেখে মনে হচ্ছিল তার ঐ অঙ্গুলি যেন সবচেয়ে কড়ি।

তার ঘুম আসেনি রুষ্টতে পারছিলম। আবেদন জানালুম, “আমারও ঘুম পাওয়া”

সে বললে, “তবে জুরতে খুলে কেল তুমিও।”

আমার মাথার জলেই তাকনা, জুরোর জলে নয়। এ কথা তুলনামূলকে রুষ্টি বন্ধ বললুম। তখন বালিশের আর্দ্রতা ছেড়ে দিলে। সে বোধ হয় মিনিট দশশক ঘুমুতে পারলে। আমার ঘুম বন্ধ না। মুখ অকাশ, মেসহীন, দীর্ঘ নীল। বাতাসে ফুলের গম্বর। চোখ মেলে কত শুধু বোধ বদ্ধ থেকে যায়। ঘুমুতে আমার মাথা করছিল। মাথা মাথে ইচ্ছা করছিল তার চোখের উপর চোখ রেখে দেখি সে কি সত্যি ঘুমিয়েছে? তার ঘুমের নীল দেখতে দেখতে আমার এই কথাটি মনে হচ্ছিল যে সে সমস্ত সবার সঙ্গে ঘুমোয় না। সে ঘুমোয়, কিন্তু তার উত্তরে মুখ হাসি হেঁসে থাকে।

“আবার যার মতে। মনে হচ্ছিল আমি তার কত কাছে এসেছি। এক বালিশে মাথা রেখে মুখের কাছে মুখ আনা। সে যদি আমারই মতে মানুষ হয়ে থাকত তার বিপদ ঘটত। কিন্তু সে মনে আছে আমার প্রকৃতির পর।

কেমন করে সে রুষ্টতে পারলে আমার ঘুম আসে না, তাই তারও ঘুম এলে না। বোধ হয় তার অবস্থা বোধ হলো। কখন দেখি বালিশের উপর ছুটি হাত রেখে হাতের উপর মুখ রেখে আমাকে দেখছে।

বললে, “তোমার চূলগুলি যদি এই রকম থাকে তে আমার দেখতে ভালো লাগে।”
আমি খুশি হয়ে বললুম, “যে আজ্ঞে। কৌম কিনতে আমার যে খরচ নেটা তা হলে বীচবে।”

চায়ের সময় হলো দেখে আমরা উঠলুম। সে কিছু তোরের গায়ে মাথা মাঝে খেলে। আমি গোটা করে কোল। ফিকিতে ছিল না। আটিকার সময় লাগলে ফিরব, টাইমেট্রিক দেখতে টিক করে। গেল। সঙ্গে কিছু খাবার নেওয়া যাবে গৃহকর্মীকে বলে। ভরকিং একোন হজ একোন সাপার খাওয়া যাবে।

কিছুক্ষণের জন্য আমি উপরে গেছি যুগে। নিচে এসে দেখি আমার জিনিসের সঙ্গে পার্টি পড়ে আছে। পার্টি সে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল গৃহকর্মীর গ্রাম্য বিষয়ে দেখার অংশ। পার্টি আমি পকেতে পুর্লুম ছইয়ি সির মলিলে।

আটিকার সময় আমরা রানা। হব এটা হ্রস্ক করে বেড়াতে বেরোলুম। বজবার কাটাতে লাগুন থেকে অনেকে এসেছে। কেউ মোটর, কেউ মোটর সাইকেল, কারা সব পার্টি হেঁটে। এক কোম্পানির আড়ালে শেখের অপোরা অভিনয় চলেছে। একটি তরলী উচু মাটির উপর ধারিয়ে হও করে কী একটা গ্রেমের গান গাইছে। তার উত্তরে একটি যুবক নিচের মাটিতে ধারিয়ে আলিঙ্গনের অংশে হাত বাড়াচে ও গান গাইছে। দলের লোক হাততালি দিছে।

একটি তরলী রঙ কেবল বেঁধে পথ চলেছে, তার গলায় হাত অঁধি যাদে, তার সাধী হয়েছে একটি তরলী।

আমরা অনেক দলের কাছ দিয়ে অনেকের ভিতর দিয়ে অনেক ঘুরে ফিরে আবার এক কাটাতে বেড়ে অর্ধশান্ত হলুম। আমার আগ্নিভুক্তি প্রথমে সে না-মজুর করল, কেননা কাটাতের চেয়ে হরশর আর কী ধাক্কা পারে। পরে বললুম, “তোমার মতো। আমার গোশাক তে। পশমী খবর নয়, আমার এটা পাল্টা টিউড। গোশাক নয় হলে তুমি সাত গিনি দেবে কি?” তখন সে বলল, “তবে ও ঠা।”

তখন আমি এত হাসতে লাগলুম যে কারণ যুরতে না পেয়ে সে মহা মিলত

“ব্যাপার কি? আমার মধ্যে এমন কি দেখলে যেটা হাজাবার?”

“তোমার মধ্যে নাও হতে পারে।”

“তবে আমার জিনিসগতের মধ্যে?”

“বলব না। বলল বদ্ধি এক পাউড দিতে রাজি হও।”
“একপয়সাও না।”

“নশি নিন্দা।”

“এক কাওকাড়িও না।”

“আচ্ছা, আদান কাউন দিলেই চলবে।”

“না।”

“তবে হে হে। হে হে—”

আমার হাসির সাথে তার মুখের অবস্থাটা বিপদ বোধ হলো দেখে আমি কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বললুম “তোমার মতো মৃত্যুড়া। মানুষ পৃথিবীতে ক'জন আছে। যত রাজ্যের কাঠামো বেছে বেছে বসো কেন?”

তখন সে বলল একটা কিনারা গেল। তার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। সে বলল, “এর পর তুমি উইকেও এলে মিলেন নরউডকে এনে, আমাকে না।”

আমি জুড়ে দিলুম, “এবং টাকাসি করে তাকে হাওয়া খাইয়ে এবং গিনেমায় নিয়ে গিয়ে সিগারেট খাইয়ে।”

একবার সে বলল, “আমার সব চেয়ে কী ভালো লাগে জানেন? পাহাড় পর্বত পাথর। তার পরে গাছপালা কাঠামো। পথ আমার তেমন ভালো লাগে না, মানুষও না।”

আমি বললে ছিলুম, “মানুষই আমার সব চেয়ে ভালো লাগে, তার পরে পথ পাথুর।”

এইবার কেক্কা উঠল। সে বলল, “পাহাড়ের চূড়ায় যখন উঠ তখন সে যে কী অনন্য ওয়ার্ডে পারব না। এখন একটা sense of space আর কোথাও বোধ করিন। যেন পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবী থেকে যুক্তি লাগ করে।”

“আর কাঠামো বসে কী রকম sense বোধ করেন?”

“প্রাণের রোমাঞ্জন। অহরহ যে প্রাণ সঞ্চারিত পাওয়া হচ্ছে কাঠামো পৌঁছি যেন তাই সত্যতাকে জাহির করতে থাকে, তুলতে দেওয়া না।”

বাগায় ফিরে চললুম, পথ হারালুম। পথ হঁটে গেয়ে আঘাত হলুম। এত সোনা পথ হারিয়েছিলুম কী করে। ফার্স্টাইভে ফিরে যখন তাকে রয়েছি। করলুম কিছু খাবে যে না সে বলল, “ভাবেন মাথা ধরেছে।” যক্তি-জনিত মাথাব্যাহার। ওয়ুধ না খেলে সারবে না। ওয়ুধ কোথায় পায়! অপবাদ।
লজ্জায় না পৌঁছানো পর্যন্ত মাঝারী সাইতে হবে। উৎসবের সম্পন্ন অনন্য এক নিমেষে লজ্জা হয়ে গেল।

তাকে খুশি করলে যথি বেদনার কিছু লাঘব হয় এই ভেবে হাসি তামাশা চালালুম। চুরি করে সব তুলব পরের বাগান থেকে। পুলিশ এসে চ' অনাকে ধরে চালান দেবে। ওথে দিয়ে সোজা যেয়ে না গো। এই প্রণয়ী এলাকারের প্রেমাণপ {ব্যাঙ্গল হলে ওরা অতিশয় দেবে। দেখ, দেখ, পাচটার বীচ গাছ কেমন পাচ ভাইয়ের মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। অকরবার মতো।

বাসু কেনায়নাম সেখানে আমরা। আর ঘটা হাটিয়েলো বাসু প্রেজায় না। একক্ষণে তার মনে পড়ল পাস্টার কথা। "তোমাকে দিয়েছি?" অতি কাটি হাসি চাপতে লাগলুম।

আমার একটা পেটে চটে দেখলে। তার মুখ তুকিয়ে গেল। কুলিয়াকে উজ্জ্বল করে ডাঁড়াল। তার মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। "তবে কি ঐ বাড়িতেই ফেলে এসেছি? ব্যাপার?"

তার চেহারায় দেখে আমার ভয় করতে লাগল। পাছে মাঝারী বাড়ি। পাস্টার সে পন্তে ছিল সেইতে তার দিকে ফিরিয়ে দাঁড়ালুম। সে কী মনে করে পন্তে টিপল। পাস্টার সন্ধা পেয়ে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি আশ্চর্য হলুম। বললুম, "এবার বুলেল তো। কেন অত হাসিয়েছিলুম?"

"ও! এইজন্তে!"

"তখন আমাকেই দিতে রাজি হচ্ছিলেন না। এখন গোটা পাস্টারই আমার।"

অনেক দেরিতে যে বাসু এল। সেটা আমাদের চেন্নি কেল করিয়ে দিলে। সে বললে, "চলো তবে আমার বাড়ির মুরিয়েলের বাচ্চা যাই।" সে যদি ধুঁতো ঘর দেয় তো থাকা যাবে। নয়তো পরের চেন্নি লজ্জা।" তার মাঝারীর জন্যেই ছিল আমার মাঝারী। তাই সে যখন তার বাড়ির বাড়িতে আমাকে নিয়ে পৌঁছল তখন আমি আলাপ পরিচয়ের পর মুরিয়েলকে বললুম, "একক্ষণ এর জন্যে আছে তো ভালো। আমার ভয় ভাববেন না।"

মুরিয়েলের বদুম জে। আমাকে কাটাকাটি একটা হোটেলে নিয়ে চললেন।

সন্ধ্যা বললে, "আমার পাস' থেকে আমাকে সামাজ্য কিছু দিয়ে বাড়িটা তুমি রেখো।"
আমি তাকে খ্যাপোবার জন্মে বললুম, “তোমার পাস কিসের? আমার পাস থেকে তোমাকে কিছু দান করে বাকিটা আমি পকেটে পুলুম।”

তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় কিছু পরিহাস করবার মতো অবন্ধাও বিদায় নিল। সকলের সামনে অস্ত্রলোক ও অশ্রমচিহ্ন সাঙ্গত্যে হুলে, যদিও তার প্রেমিত মুখখানির দিকে চেয়ে আমার মনকে কেমন করছিল। সারা রাত তাকে মনে পড়েছিল যখন তখন মনকে এই বলে প্রেমিত বিচিত্র যে আমাদের চুর্ণনের দেহ যত দূরেই থাক আমাদের আম্বা তো অভিষ্য।

পরের দিন সকালে চুর্ণনে মিলে ওয়াটারলু ফিরে এলুম। তখনকার বিদায়টাই সত্যকারের বিদায়। কেননা দিনের কৌলাহলে ও কাজকর্তাদের মাঝখানে চুর্ণনের একত্রিত দখলের মতো অলৌকিক চোখে হলো।

(লগুন ১৯২৯)
বার্তা ক’র বধু

১

কাল রাতে ঘুমের ঘোরে কনক শনতে গেয়েছে কে বেন ছাদের উপর পায়চারি করছে। আজ সকালে দাড়ি কামাবার সময় সে-সব তার যথে গড়ল।

মেনকা! ছাদে ওঠার বাসনত মেনকার আছে বটে, কিন্তু নিজের রাতে। তুমি? তোমাকে কনক তাছিলের সঙ্গে অভিবাস করে। রাজিতে, তুমি মাছের সংসার, ছাদে যদি কেউ উঠে থাকে তো সে মেনকাই। অথবা কনকের অলীক কলন।

কনক যখন বাগানে এসে মেনকার প্রতীক্ষা করবে ভাবছে, সেখানে মেনকা গলে হাত দিয়ে যার উপর পা ফেলিয়ে বসছে। রাতের কাপড় ছাড়েনি। অবাক হবার কারণ ছিল কনকের। মেনকা শেষ রাতে উঠে পোলীভে চড়ে বেড়িয়ে আসে, কনক ঘুম থেকে গেছে, তুমি তার মিলন হয় বাগানে।

তুমি মিলে নদীতে সাতার কাটে যায়।

“মে, তোমার অস্থখ করেছে?”

মেনকা যখন হাসে তখন তার চোখের পাগড়িগুলি বৃদ্ধি আসে। সেই হাসি নয়, আবেশ। মেনকা উত্তর দিল না।

কনক বলে, “আজ ঘোড়ায় চড়। হয়নি?”

মেনকা বাস নাড়ল। মুখ তুলল না।

“মে, তুমি দিন দিন বড় অনিয়ম করছ। কেন যাওয়াই?”

“ভালো, লাগে না একা বেতে।”

কনক বলে বলল, “হু! ও”

২

বিষয়ের পূর্বের সঙ্গে বিষয়ের পরের কথা ভক্তাং। মেনকাকে যখন প্রথম দেখে কনক তখন সে তার ইস্কুলের বয়স ক’টা। দোড়-কাপে প্রথম পুরকার গেয়েছে, সে ছোরামুখের অবিভাজ্য, তার শরীরের গড়ন এখন হয় সে কে
চিনাস ভি মিলেকে মেন পড়ে যায়। ইতিপূর্বে কনক ভালো ভালো সজ্জা ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে, “মাটিক পাস কর। ছাঁড়পোষ বালিকা।” কিংবা “বিশ্ব রকম সেখানে গিড়িং।” কিংবা “রং নিয়ে কী করব! আমি চাই গড়নের সিমেট্রি।” সেই কনক এককভাবে বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিদোষিক বিতরণ সত্ত্বা গিয়ে একটি ছাঁড়পোষ বালিকাকে মেন মেন ঘরন করল।

বন্ধুরা যে তাকে মাথা-গালা বলত সেট। অহেতুক নয়। মেনকাকে বিবাহ করে আনার প্রথম দিন তার নিতা কর্ষের কোন স্রষ্টা হয়ে গেল। সে শেষ রাতে উঠে ঘোড়ার ঘণ্ডে বেড়িয়ে এলে কনকের সঙ্গে সাঁতার কাটতে যাবে। প্রাতঃসারের পর ছাঁড়া মিলে লাইকেরিতে বসে পড়লে। এগাধ্যায়নের সময় কনক অফিসে গেলে মেনকা সারা ছুপুর কাট পাথর কুঁড়ে মৃত্তি বানাবে।

কনক বলেছিল, “একটি অতি সাধারণ গিরিবালি হয়ে ব্যর্থ হবে, মে! নিজের জীবন্তকে বড় সেগে নির্মাণ করো। আপাতত তোমাকে ভাস্কর্য দিয়ে অর্ধেক করতে হবে। কিন্তু তোমাকে দিয়ে সৌধ নির্মাণ করব।” মেনকা তার কথা বুদ্ধিতে পারে কি পারে না তা নিয়ে কনক মাথা ধামায় না। সে তো বোঝার আরো কথা বলে না। প্রভাবিত করার জন্যে বলে।

চায়ের পর টেনিস। অতঃপর ছাঁড়া পান করে ছাঁড়পোষ বালিকাটি নিজের ঘরে ঘুমাতে যায়। এবং সাপারের মিছিলে সরকারী কাগজপত্র নিয়ে কনক বলে আফিস-ঘরে। এই পর্যন্ত কনককে বেগ পেতে হয়নি। মেনকা উৎসুক হয়ে রাজি হয়েছে। সে তো মেন। কুটে পেলে আর কিছু করতে চায় না। তবু ভাবনা তাকে পাগল করেছে। কনক বলেছে, “মে, তোমার দেহের গড়নটি sculpturesque, কার সাধ্য যে বলবে ত্বজ্ঞতা। মে, তুমি একথানি জীবন্ত sculpture!” সে কথা জনে মেনকার উৎসাহের অবধি নেই। ভগওদ্ধান্তার বেহালার আট বছরের মেয়ে লছিমি হয়েছে তার মডেল।

মেনকা বেঁকে বসল কনক যখন বিধান দিল, শিল্পীর বেলা। কুটে পরে হবে কাজের বহিঃপ্রকাশ অংশ। রাতে তুমি যে খুশি পরে পারে। ঝোপদীর মতো দীর্ঘক্ষণ ঘাট যুগে বেঁথ ছিল, কাঁধ যুগে চলত। বেঙ করতে হবে। তৈরিকি ছ’ ভাঙ্গার ছাড়া। পক্ষাস কালীর পরিমাপ ধাঁচ থেকে হবে। তার মধ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ইত্যাদির অস্তিত্ব এক চুন বেশি কম হবে না। এবং ভাইটামিনের জন্যে কাঁচা সবজি চিবিয়ে খাওয়া চাইই।"
বালিকা বধু

এই নিয়ে মেনকা এখনো মাঝে মাঝে সত্যিগ্রহ করছে। অর্থাৎ ত্যাগী পতিত। বেশ সবচেয়ে কনক পীড়াপ্রেরণ করছে না। পাছে গাছের মায়োক তার করতে, লজ্জা করতে, কামনা করতে শেষে, পাছে স্বার্থেচ্ছন হয়, এই আশ্চর্য কনক মেনকাকে অধিকবয়সী মহিলাদের সঙ্গে মিশতে দিত না।

ওঁা বিদি তার বালিকা বধুটিকে পাকিয়ে তোলেন। তখনি কেমন করে মেনকা তাকে "ওগো!" বলে ভাকতে শুরু করছে। সেদিন বলছিল, "না গো, আমি এত বেশী দূঃখে পড়ে পাব না।" অন্য সময় হলে কনকের কানে বেষ্টনী বাধছে। কিন্তু সত্যিগ্রহের মেনকা শাড়ি পরে নিজেই সিদ্ধির দেহ।

তখন তার মুখে "ওগো" শুনতে মিটি লাগে।

৩

চায়ের সময় কনক জানতে চাইল, "মে, কাল রাতে চা বানে পারচারি করছিল কে?"

মেনকা উত্তর দিল, "কিছুতেই ঘুম আসছিল না।"

"একবার ঘুম আসছিল না?" রাসিকতা করল কনক।

"ধোতো!" মেনকা বলে উঠল।

চায়ের পর মেনকা বলল, "আজ কিন্তু আমি টেনিস খেলতে পারব না।"

"কী করবে সেই সময়?"

"লন্ডনে, ছুমি রাজি হো। আমার সেজবোলিং বাণের বাড়ি এই শহরে। এতদিন বাইনি বলে তারা নিজেই আজ এখানে আসতে চেয়েছেন।"

"অসষ্টুব। টেনিস বন্ধ রাখায় না। আরেক দিন চায়ের নিমন্ত্রণ কোরো। আমিও তোমাদের আলাপে যোগ দেবার হয়তো পাব।"

প্রাতাত্ত্বিক মেনকার মনে ধরল। সে চিঠি লিখে তাদের নিরন্তর করল সেদিন।

টেনিসের পর কনক বলল, "বুঝলে গো, মে। আজ টেনিস বন্ধ রাখলে অন্যত একশে। ক্যাশলির খাবার কমাতে হবে। তার ফলে তোমার ওজনের আধাঁটি ছাড়া করে যেত।"

মেনকা গাছির মুখে চোখ রেখে মিটি হাসল। বলল, "মরণ হলেই বাড়ি।"
রাগ
আমার অনেক এটা বেশী ভেবে তোমার নিজের চেহারা কি হচ্ছে আয়নার কাছে থাকে দেখো।"

সে কথা কনক জানত। কনকের ফলের কুট তার দেহকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। তেঁতুল মেঘকে বিবাহ করলেই মেঘকে ভুলতে পারবে।
কিন্তু ফলের ফাল কই! কত বার মেঘকে একটি চূরন দিতে সাধ গেছে।
কিন্তু মেঘের গুণ মিলাবার কত হবে না? যে মুখ দিয়ে মেঘকে চূরন করেছে সেই মুখ দিয়ে মেঘকে! আগে মেঘের মিলি মিলি হয়ে থাক, আগে মেঘের বিবাহন্তর আহর।

কনক বলল, "আমার কথা আলাদা।"

"কেন আলাদা। বলছ না কেন? বল না!"

"ছেলেমায়ুষ। আগে বড় হও।"

"ইং। নিজে তো ভারি বড়! দেখলে মনে হয় উনিশ কুড়ির বেশী নয়।"

"আচর্চ! না? তোমার সঙ্গে আমাকে দেখে কেউ ভাববে না যে ভিতর পক্ষ চলছে। অথচ—"

মেঘক। কনকের মুখে হাত চাপা দিল। "থাক, আর মিলে কথা বলতে হবে না।"

কনক অনেকবার আঘাতে ইথিতে জানিয়েছে, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেনি। মেঘক। এট কম-বয়সী যে গুরীর সত্য বুঝে না। বলবে "মিলি অধর। আবুরের মতো। আমাকে হার। কনক তায়ে মেঘক।
সে বেশী বয়সের মেঘদের সঙ্গে মিশে থামিকে সনেহ করতে বা থামির পৃথিবীতে সঙ্গে কোতুহলী হতে শেখেন এই এক সৌভাগ্য। নতুনা এট দিনে কনককে জেরা করে অপরাধী সাবান করে একটা অন্যত বাড়িয়ে বলত।

মেঘকে তার ঘরে পাল্লার দিয়ে কনক আজ রাতে কাজ করে ছিল। নিখর।

কোরেন, যে তালিঙ্গ, কুই বলছিলে মনে গড়ে। বলছিলে, "তুমি তো মায়ে নাও। প্রাক্তন লিঙ্গের ঐ যে গেবিয়েল লেখছ, তুমি থাই।" যে
বালিকা বধু

ডিয়ার, আমাকে এখন দেখলে কি বলতে? বলতে, “তুমি তেো এঁঠেল নও। তুমি বিষয়ী মাঝু। তেমার বাড়ি হয়েছে, পাড়ি হয়েছে, নারী হয়েছে। তুমি আঁশলতে উড়িল মোকার হাকাও, চাপরাশিকে কাইন করো, অপরাজেকে কারাগুঁ দাও। তুমি হ'বেলা সেলাম লুটছ। তুমি কি আমার আকাজিত হী ম্যানে?”

মে ডিয়ার, তুমি আমার উপর কোনো রুহৃত আশা রেখেন না। আমি কোনো মহৎ কীর্তি, কোনো রূহৃত চিন্তা দিয়ে যেতে পারব না অগত্য। বড় জোর আমার জেলার কুচুরিপানা কংস করব। এই সামনে আমার ধাক্কে যে আমি আমার দেশের একটি বালিকাকে জী উৎপাত হবার হয়েছে দিয়েছি। একদিন সে এমি অনুসন্দেহ মতো আকাশে উড়তে, জোসেফিনা বাড়িরের মতো কঠিওর হতে পতিতাকে পাঁক থেকে তুলবে, এমনি হয়তো মতো শরুী প্রতি অভিচার স্থতে দেব না। এবং তেমার মতো বিশেষ সেনারের উপালন করে ফলিয় সেনারের সাধন করবে। সে একদিন হুদ্দারী মানোকে পায়ে রুপ দেবে, সেই নমুনা দেখে মানবিক হুদ্দারী হয়ে প্রেরণ পাবে। সে একদিন হুদ্দর কুটীর রচনা করবে, তার পর থেকে দেশে অন্ধকার কুটীর আর থাকবে না। সে একদিন হুদ্দর পলিটন করবে, সেই পলিটের অদর্শ দেশময় পরিব্যাপ্ত হবে।

মেনকার মধ্যে তুমি ও আমি বাচব। তেমার নাম সে শোনেনি, নাই আগে শন। আমাকেও সে চেনে না, চেনে একজন বেঁধালি সংক্রানক, একটা বেঁধালি বুরুরাকাটকে। ক্ষতি কী। সে আমাদের না চিনিলেও আমারা তার মধ্যে সার্থক হব।

কনক সে রাতে ঝর দেখল, তেরোন। এই যে তেরোনার রোমান যুগের আরেনা। এম, আমারা ইতালীয় এত জায়গা দেখলাম, কিন্তু তেরোনার মত ভালো লাগে না কেননা। জায়গা ভালো না লাগলে জায়গার দোষ নয় ততটা, আমাদের মনের অবস্থার দোষ। তুমিই বল না, তেরোনায় আমরা যত কাহাকাহি আছি তত আর কোথাও ছিলুম কি?

ফিছ্যে পেরে কনক দেখল রিভিয়েরার একটা ছোট স্টেশনে নেমে গেছে কনকের জন্মে খাবার কিনে আনতে। ট্রেন চলছে, কিন্তু সে এলে
না। সমস্ত ট্রেনটার বিবর্ধকের বেঁধে কনক তাকে খুঁজতে, কিন্তু পেল না। সামনে ছুরির জামাদান যুবক বলে কলাহার করছে, কিন্তু কনকের দৃষ্টি আস করেছে চরাচরব্যাপী অন্ধকার। তার কানে এঙ্গরপন্থীর চেত ভেঙে গড়ছে। মাসেরও জাহাজ ছাড়ে বাল, কনক দেখে রুদ্ধ হবে, শের সেব বেশ দেখা হবে না। মের যে আঁজ রজাতে কী দশা হবে ভাবতেও অতিক বোধ হয়। তার সব ঠাকুর কনকের কাছে, সব জিনিস কনকের জিজ্ঞায়।

সে ফরসাচ ভালো বলতে পারে না। ইংরেজী যদি কেউ না বোঝে ও কি তুমি, ভিয়ার। অবাক করলে! ছিলে কোথায়? এই ট্রেনের সঙে জোটা আরেক সেট কামরায়? ভগবান!

একটা রমকা হাওয়া। এসে পিয়রের জানালাটা খুলে ছিল। এক অঞ্চল চাচরের আলো কনকের মুখে ছড়িয়ে গেল। কনক চোখ চেয়ে দেখল, তার একান্ত নিকটে মেনকা শুধু আচ্ছে। পূর্ব চাচরের আলো। তার মুখে পড়াত এড় ছুড়ে দেখাছে, যেন মের ও নীলের শুধু মুখ। কনক নিন্মিত্তে অবলোকন করল। মেনকা আর বালিকা নয়, মেনকা নারী।

নারী। হা, নারী বৈকি। বেশ বয়সের বিবাহিত। মহিলায় এই বালিকাটিকে নারী করে তুলবে এমন অপর্যাল। কনকের ছিল। চাচরের আলোর মতো তার মনকে আবির্ভ করল এই সত্য যে পুকুরের সঙ্গ নির্মৃত হলেও বালিকাকে নারী না করে ছাড়ে না।

(১৯৩০)
পূঁজিবদ্ধ

১

“আপনার সঙ্গে,” ভ্র্যলোক ইংরেজিতে শুরু করলেন, “দেখা করবার জন্যে আপনার বাংলায় যেতে পারিনি, বুড়ো মানুষ। শুনলুম আপনি খান কামরায় আছেন, তাই—”

“বসন্ত।” আমি চেয়ারের দেখিয়ে দিলুম।

“ইসু কি ধুলো।” ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, “আপনার উপযুক্ত নয়। আপনাকে আরো ভালো দর দেওয়া উচিত।”

আমি ভ্র্যলোকের কার্ডবান আরেকবার পড়ে দেখলুম। হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য। মিউনিসিপাল কমিশনার। কার্ডের সঙ্গে ভ্র্যলোককে মিলিয়ে দেখতে লাগলুম। বয়স সত্তর হতে পারে। বেশ শক্ত আছেন, তবে চোখে একাশকার জললভাব।

“বিশেষ গৃহীত হলুম;” তেমনি ইংরেজিতে, “আপনার সঙ্গে দেখা করে। শুধু আপনার নয়, আমার সভ্রাটের সকল প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করে আমি অনন্য পাই।”

ভ্র্যলোক পাকেট থেকে চশমা বের করে চোখে পরলেন, আবার পাকেট হাতঝালেন।

“পড়লুম কি লিখেছে।” ভ্র্যলোক আমার হাতে যা দিলেন তা একটি খান। এই রকম আরো কয়েকটি খান তার হাতে রইল। আমার নামের খান দেখে আমি খুলে পড়লুম।

একবার মুখ্যমন্ত্রী কাগজে ছুটি ভাবায় ছাপা সংবাদপত্রের বচন। তার মর্য হরিশচন্দ্রের কনিষ্ঠ সন্তান হর্শধন ভট্টাচার্য সাত বৎসর কাল ইউরোপে বাস করে প্রথম বার-ম্যাট-ল এবং পরিশেষে ডি-লিট হয়েছেন। কোথাকার ডি-লিট? প্যারিসের। কী লিখে? “বাংলা সাহিত্যের উপর ল্যাটিন প্রভাব।”

আমার তাক লেগে গেল। আমি পড়ে মুখ হয়ে গেলুম সংবাদপত্রের অভিনন্দন।

“পড়লুম তো?” ভ্র্যলোক সুগত বললেন, “এখনে ইচ্ছা করেছিল
প্যারিসে পড়ে ইতিমধ্যেই হবে। কিন্তু আমার পেইন সার ল্যান্সলেট লন্দন সাহেব তাকে প্যারিস থেকে লেপে ডাক দিয়ে বললেন, ইতিমধ্যেই হবে করতে চাও কি? চাকরী? ব্যারিস্টার হয়েও কী চাকরি করা যাব না। সরাসরি তিনটি জঙ্গ করে দেব। হায়রে দুঃখ। এরই মধ্যে নিন্ম বললে গেছে।

অন্যলোক চশমা খুলে নামিয়ে রাখলেন। “তিন বছরেই চলে আমার বার-রায়েল। সার ল্যান্সলেট শয় তাকে সার অতুলের কাছে নিয়ে দিয়ে বললেন, ‘এ আমার ক্রেডিটের চেলে, একে আমরা গোপাল করে দিন।’ তিন বছরে যে পাশ করে ফেলবে, আশঙ্কা নয় কি? ”

আমার এককাল পরে মুখ ফুটল। “তা তো বটেই।”

“তার পরেও এক বছর টিকেলে হয়েছিল বিলেটের এক বড় কৌশলীর কাছে। স্পেশাল কেভার। সার ল্যাঙ্গলেটের দয়া। তারপর দেশে ফিরে আসতে লিখলুম। টাকার হৃদয়। কিন্তু চলে লিখল, চারশ’ ব্যারিস্টার কলকাতায়। তাদের সাহেব দিতে হলে আর। কিছু শিখে দেয়ে হয়। আমার গেল প্যারিসে। ফরাসী ও ল্যাটিন বেশ ভালো জান। ছিল। ছেড়ে বছরেই তি-লিট।”

আমার মনে পড়েছিল প্যারিসের সেই দিনগুলি যখন ল্যাটিন কোয়ার্টারে আড়া গেছেছিল। হর্ষধনের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল এক রাশিয়ান রেস্তোরাঁতে। লা, হ্যাংচোর প্যাসেনে চশমা, মুখে নিগম করে। যাকে বলে ম্যান রায়দাউ টাইন, সেই রকম হাবভাব। ফরাসীটা তখন আমার আকৃতি করেন। গোটা গোটা করে বলে।

“আপনি বুঝি এই প্রথম প্যারিসে এসেছেন?” বাটোশারিয়া (Bhattacharya) আমাকে পিঁখিলো করল। “গার্লেল্ড ফ্রেস!" আমাকে নিকটের দেখে বললে, “আছে, কোনো ভয় নেই। আমি আপনাকে মন দেবিয়ে দেব।”

প্যারিসে এই দেখানো জীনিসটি নিচু আর্থিক্যার নয়। এর অক্ষ আমাকে থাকে তাক করতে হয়েছিল।
"এসো হে, মনিয়ে নিন্দা,” মনিয়ে বাতাশারিয়া বলল, “আমরা অক্ষরে সরছে তো বাঁচাই। এ শা—স্বা আমাদের কদম বোঝে না। এদেরকে শা—মজুমদারের দল হাত করেছে। অবরাহ, মজুমদারের দল মিশ্রা না। এও শা—একটা স্পাহাই।” আমি ঘাবড়ে গেলেন। চলতুম গোসারা রেতোরাই।

"দিদিমণি,” বাতাশারিয়া মাদামোয়াসেলকে পরিকার বাংলা ভাষায় সহায়তা করলে। "দিদিমণি, লিচ্ছুল্পে।” পরিবেশিত এসে বাড়াল। সরলসর্বনা তরুণী। গ্রাহককে খুশি করা তার কর্তব্য। নইলে চাকরি যায়। তাই তাকে হাসতেই হবে। উপায় নেই।

বাতাশারিয়ার চায় তার সঙ্গে একটু বাঁচিয়ে করতে। তা সে বাজি হবে কেন? তুই একটা এক তফা রসিকতার পর বাতাশারিয়া অর্থায় দিল, এটা চাই ওটা চাই। বক্তৃতা অর্থায় রোস্তি বীর তার মধ্যে ছিল।

"দিদিমণি,” বাতাশারিয়া আমার পানে চেয়ে বললে, “একবারে আমাদের দেশের মেয়ের মতো। ওর সঙ্গে কথা করে হংস আছে। ঐ রশিয়ান ছি—ওলোর মত নয়।—গীর। মজুমদারকেই চেনে। আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। বক্তৃতা অনন্তর বললে রান্না ঝুটো। (ভেড়ার মাংস) নিয়ে আসে। আর ওদের ওদামে ভালো ভালো পাবার জো নেই। তবে চাটো ওরের বাথি রশিয়ান চা।”

আমি গেছলুম লগন থেকে। পারিসের চাঁচলচনের অচললতা। লগনে আমাদের অভ্যাস। লগনে কোনো ওয়েদরেসকে অনন্ত করে তাকে দেখি। সে একটা সীন বাড়াবে। বলবার কিছু থাকে তবে তার স্বাতন্ত্র্য কাল কোষল আছে। আর কী রচি। ওয়েদরেসের সঙ্গে গ্রেম।

আমি দিয়ে শক্ত হলুম। বাতাশারিয়া তখন সহায়তা করে বললে, “কোন লাভ দাতা (Datta), ভুই কী বলিস? আমাদের নতুন মনীষিকার পছন্দ হলো।”

বাতাশারিয়া লগনে কখনো এখান চিতকার করে কথা বলতে সহস্র গেত না। আর এই সব কথা। পাঙ্ক চ্যাল্টে ভিজেবড়াল। চোখ টিপে তাকে হঁশিয়ার করে দিলে আমার সম্ভব। মনে আমি তাদের বাড়িতে চিনি লিখে জানাতে বাচি।

“আরে ঘাঁ। সব শা—কে চিনি।” বাতাশারিয়া বেপরোয়াভাবে বললে। “তোমার লগনওয়ালারা কম শয়তান নয়। আমি যাছি লগনে। রোস্তি। আরে পারিসের পথ ঘাট চিনি।’”
গল্প

হাতাপর সেই মেয়েটিকে বাংলায় বললে, “বিদিয়াম, আমার কোলে পোবে? কেন লজ্জা কিসের?”

মেয়েটি একবিন্ধু রুক্ত পালনলে না। ভাবলে কিছু একটা হাসির কথা হবে। গাছের মস্ত করবার কড়া চুক্ত আছে। কোন গাছের যদি মিঠা করেও তার নামে অভিযোগ করে তবু পাতা (মালিক) তাকে ছাড়িয়ে দেবে, যদি না তা শালিকের চাঁদী হয়ে থাকে। রেস্তোরার চাকরি এক মাসর চাকরি। মাইনে নেই। আছে কোরাকি। আর গাছের বর্ধিণী। বর্ধিণী ও মোলা। অনে নেবার যে নেই। বক্ষা করতে হয় সর্দার বা সর্দারনীর সঙ্গে।

মেয়েটি মুখুদি হঠাৎ। তা দেখে বাতাশারিয়া হে হে করে হেসে উঠল। যেন কত বড় তামাশা করেছে। দেখ আমার দিকে চুরি করে চেয়ে রেনে উঠল। আমি যেমন উঠলুম। এ অভ্যাসচারের শানন নেই। ফরাশী রেস্তোরার। তৈ তৈ ব্যাপার। কতগুলো ভিতরী এক কোপায় মাঝে মাঝে ব্যাংলা। বাজাতে কখন ভুক করে হিয়েছে। অন্ধকার টেবিলেও হট্টগোল। সবই স্মান বাচাল।

হুটে একটি করে বাতাশারিয়ার দলের সুন্দর। এসে হঠাৎ লাগল। তাদের কেউ বাঙালি, কেউ ওড়ঙ্গারা, কেউ পাঞ্জাবী। তাদের কাঁক্ত কাঁক্ত সঙ্গে নামিকা ছিল। বাতাশারিয়া উঠে গিয়ে তাদের টেবিলে খানিক বনে নামিকাদের সঙ্গে হুটে। করাশী কথা করে আসে। বেশ, বেশ, তোমরা আমাদের দলে। বড় মুখের বিষয়। এই তার প্রধান বস্তু। তার বলে সে তামাশাও করে না। যাদের নামিকা তারা কী মনে করলে বাতাশারিয়া তা অঢ়ম্ব করে না। গায়ে তার গুরোর জোর। কে তার সঙ্গে লড়তে যাবে। তার চেহারা থেকে অনুমান হয় সে একটা ঠোঁটর গোল্প।

“বাহ্যা কোনী,” সে বলে একটি মেয়েকে, “তুমি নামি বিরে করছ অরিকে।” তার ভাবী বাঙালীর দিকে চেয়ে বললে “অরিকে, তোমাকে আমি হিংসা করি। তোমাকে আমি পরস্পর ধরচি করতে হবে না।”

গুরু দু’জনে সাহসী লাল হয়ে ওঠে। ছেলেটি বোধ হয় আর্টিক্ট। অন্য কিছু হলে রেখে লাল হতো। আর মেয়েটি বড় ভালো জাতের। আমি সুরের সময়ের লল করে চমৎকার হলুম। হাস্তর হোক গুরু করালী।
পুনরূপায়িত

দেশ ওদের। ইচ্ছা করলে কি ওরা শিক্ষার বেদনায় করত না আমাদের ইহিনিয়ার দাদার?

পরদিন আমি ওর সংবাদ এড়াচার জন্তে অঘট থেকো। বিশেষ কোনো খানে না, খানে খুশি। তবে আমার প্রিয় ছিল একটা পাতিসেরি। সেখানে শেষ তব পিঠে থেকো। আর কিনিটাইল ভেঙে মেল কিনে পড়তুম। আমি আগে জানতুম না যে মজুমদারের তার দলের হাত থেকে পালিয়ে এসে নিঃখিলে সেইখানে কুঠার পড়া তৈরি করতেন। এক অংশ মাঙ্গ এই মজুমদার। সত্যিইতে তাকে দেখে সে ঠাওয়ার বলকটা আমোদিতে বিনীত আছে। অসাধারণ আড়ায়। কিন্তু নিজের কাজটি বেশ উঁচিয়ে নিতে জানেন। ফরাসী ভাষা হর্ষে করে ভাকীর পড়তে হয় স্বপ্নে। তাই তাকে ঢেকে রাখতে সেটা ফি তার অপরাধ?

বাতাশারিয়া দল পাকিয়ে সমিতি ক্যাপচার করলে। তারপর মজুমদারের নামে রটালে তিনি অনেক টাকা খেয়েছেন, হিসাব দেননি। মজুমদারের বন্ধুর তাকে নিয়ে সমিতি থেকে বেরিয়ে গেল। তার ফলে পাগলানাল সমিতিকে চেক ধরলে। বাতাশারিয়া দল রাত্রার্ত সমিতির নাম বললে বাড়ি বললে মজুমদারে কীর্তি লোগ করলে।

"কী, মিঃ সিনহা," মজুমদার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এখানে বে? বাতাশারিয়া আপনাকে আসতে দিলে।"

"মিঃ মজুমদার," আমি তাকে ধরণ করিয়ে দিলুম, "আমি সাবাল ক।"

লক্ষ করলুম মজুমদারকে হৃদয়তে সেখানেও মেয়েরা আনাগোনা করে। ভাগ্যবান পুরুষ। বাতাশারিয়া বে হিসা করবে তার আশ্রম কী? আমার হিংসা করতে প্রস্তুত হয়। তবে এদের এই নিয়ে দলাদলি আমার বিশ্রাম লাগে। লগ্নে আমাদের বলাবলি পলিটিকল। আমরা কেউ কমিউনিস্ট, কেউ সোভিয়েট, কেউ স্প্রান্নালিস্ট, কেউ মুহারেদ। কিন্তু
প্যারিসের ভারতীয়দের বলাবলি নারীটিত। কার কোটি নাযিকা আছে এই তাদের গণনা।

আমি বোধ হয় কতকটা হতাশ হয়ে প্যারিস ছাড়লে। আমার একটিও বন্ধুর মিলন না। সকলে আমাকে একটু অমূল্যের চোখে দেখল।

৩

মাস ছয়েক পরে আবার প্যারিসে গেলুম। এবার থাকার জন্য নয়। প্যারিস আমার পায়ে পড়ে। তাই নামলুম। ল্যাটিন কোয়ার্টারের উপর অপ্রণা ধরে গেলুম। উঠলুম লিয়ে স্টেশনের অন্তর্গতে। আমার সঙ্গে দেখা করতে লিখেছিলুম গুহ ঠাকুরতাকে। সে এলো।

প্যারিসের কে কেমন আছে জিজ্ঞাসাবাদ করলুম। সেই হতে উঠল বাতাশায়ারিয়ার কথা।

“তার কথা জিজ্ঞাসা করে আমাকে বলুন দিলে সিনহা,” বললে গুহ ঠাকুরতা। লোকটি নরম বহনের। পড়ানো নির্দেশ থাকে। স্বীকার্তির হয় মাঝায় না। প্যারিসে একটি ছাত্র যে মেলে অন্তর্দিক আমাদের

হয় ঠাকুরতাকে না। চিনলে আমি বিষান করবে না। সেই গুহ ঠাকুরতা আমাকে করণের কঠে বললে, “বাতাশায়ারিয়া আমাকে খুন করতে বাকি থেকে সিনহা!”

আমি অবাক হয়ে গেলুম। মিথ্যা বললার পাত নয় গুহ ঠাকুরতা। তার

চোখ চুলছ করো নি।

“আমার পক্ষপাত মজুমদারের প্রতি। তা বলে আমি যে মজুমদারের

মনে তা নয়। আমি কোনো দলের নই।”

“যার বন্ধুর সেই তার দল থাকবে কী করে?” আমি হেসে বললুম।

“বাহো,” গুহ ঠাকুরতাকে হাসল। “একমুক্ত মজুমদার এসেছেন আমার

হোটেলে, আমার বিবাহ। আমি তাকে এক পেঁয়ালা দেঘো করে

বাংলাতে যাচ্ছি। এমন সময় বাতাশায়ারিয়া, নতু, ঘোষ, হাইরা, জামিয়াত

স্পিঙ্কিনে তাহাদিগের অন্তর্গতে দেখা দিয়ে ঘরগুলো। কী হয়েছে। আমার

মজুমদারকে চাই, ছেড়ে দাও। আমি বললুম আমার বিবাহ।

আমরা শুধুমাত্র তোমার চোখে কেন। ওরা আমাকে পা দিয়ে হটিয়ে দিয়ে অগ্রিল
দ্যায়ের মেয়ে হাত দিতেই আমি বলে উঠলুম, চন্দ্রমালার গায়ে হাত দিয়েই আমি বলে উঠলুম, চন্দ্রমালার আমার অতিথি। ওরা আরেকটা অন্য কোথা বলে আমাকে রাখিয়ে চললে। তখন আমি বলে উঠলুম। ওরা আমার উপর রাখিয়ে পড়ে আমার হাতে ঘোড়া দিলে। চন্দ্রমালার ইতিমধ্যে কৃষ্ণ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে কৃষ্ণের না পেলে ওরা আমার ঘরের আদলা রোমহর্ক একে একে হঠাৎ মারতে থাকলে। যা লেগে আলালার কাছে গেল ভেঙে। আলালে লোকসান হতো।
কিন্তু লোকনন্দ এসে পড়ল। তখন তারা শাসাতে শাসাতে বেরিয়ে গেল।

"কিন্তু কেন হাত এ অভিযান?" আমি বলতে হয়েছিলুম প্যারিসের চার্চের নীচতার বিরুতি দেন। লেখার দলেও ছোটলোককে এমন হাতাম। বানায় না, কোথায় ছাড়া তো ভর পাড়ায় অন্যলোকের মতো বাস করে।

"লেই যে পাঠিয়ে দেবে? তুমি খেতে মনে পড়ে?"

"খুব মনে পড়ে।"

"সেখানে একটা মার্কিন মেয়ে খেতে মনে পড়ে?"

"মনে পড়ে বইকি।"

"মিস হিলটন মজরুতবকে বিখ্যাত করে একশ ক্রুঃ রাখতে দিয়েছিল। সামান্য একশ ক্রুঃ। বাতাশাতিয়ারা গাছ পেয়ে তাকে বলেছে, মজরুতবকে তহবিল দেবার করেছে। ওকে বিখ্যাত কোরো না, ওর কাছ থেকে টাকাটা বের করে আমাদের দিব্য নিয়ে আসো। আমরা তোমাকে হিতৈষী। নে বড় বোকা মেয়ে। নে যা বোঝা তাই বোঝ। মজরুতবকে চাইলে টাক। মজরুতবকে চেরা করে জানতে বাতাশাতিয়ার কারাগার। বললে তুমি তোমার হিতৈষীদের আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।"

"ওয়ালি কে ইতরতা।" আমি উচ্চবর্ণে বললুম, "মার্কিন মেয়ের কাছে দেশের লোকের স্বাক্ষা নষ্ট করে। তাতে যে দেশেরই স্বাক্ষা নষ্ট। ছি ছি, সামান্য একশ ক্রুঃ, যার নাম গোটা একারা বারোৰো টাকা। মার্কিনীদের পক্ষে যা একেবারের কে রাকে।"

"ঘটিত তাই শেষ নয়, সিন্‌ঘ। বাতাশাতিয়া দেশের লোকের মুখে আরো চুনকালি মাথিয়েছে।"

গুহ ঠাকুরদা এর পরে যা বললে তা আরো রোমহর্ক। তা নিয়ে আরেকবার হর্ষচরিত এখন করা যায়। সংক্ষেপে এই—

লেই যে বিদিশি, তাকে শেষপর্যন্ত বাতাশাতিয়ারা কাছাকাছি করেলে। মেয়েটি
খান প্যারিসের নয়, মকবলের। আত্মরক্ষার পক্ষে তিনি মন দেওয়া করেন নি। নমনের আগমন পাইনা। গেলে হস্তিরপের ক্রমে। সে গলায় হতভাগী, তোমাকে এত যত্ন অনায়ায়ান শেষালুম। তোর মতো এমন অপরাধ মেয়ে তা দেখিনি। বাংলাদেশের ছেলে আমি। তোমাকে বিয়ে করে জাত তদের কোন এক হাতেড়ের কাছ থেকে দাওয়াই এতে ওকে খাওয়ালে। ফলে শের মরণাপরিক অবস্থা। তখন থেকাট হলো যে মজুরদার ভাস্কার পড়ে। সে যখন দরা না করে তবে অন্য ভাস্কার এসে বাতাসারিয়াকে পুলিশের মধ্যে দেবে। মজুরদারের কাছে সোজা না সুমিতে গুহ ঠাকুরতাকে সামলে মজুরদারের কাছে নিয়ে যেতে। হাজার হোক দেশের লোক। বিদেশে বিপাকে পড়ে মজুরদার বললে, কাঁটা বেদান্তী। জলে যেতে চাইনে। তখন সো ঠাকুরতার সায়া প্যারিসে টুড়ে চোরের মতো। কত ভাস্কারের জোরে হলে অবশেষে একজনকে পটালে। গুহ ঠাকুরতার সেখানে মেয়েটা মায়ে বাড়িলে।

কিন্তু ভাস্কারের বিল মেটাবার মল্লিক বাতাসারিয়ার বললে, "আমার কাছে টাক। কোথায়, ঠাকুর! আমি বিল কি সোজা বিল? না ভাস্কার নেবেছে। আমি লোকপাল। না বাবা, এখন আসলফুলার পর্দা কিংবা উপত্যকা হইনি।"

অগভী গুহ ঠাকুরতাকে এককরণ সর্বাধিক হতে হয়েছে।

আমি বললুম, "বেশ হয়েছে। অপারে সরাক করলে সে দরকার পাপ, সে পাপের সাজে আছে।" কিন্তু আমার পক্ষে ওরথো বলা সোজা। আমি তো গুহ ঠাকুরতার মতো অপরাধসাক্ষী নয়। আমি হয়তো সাধারণের কথা দিয়ে দিয়ে মায়ুলি কথা বললুম, "হাক, ভগবান আছেন।"

দেশে ফিরে এই করেক বছরে ওবর তুলে গেছলুম। আজ হরিশচাঁদ দেখে করতে এমন মনে পড়িয়ে দিলেন।

"আমি চিনি আপনার ছেলেকে।"

"চেনেনপ? সোনা স্বামী হলুম। বাবা আমার সম্বন্ধ রওয়ানো হয়েছে। সামনের মায়ে লোপাটে। দীর্ঘ সাত বছর পরে। বাবা-বাবা টি-টি ললিত ধরে। দেশের গোরব, দেশের একজন।"

গুহ ঠাকুরতার কে হলো। জানিনে।

(১৯৩৩)
বাংলার বাড়ির যথি কোথাও বাংলা থাকে তবে সে ১৭১ হেনরিয়েটা রোড, লন্ডন, এন. লর্ড ফোর বাড়িটা এডওয়ার্ড অফ যুগের। যুগের পর এক অইল বাড়িওয়ালীর হাটে আসে। বাড়ির থেকে দেখতে অজ্ঞাত, যদিও ভিতরে অত্যাধুনিক নাটিয়ারি বন্দোবস্তের অভাব। সে অভাব না থাকলে বাড়িওয়ালীর ভাগ্যে এমন বাড়ি জুড়ত না, বাড়িওয়ালী অসমত ঘর হাত। বাড়িওয়ালী যে কব প্রথম এ বাড়িতে উপনিবেশ স্থাপন করলে তার ইতিহাস অক্ষরি অলিখিত। কিন্তু বাড়িওয়ালী এখানে অন্য ঘটের লোককে ভিড়তে দেয় না।

এ বাড়ির অনেক স্থবিধা। এখানে তোমি ঘাড় ভাঙ্গত খাও, ধুতি পাড়ারী পর, বাংলার কথা বল—

আমি যখন দেখে ফিরি তখন অভিসারে উদ্ভত প্রস্তর সঙ্গে এই প্রাঙ্গণে অনেকাংশ, “আছি, আপনারা কি ওদেশে নিজেদের মধ্যে বাংলাতে কথা বলতেন?”

হা, ১৭১ হেনরিয়েটা বাংলা—বিশ্ব বাংলা—কথা বল, কর বাংলা গান, কেউ তেজে আনেব না। বাড়িওয়ালীর বিলুপ্ত বপু। তার নাম দেওয়া যেতে পারে বপুমতী। বেচারী বেসমেট থেকে উঠতে যাও না বলে সেইখানেই বাস করে। তার হয়ে ব্যবসায়ীর কার্যে তার বোঝা কথা নোরা।

বোঝা, কিন্তু ইতিমধ্যেই আচার মণ। তা হোক, মেয়েটি লম্বা। এই লম্বা যে সরমাত্রীর সঙ্গে তার অজ্ঞ শক্তি। সবাই তাকে হেঁতে করে।

আহারে বা শৈশবে যেইমনে এমন একটি বেড়াল বা বেঁধ থাকে, যাকে বলে মাসকুটি, এ বাড়িতে নোরা হচ্ছে তাই।

“নোরা,” কেউ যথি তাকে তাকে, সে বলে, “বাই।” ঐরকম হ’চরট বাংলা রুলি ও শিশু নিয়েছে।

মেয়েটি সকলের প্রতি যত্নবতী, সকলের ফাই-ফরমাশ থাকে। কিন্তু সব-সম্ভাবনায় সে সামাজিক সম্পর্ক বধূ। সামাজিক অর্থাৎ আত্মোত্তর সামাজ, এ বাড়ির রাজা। নামে আত্মোত্তর শুরুও তাই। যেমন আমাদের তেমনি সরদী। পাড়ানা নামাগ্র করে, মাঝে মাঝে
ফারাঁই ছুটী নিয়ে বাসায় গেছে পড়ে ভয়েন। সেও একবিংশ পড়।
কিন্তু কারণ কোনো বিশেষ আগর ঘটলে সব আগে ছুটে যায়।
পরের দিন। থাকে বাড়িতের কুকুর। রোদ, এটি মাসেই তোমার
পাওয়া যায়। চিকিৎসা দেব, মিলিন্স ওখান। বাড়িতে থাকমে বে পোলার
আমাদের সম্প্রদায়ের ওজন পরিত্যক্ত হয়। যেন মন হাসে। সামন্ত যে তার ঘোড়া
নিয়ে পথে না। একবিংশ মেয়ে। ঘোড়ার মায়ে এমন নয় যে আঘাতে
ড়ে সমুদ্র পাড়ি দিতে পারবে। তাকে আঘাতে তুলতে কেনের জরুরি
হবে। ওজনে অন্তত পাঁচ মান।

সামন্ত চাছো। এ বাড়িতে যে কয়টর নামে অভিবি তাদের নাম পরিচয়
নিম্নলিখিত বিষয়ে:

হেরনাথ চাকু। ইনি শ্রীলোক শ্রীক। কিন্তু গায়ে—বিশেষত হাসির
গায়ে—লগুনের বাড়িতে প্রথমে তাড়ান। কারণ সাদেও না পাচো
না। নিজের রিসার্চ নিয়ে ভার্স পরিশ্রম করেন। কেবল মাত্রে মাত্রে
সলায় কান বললেন।

দেবাল দাশশেষ। ইনি প্রতোক বছর আই-লি-এস দেন। সারা বছর
চরিত্র ঘট। ঘর থেকে আত্মা ও আত্মা থেকে ধরে ঠাই বাল করেন।
সবসার মুখ ভার। কিন্তু হয় না পড়ালেন। কেন হয় না? এমনি। যে
লাগলে না। যে কিসে লাগলে কিন্তু হয়। কেবল ঘট। করে চুলে
হিলিয়াম মাখেন। গায়ে বৃত রাজ্যের সাবান পাউডার সুত। পুষিমেনির
মতো সেজে গুজে ধাকেন দামি ইন্দৰাঙ্গী পোশাক। কার তরে এক সম্মা?
কারণ তরে নয়। সেই বাণী তো ট্রাকেরভি।

এরা বাড়িতে স্থিতিস্থান রাখত। কুই জানি কেবল থেকে আছেন।
এসা হাড়া অল্প হ’লকেন। তারা স্বাভাবিক ভাবুসারে বললেন। ১১১
হেনরিয়ে। লোক বলতে যাভাবায় তা হয়েছ। এই তিনজন। তার এদের
সঙ্গে আজ্জ দিতে কাছ। আসেন, তারা। তাদের সম্বন্ধ অনুভূত। বলা
বাছাল্য আছিও একজন।

বখন যাই দেবি দুলাল পাড়ের উপর গা রেখে একবিংশ বই কোলে নিয়ে
একটু ঘুমছে। “না, ঘুমছি না, এই চি঩া করছি, হলো কী। বুদ্ধি কেতে
কাজ বর্ষ কেন।”
"আহন, কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক!"

"না, ভালো লাগে না। আছে, সিন্ধু, আপনি কী করে জীবনে এই রুপ পান। কিছু পান করেন কি?"

আদি হাসি। বলি, "আপনি অন্তত প্রেময়স পান করুন!"

"নাঃ। ভালো লাগে না।"

সামন্তকে বেঁধে নোরার কোলে পা থুলে দিয়ে যোগ্য ভোলানাথের মতো বলে আছে। নোরা পরিয়ে দিচ্ছে জুতো। বাশ দিয়ে চকচকে করে দিচ্ছে। সামন্ত হাই থুলে বলচে, "হাঁ, বেঁধে হবে ক্লোস। এই করতে করতে বয়স চলে গেল।"

"টাক পড়ে গেল মাধায়।"

"কেহে তুমি আমার কাছে কুটানি করছ।" সামন্ত বলে চাকাই টান দিয়ে।

ওর সময় কোটকুর মে, কাঠ এইটুকু নয়। ও বিনা আঘাতে হাসায়। বেস গণীর ভাবে হাসায়। লোকটা কাউকে কোঁয়ার করে না। কোথাও রাতের মাঝখানে ভিড় জমেছে—সামন্ত জানতে চায় কী ব্যাপার। আমনি মোড়লের মতো গকেট থেকে নেটিউক বের করে কী বেন টুকলে শুরু করে দিল। টুকলে তো টুকলেই। একজনকে জিজ্ঞাসা করেছে, "আপনার নাম?" আরো জিজ্ঞাসা করেছে, "আপনার কী মত?" ওরা ঠাটবোরায়, খবরের কাগজের রিপোর্টস হবে।

বললেন করে, "এই, পথ চেঙে দাও। দেখেছ না ইনি কী লিখেছেন?"

এমনি মজার মহূর্ত সামন্ত।

গন্টীরভাবে এমন সব অঞ্চলবি কাহিনী বানিয়ে বলে যে অনেক রামায়নের রৌঘ হয়, হাসিয়ে আলে। সামন্ত বলে, "হাসির বিষয় নয়। আমার অভিজ্ঞতা। ভাববার বিষয়। দেখ বলে আপনারা যাতে বলেন, এখানে ফিরে যাবেন বলে তৈরি হচ্ছেন, সেখানকার মাহুসের দংশা ঐ। সারারাত কাঠন গায়, কবে আমার সৃষ্টি হবে, নাড়া মুড়া মিশে যাবে।"

হেরম্বানুর সঙ্গে দেখা হয় অত্যন্ত কোনো গানের আসরে। ১১১ নবমে তিনি রাত করে ফেলেন। সেখানে কী হয়, না হয়, এটে যায়, এটে না যায় সেদিন খবর রাখেন না। নোরার সঙ্গেও তার সর্পড়ক কম। কিন্তু যে কেন ১১১ নবমে গেছে সে প্রথম দিনই নোরাকে সেই চোখে দেখেছে, বায়ার বায়া গেছে নোরাকে মিট কথা ও মিট স্বর হতে। আমন মেয়ে দুর্লভ। বুদ্ধিজীবির ধার ধুরে না। কোনো একখানা বই দিয়ে বল, "পড় নোরা।" সে ছুই কাঙ}
গল্প

তুলে নিয়ো, "গারব না।" সে লজ্জিত নয় তার নির্দেশনার দরকার।
তার একটি কাজ যে সময় কখন লেখাপড়া করবে। তবে খুব মন দিয়ে
শোনে কি আলোচনা হচ্ছে। কেউ যদি বলে, "তুমিই বল না, নোরা, বড়-
লোকদের মুখের পরে তাদের সম্পত্তির উপর ভেক ভিউট বসানো কি
ভালোরক্ষণ?" নোরা চুপ করে দেয় যায়। যেন তুমি সময় বলে উপহাস
করা হলো।

একটি সময় সামন্ত প্রাপ্ত নন্দনে নোরার মান পাহারা দেয়। কেউ যদি
নোরার প্রতি অবজ্ঞা সহকারে একটি কথা বলেছে অনন্য সামন্ত কখন বলে, "মুখ
সামাজিক কথা কহেন মশল।"

আমিও বেঙ্গল কিছু বলে সামন্ত বক্তু খেয়েছি। "বাজে কথা
কও ক্যান?"
"আমাকে বলছ?"
"হুই। কুবাইক্য কখন ভালো নয়। বিম্ভাগের বর্ণপরিচয় পড়তেনি?"
মোট কথা সামন্ত কাউকে রেহাই দেয় না। নোরা লােলেলির ভারত
বলে তাকে আমরা সংক্রেতে এল এল ভি বলতে পারব না। তাকে নোরা
বলে ভাকলেও সামন্ত মনে মনে চটবে। বলতে হবে মিস ওমালি। ওরা
হচ্ছে উচ্চ বংশের লোক। পরিব হবে পড়ছে সংসারচক্রের আত্মনী।
আবার চাইবে।

সামন্ত নোরাকে আদায় করে না, তাকে হিন্দু বালিকার মতো ধাঁচে
নেয়। কোন কথা বলে। নামী হলে সে অতি জবরধন নামী হবে। তৈরী
হবে না। কিছু নামী যে সে হবে কার সাধ্য এ নিয়ে তাকে কিছু বলে।
এমন ভাব দেখায যেন সে নোরার ক্ষোভমানী।
"না, না। ঠাট্টার বিষয় নয়। বিভে হলো। ভববাসনের হাত।"
"তা কি আমি নে। ওটা এখনে ট্রান্সফার্ড সাবজেক্ট হমনি।"
"তবে ক্যান বাজে কথা কও? যদি বিয়ে না হয়?"
"না হয় নাই হলো।" তবে?
তবে ক্যান মেয়েটার মাথা খারাপ কবে দাও?"
কিছু মেয়েটার মাথা খারাপ হয়েই রয়েছে। সে বখন সামন্তের টাকের
উপর মায়াসায় অস্বাভাবিক মায়াটি দেয় কিংবা তার জন্য বিশেষ কিছু বাধে
তখন আমি লক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছি কী প্রাগাদ ভক্তি তার মূঢ়তাবে।
বালিকা। বধূর সঙ্গে তার এমন কি এভাবে? সে যেন মনে মনে জগ করছে, বামীর জন্য। আমার বামীর জন্য।

অনেকের বলায় সে মা কিভাবে বোন। সামন্তের বলায় সে বধূ।

একদা আমার প্রিয় বন্ধু বোস ও বাড়িতে অস্থির হয়ে পড়েছিল। বোসকে দেখতে গিয়ে দেখি নোরা। তার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। অনন্য রাতেও নাকি সে বোসকে ছেড়ে ঘুমতে যায় না। বোস ক্ষুঁকভাবে বললে, “ও আমার কাঠকালের বোন।”

কিন্তু সবাই তা গোপনে বোস নয়, পুষ্পীতে সরীসৃপ শিক্ষারও আছে। পরে বলব ওর কথা। চাকু আমারে তখনি বলেছিলেন একবার, “তোমার বন্ধু একটা কুষ্ঠিত৷ শেখানো। ছোট ছেলের মতো অধৈর্য হয়ে কেবল নোরা নোরা বলে তাকলে নোরা কি সাব্জা না দিয়ে পারে?”

2

সকল সময়স্থলী বেঁচে মতো। নোরাকেও নানা অতিলাব ছিল। সামন্ত তাকে নিয়ম করে বায়োস্কোপে নিয়ে যায়। তামে এই তার পকে বসে থেকে বিনোদন। আমি খুব বড় লোক হবার প্রত্যাশা রাখি না। আমার জ্ঞাতকে এই বয়স থেকে এমন করে তালিম করব যাতে নে এর বেশী বায়োস। না করে। দিস ইস দি লিমিট।

নোরাকেও সেই ধারণ। সামন্ত যা উপভোগ করে তাই তার উপভোগ, তা ছাড়া আর সব বিষ। সামন্ত নিজে একজন ছবিভার। নোরাকে ছবি দেখতে দিয়ে যাওয়া। তার পকে নোরার সঙ্গ ছাড়া অন্য কারণেও উল্লাসকর।

সামন্তের ওখানে আড়া লিখে যায়। আগত তাদের দলে কেমন করে এক ইতালিয়ান ছেড়া। আমাদানি হলো। ইতালিয়ানরা বোধ হয় এতেকে এক একটা দাস্তগুলো। নারী দেখলে তারা মনে মনে বাজি রাখে, একে বধি শিকার না। করতে পারি তবে আমি ফিলের পুঁঁ। না? এটা বেটে খাটো মস্ত। কুঁড়ে হোক, নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা এক একটা উচ্চারণ পুরুষ-সিংহ। এই ছোকরাটিও একটা বাচা কামড়ে। নোরাকে বললে, “নাচবে?”

নাচে না এমন মেয়ে ইউরোপে নেই। নোরা কিন্তু সামন্তের কাঠবাড়ু হয়ে অব্ধি নাচেনি। কবে ছেলেবলয়ে নাচত, তারপর হেঁসে না গেয়ে তুলে
গেছে। নাচলে হয়তো এত মোটা হতো না। কিন্তু সামান্য বলে, নাচ আমার দেশে নই মেয়েমানুষদের পেশা। নোরা নিউর থেল। সে নাচতে চাইবে কোন সাহস। সামান্য কি তা হলে তাকে বিয়ে করবে। তাই এত কাল নোরা চূপ করেই ছিল।

নেই বোতানি প্রস্তাব করলে "নাচবে?" অমনি নোরার মনে হলো জীবনটি ব্যর্থ গেল না নেচে। সে মানিকটা চোখের জল ছাললে। মাকে বললে, "বোতানি বলছে তাঁকে হলে নিয়ে বেতে।" যা বললে, "মিস্টার সামান্য কী বলেন? তাকে তাকে।" সামান্য সন্ন পদ্মীর হয়ে গেল। হুঁয়! এত দীর্ঘকাল ধরে তালিম দেওয়ার পরে তাকে এমন কথা জন্মতে হলো। আঁট! কুকুরের ব্যাপ কি সোজা হতে পারে। রুখা পরিশ্রম। ইউরোপ কথনো হিন্দু হবে না। বিয়ে করতেই হবে একটা পাঁচি কিংবা মেজিহুক। তা ছাড়া পছন্দ নেই।

সামান্য বললে, "নাচুক, তবে শুধু আঁট কেন, সারা জীবন বোতানির সাথে।"

যা মেয়েকে চোখ টিপে ইশারার বোঝালে, দেখলি তো। আসল মানুষের মত নেই।

নোরা অত্যন্ত নিরাশ হলো। তার বয়সের সবাই নাচছে। সেই নাচতে পারবে না। পর পুকুরে এতই যদি আগন্তুক তবে সামান্য সম্ভাব্য আমান

না ব্যাপারে। সে মুখ ফুটে বললে একথা সামান্যকে। সামান্য উচ্চ মুখি

ধরে উঠে দিলে, "কী! যদি বড় মুখ নয় তত বড় কথা। আমি কি বেহায়া যে সকলের সাক্ষাৎ মেয়েলোক নিয়ে নাচব।"

পরিনিরোধে সামান্য সম্ভাবনা ব্যাপার থাকে না। এমন সময় নোরাকে কোন ভাঁকলে। সে অনেক মেয়েকে মজিয়েছে। নোরা তো একটা বোকা হাতী।

নিচের তলায় আমানা। করলে কী হয়, মিলেস ওমালির প্রণয়ক্ষি এবং একটা নোরা।

নোরার বিমুখ। যা তেতুটি উঠে বললে, "গাড়ি যেমে। বোতানির সঙ্গে পীরীতি করবার নিজের কাছে। বোতানি কি দায়ে ঠেঁকে বিয়ে করবে। ফুঁক্তি করে উড়ে যাবে দেখিস। সামান্যের মতো বিয়েরি কেউ নয়। ভারতীয়রা সকলেই বিয়েরি হয়। গেরদে কেমন নারীবাজি জীবন এদের। যেমন সামান্য সেমনি চাকী ভেমনি রাশিপু। ইংরেজ কি ফরাসী হলে এমন জীবনের চেয়ে করণ ভের মনে করত।"
আমি করে হর্তা লগনে ছিলুম না। ফিরে দেখি ১৭১ নথিকা একটি নতুন অভিধি উপলব্ধ। বয়স কম। যোজনার মতো হাসভাব। গায়ের রং মিশ কালো, কিন্তু চেহারায় 'টিম' আছে। ওকে কেনন্তর জীবন দেখায়। ও যেন মাহব নয়, সরীসৃপ। ওর যেন জুটি নয়। আছে কর্মত। খেলায় ধুলায় পটু, গাইতেও পারে মনা। বাজাতে জানে বাঁশি।

এমন সময়ের তুলনায় কী আছে সামনের? টেকে। সামন্ত যত বয়স নয় তার অধিক বয়স বলে ভয় ভাগায়। যৌবনে প্রেড। তাকে স্বামী ভেবে অধা করা, তার বিচারের প্রতি আছে। রাখ, কিশোরী মেয়ের পকে পাভাবিক। কিন্তু তার মধ্যে মন মাতানো কী আছে? আর সরীসৃপ শিক্ষার এক রাপ কালো। কুকুর কেষের আগ্রহ। তার চামড়া কেমন মহুম, তার চোখ কেমন জলজলে, তার জুপি কেমন লিঙকলে, কেমন চেউ খেলে যায় তার ভূতে। স্পষ্ট সব দেহ। স্বচ্ছতার বাণ্যালাপ।

ধূর্ষ দৃষ্টিকোণ।

সরীসৃপ সামন্তকে চাকীকে দাশগুলোকে এখন অবস্থায় ভারি আস্পরিত করলে। কাউকে সন্দেহ করতে দিলে না কী তার লক্ষ্য। সবাই সরীসৃপের উপর প্রশ্ন। ছেলেমায়ার এত কম বয়স মায়ের কোল ছেড়ে এসেছে। সামন্ত মিলে ওমালির কাছে খুব একচেট স্পষ্টার্থ করলে সরীসৃপের।

নোনা কে ধন্য গিয়ে বললে, “শিক্ষারের জন্য বিচ্ছিন্ন রাখতে পার না কেন? ও যে ভবনি বিচ্ছিন্ন বড় তালোবাস।”

বোনেরপাচারে শিক্ষার-জয়মী চাকী করে আমি তো। ঘটনা হয়ে গেলুম। কিন্তু শিক্ষারের কথোপকথন আমার সহ হলো না। বাপের পয়সায় বিলেত এসেই অমনি ভূইফোড় কমিউনিস্ট। “আমারা বিশেষ চির বর্ণিত সম্প্রদায়, আমরা কুকুরের সঙ্গে উচ্চিউত ভাগ করে থাই। আমাদের ব্যবস্থা। অগ্নি কী কুষ্টেন, ফিন্ট্র সিনহাঁ। কী বলেন, সামর্থ্যলা?”

সামন্ত বাড়ি নেড়ে তারিক করে। উৎসব।

“বোনার ভয়ে গিয়েছে খেয়াল। হাত রে! এমনকির আঁখি কেবল মুখায় না। আমিকের লেগ সবাই চোখে।”

আমার গা জলা করে ঈশ্বর ভাকামির সাফ্ট ও বোতা হলো। আমি ১৭১ নথিকা যাতায়াত ব্যাখ্যালুম।
চঠিয়ে একটিন কবর পেলুম, সামস্ত ও বাড়ি থেকে উঠে এসেছে।
বিখাস হলো না। সামস্ত ও বাড়ির সঙ্গে এমন অচেতনভাবে অভিষিক্ত যে খুন নবরং হেনরিয়েট। চোখ না বলে আমার সংক্ষেপে বলতুম সামস্তের
শয়নবাড়ি। যেন সামস্ত ও বাড়ির গৃহজামাতা।

আমারই পাড়ার একটি অধ্যাত্র রাস্তায় এক শত্র বাসরে সামস্তকে খুঁজে বের করে খালুম, “কো হয়েছে?”

সামস্ত আর সে সামস্ত নয়। বড় বাড়ির রাজচক্রবর্তী ছিল, তার হাতে ঘরিব্যা চলত। তার পরামর্শ না নিয়ে বাড়িওয়ালী একটি দায়িত্বের কাজ
করত না। সামস্ত ছিল তার দক্ষিণ হস্ত। সেই অজ্ঞ নামহীন ময়দানাঙ্গিন
ক্ষমতাধরী সামস্ত বাসাড়ে।

কারার মতো হাসি হিসে বললে, “বোনো?”

কোনোমতেই ও প্রস্তরের ধার দিয়ে যায় না। বলে, “এমনি চলে এলুম।
এই বাসা আমার পকে বুঝিয়ে। টিলের সকল। তুমি হবে প্রতিবেশী।”

এইতুক ও কাছ থেকে বের করতে পারলুম যে শিকড়ের একটা
দায়কের কিছু আর তাই বাঙ্গালা কলেজ কামাই করে নেওয়ার সঙ্গে
নাচেহ, সামস্তের অস্থায়িত্ব ব্যাপক। নিয়ে। সামস্ত একটা সকল সকল
কিন্তু তৈরি পুর-জিনিস প্রতিক করে নেওয়ার কান মলে দেয়। নেওয়ার নালি
খন তার মা সামস্তের কাছে কৈফিয়ত দাবি করে। সামস্ত বলে, কৈফিয়ত
দাবি করার কথা। যখন উঠিয়ে তখন বুঝতে হবে যে সে আর বিখাসভাজন
নয়। অনায়ার পাড়া হয়ে সে ও বাড়িতে উইকে চায় না।

আমি দূর্বিচিত হলুম তার বিলিয়ের অনেক। বিলিয়া—বিচ্ছেদ না। এই
কালের প্রেম কি এত সহজে চুকে যায়! নেওয়া নিঃশীন তার পথ চেয়ে আছে,
অষ্ঠ অভিমতবদ্ধ ছুটে আসছে না। দায়েরের কোন করে বলতুম,
“সামস্তকে ফিরিয়ে না ও কেন?”

সে উত্তর দিলে,“কতবার আনতে গেছি। বলেছি নামাজ মান চাও।
সে কিছুতেই মাথা হেট করবে না। কী করি বল?”

চাকীকে কোন অস্ত্রহোর কলের নুম। তিনি বললেন, “আমি ওসবের মধ্যে
নেই। তিনি প্রেমকে বুঝতে বলবে না। তাও বদলে নয়।”
আমার অন্য কাজ ছিল। আর অাদাও তো আমার এই এক বাড়িতে নয়। আর ভারতীয় ছাড়াও আমার অন্য বন্ধ বাঙ্গ ছিল। আমি আর বাহা ধামালুম না। বলতে কি, হুলে গেলুম।

৫

তার মাস ছয় পরের খর দিলে বোস।

বোলের পদায় অন্তর্সার করে শিকড়ারও বাড়িতে অস্ত্রু। ইতিহাসের পুনরূপি। নোরা একবারে পাগল চেলে দেবা করলে। তার কঠিন মাস পরে নোরার মায়ের নেন দুইবার ধরা পড়ল নোরার মোটা হওয়ায় যেন সবচেয়ে নন, ঐকেবেরিক। মা হঠাৎ চলচ্ছি পেয়ে মেয়ের বন্ধ করা চুলের মুট খর গর্জে উঠলেন। "বল কে?

নোরা সত্যে বলল, "শিকড়া।"

শিকড়ার নিচের তলার গর্জন ও অজ্ঞানাস শনে তবি তন্ত্র গুটে উঠাও।

তখন নোরার মা নিঃসহায়। ভেলে পাটালেন সামন্টকে। সামন্ট চুটে এল। তিন জনে মিলে নে কি সেটিমেটাল দীন। সামন্ট কাবে ভেউ ভেউ কলে নোরা কাবে মিউ মিউ করে। আর মা কাবে ছাড় ফাটিয়ে।

নোয়ারা এমন ভাবে বেলে যেন তারা কিছু টের পায়নি। প্রকৃতিত্ব হয়ে নোরার মা বললেন, এত দিন পরে সামন্ট এসেছেন বলে তার বড় অনন্ধ হয়েছিল। ওটা অনন্ধের কুনঞ্জ।

সামন্ট ও নোরার মা শুচিত গজ কিস কিস করেন। সামন্ট বলে, "ও হতভাগাকে ধরে নিয়ে আসি, ওর সঙ্গে নোরার বিয়ে দাও, নোরা হবে হলে অহিমে হবী।"

মা বললেন, "ওবু, তুমি বায়ে করবে না তা আপনি, কিন্তু ওর হাতে পড়ার চেয়ে আইরুড থাকা চেয়ে ভালো। অতএব তাটার ভাল।"

সামন্টের কাজ হলো ভাটার বোরা। অকালে অবহেলায় ভাটার পাঁচা গেলু। নোরা অকস্মা সংক্ষেপে পীড়িত বলে নিচের তলায় পার্দুনীন হলো। বাড়িোনালীর অনেকগুলি টাকা বরবাদ হয়ে গেল।

সামন্টের খুশ গেল বরবাদ হয়ে।

নোরার যা বরবাদ হলো তা মান্য, নায়ক, সরল বিষাদ।

সারাৎ সারুকুম্প হাসি হেসে বললে, "বুরোছায়।"
নজরবল্গা

ভেবেছিলুম, বলব না।

যা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত, যা জগতে কাঁচর কোনো কাজে লাগবে না, তবু বদরা লভিত ও শক্তি উন্নিত হবে অথচ কোনো পক্ষ বিশ্বাস করবে না, তা আমার সঙ্গে আমার চিত্তে পুরুষ হয়ে যায় এই ছিল আমার অভিলাষ। কিন্তু বয়স যতই বাড়ছে অধপ্রত্যাঞ্জলের উপর কর্তৃত্ব ততই কমে আসছে, আমার সত্রথ অভিবন্ধ অভাস করে অবধি মৃত্যু থেকে সংযমের বল্গ। খুলি পড়ছে বলে আশ্চর্য হচ্ছে। বাড়ক্ষে নেমার ভোরে কখন কার সাক্ষাতে কী বলে কেলব, আমার যুগ্মত পরে যথামত ভক্ত। আমার প্রত্যেকটি উত্তর স্বর্ণ করে এবং লিখে তখন আমার দুর্লভ মুহূর্তগুলি অম্বর হতে আমাকে ভাবীকালের নিকট হাজারপাড় করতে থাকবে। এর প্রতিক্ষার আমি আজ থাকতে বহনটে করে যাব। সেই কারণে আজ এই আদর্শকাহিনী লিখতে বসি।

উবাসীর যোগ্য জ্ঞা কিংবা শৈশব কিংবা বাল্য কিংবা কৈশোর ছিল না, সে যখন উদিত হলো। তখন সৌরাঙ্গ গঠিত, আমারও তেমনি জ্ঞান থেকে কৈশোর, উপরন্ত যোবন লোকচুক্তির অন্তরালে লুপ্ত। আমি যখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে আয়ত্তকার করলুম তখন প্রেঠোতে উপনীতী। বাল্যের কথা তালে। মনে পড়ে না, শ্রুতির চোখে চালু শুরু হয়েছে, কাজের জিনিস রূপসা দেখায়। যোবন যে কোন কারিগর যেমন করে চলে গেল আজ কোন দাদেখান করতে গেলে আন্দোলন লাগে। যেমন আমাদের বস্তু খুজু। মৌলিক সময় একটি উঞ্চু হাওয়া দেয়, বিশ্ব হতে থাকে কোথায় কী একটি। আবৃত্ত চলেছে উৎসবের। তারপরই যা হোলো, তা গর্ম।

এই মনে পড়ে, আপনার কথা ভবার অবসর পাইনি। গোড়াতে সম্ভাবণী হবার সংকল্প ছিল, কিন্তু বিশ্ব সম্ভাবনী হতে গেলে যত রকম উপসর্গ চাই কোনটি। অভাব করতে পারলুম না। পলিটিক্স করতে উদ্দেশ্য জান হলো, কিন্তু সে পথ সকলে নেতা, কাজে অস্ত্রগর করব তির করতে পারবারে পূর্বে অনুভূত পুরুষ আমাকে ঠেলে দিলে নেবাকরে। কোথাও রাবন, কোথাও অন্যান্য, কোথাও দুর্ভিক্ষ, কোথাও মহামারী—কিছু না হোক নেবাকরে যা নিচিল—লেহরের পর বছর ঘটিয়ে খাটিয়ে শরীরটাতে ঘূণ ধরে গেল।
অজে যেমন আমি পাঠক-পাঠিকার আহার-নিত্যা কেড়ে নিচি (কিছু কেড়ে নিয়ে করাচি কী! আমার নিজেই যে জিদুপেশ্বরিয়া ও ইনপুলিনিয়া) বেদীি তেমনি আমারও আহার-নিত্যা ঘুচে গেছে। নিত্যা অবশ বিন্য গর্ভতায় পাওয়া যেত, কিছু আহারের সংখ্যা সব দিন ছিল না। কমলার মুর্তি নিয়ে আমি অবশেষে উটলুম মঘুপরের এক বথগ্রাহীবাসে। কে জানি কেন জীবন্তার প্রতি আমার মাঝা ছিল। বাণিজ্যশালায় যে অনাথ, যার উদ্ধারের উপর কেউ নির্ভর করে না, যাকে মেজে দিতে কোনে। দিন কোনে। দৈর্ঘ্য ব্যাকসে এগিয়ে আসেননি, জীবনবিদ্যায় কাছে যার জীবনের দাম কানাকড়ি, তাকেও কেন জানি বেঁচে থাকতে হবে।

মঘুপরে বেঁচের ভাগ সময় বিছানায় পড়ে কাটত। উঠে বসতে বল পেয়েছিনা। না কোনোবাড়ী আজা দিয়েছি, না খেলেছি তাঁর পাশ পাশ। বাণিজ্যশালায়। ওদের সঙ্গে মিশে চেঁটি করিনি, করলেও মিশে পারতুম না। একা একা থাকি। চোখ রুম্ব ভাবতে থাকি এই জীবন্তারকে কাটাতে জানলে কত রকমে কাটানো যেতে পারতি। নিজেকে নানা অবস্থা, নানা পরিস্থিতিতে, নানা মাহাবের সঙ্গে জড়িয়ে কল্পনা করি। সেই সকল মাহাবের মোট ভিতরে, চরতের ভিতরে নিজের কল্পনাকে অন্তরোগিত করে দিই। তারা যেন আমার কাব্যপূর্ণের নোকা। তারা কোন ডিকে ভেঙে যায়, তাদের সঙ্গে আমিও ভাবি, ভাসতে ভাসতে দেখি তারা কোন দৃষ্টিতে যেতে, কোন অথবে ভেঙে, বিলুপ্ত আর তুলে তুলিয়ে যায়। এক কথায়, কাপ্তানিক কাহিনী বাণাই। মন খেলা নয়। এ খেলার বিশেষতা এতে সাধীর আশ্বাস করে না, সরাকাঁ সরাকাঁ না।

বাণাই। কাহিনীগুলি মাঝে মাঝে এতে ভালো। ওঠায় যে মনে হয় হ্রদ্বলি যেন এক একটি অভিভাবক, অতি তত্ত্ব লিপিবদ্ধ না করে রাখলে কল্পেরই মতো। মিলিয়ে যাবে কিংবা ঘুরিয়ে যাবে; পুনরুত্থার করতে কিংবা পুনরুত্থার গড়তে পারব না। লিখতে গিয়ে দেখি আরো মজা, কল্পনা যা অস্পষ্ট ছিল কাহিনীর অংশকে কোন স্থান করলে, যা ছিল মুহুর্তের তা হলো চিরকালের।

কল্পনার মতো কল্পনার প্রাথীতাত আছে। আমি ও প্রাথীতাতে হেঁষ্কে না করে ওকে যতেহতে বিহার করতে মিলে। প্রাথীতন লেখনী শব্দচারুত, বর্ণনাবিদ্যা, রীতিতেরচিত্র স্থান করে চলে।

গল্পরচনার সেই প্রথম দিনগুলি আমি কোনোবাড়ী ভুলব না। সে,
গল্প

আমার, সে ধীরের, সে চমকের, সে অবিন্ধারের তুলনা নেই। আমার মনের মধ্যে এট ছিল। যেন থটনা আপনা হতে ঘটে যাচ্ছে, আমি সাক্ষীগোপাল। চরিত্র আপনা। আপনি বিকির্ণ হচ্ছে, নব নব চরিত্র ঘাটে উঠিয়ে মারছে, পুরাতন চরিত্র ভিজের ভিতর হাতিয়ে যাচ্ছে। মানস প্রয়োগ পুকুলাঙ্গুলি রক্ষামায়ের মায়ের হয়ে উঠছে। ধুল গল্প লেখেক। তুমিই বস্তু।

আহার নিদ্রায় অবহেলার ফলে শরীর সারম না। এদিকে খাস্ত্র-নিবাসের পরিচালক একদিন এসে অগমান করে গেল, ছুমালের পাওনা বাকি। পোটলাপুটলি ফেলে রেখে রাতাতাতি উঠাও হলুদ। বুলিতে আমার গল্পগুলির পাঠুলিপি। সহায়সহন্ত্রার ভাবে এক মাসিকসমারের আপিনি যখন গেলুম ধারোয়ান আমাকে ফকির ভেবে দুকতে দেয় না।

সম্পাল্পক বললেন, “পৃথিবী বর্তমান হলে ছাপালেও ছাপতে পারি, বুদ্ধি পছন্দ হয়। কিন্তু দাম দিতে গেলে লোকসান যাবে। আজনেন তো মাসাই, মাসিকসমারের সম্পাল্পককে গল্প। আমি তুমি দেয় না, মুদ্রা আমি চাই দেয় না, মেলেনি আমি মাছ দেয় না, আর সম্পাল্পকও আপনাদেরই মতো ওসব না বেঁধে গেলে প্রাণে বাঁচে না।”

যাতে, একটা গল্প তার বিন। পৃথিবীর পছন্দ হলো, ছাপেতে বলে আশার ছিলেন। নিজের পোষাফ নিজের নামটা তে ছাপার হওয়ে দেখতে পার।

একটি বড় ওবানে ছু’ বেলা পাতা পাড়লুম। ওয়ের বিরাট গোঁথী, আমার মতো সামাজিক প্রাণীকে একটা কোলে একটি আনুষ্ঠানিক দিতে ওদের আগ্রহ হলো না।

গল্পটি ছাপ। হবার সত্ত্ব দিন না বেঁতেই কী করে যে আমাকে খুঁজে পেয়েছা করলে, আমারির—পুলিশ নয়, অন্য এক সম্পাল্পক। বললেন, “বিশ্বের বাই না? কন্ট্রোলেশনস। আপনার গল্প পড়ে, মসাই, কাল থেকে ধরতে গেলে অত্যন্ত রয়েছে, রাতাই রাতাই যুরি আপনাকে হাতে। কী রিয়ালিসিতুন, কী সুপ্রোপিশিতুন। বাঙালীর সমাজকে অপুরোক্ষ দিয়ে আপনার মতো কে এমন করে দেখতেছে? বললেই হলো। বিশেষ বিশ্বরির ছয়মাস? বিশ্বরি কি বাঙালীকে গল্পনার মধ্যে আজনেন। আমি ঠিক আনুষ্ঠানিক এ এক নব আবিষ্কার।” ভয়লোক গল্পগুলি ভাবে শেষ
নজরব্যানী

করলেন, “আপনাকে লাভ করে আজ সাহিত্যিক সুলভ পন্থিতা, সাহিত্য অনন্য কৃত্তব্য।”

এক নিজের একথা লিখিয়ে কথা বললেও ভ্রমণ হয়ে যায় না। নিঃসন্দেহ নিয়ে হাত দেখিয়ে আমাকে উত্তর দেওয়ার দায় থেকে নিঃসন্দেহ করলেন। “না বলবেন না, বিখ্যাত বাবু। আমি আপনার আলিঙ্গন, আমি আপনার অত্যন্ত প্রথম বিশ্বাসী।” নিশ্চয় কড় জোর আপনার লেখা প্রথম ছেয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের ও কী বোঝে? না বলবেন না। বেশী নয়, একটু।”

ভ্রমণের গর্জন দেখে আমি একটু চাপ দিলাম।
“দেখুন মশাই, গল্পগল্পগল্প গল্প, আমি কুট কে বলেন না।” ইত্যাদি।

ঈষৎ দেখলে নিজের ভ্রমণ বললেন, “বেশ, বেশ, আপনার যখন দরকার, নিয়মের যখন দরকার, তখন—” পাচ টাকা একখানি বোঝাতে বার করে বারবার নাড়াচাড়া করে ঘুরে পড়িয়ে গেল। যতক্ষণ তার দেখে আমাকে ততক্ষণ তার, দিলে তো গেলে আমাকে গেল।

এমন সময় আমার প্রথম প্রশ্ন বোঝা করে কোথায় এসে খুঁক, করে কথা কেঁড়ে নিয়ে বললেন, “ধবনিধর ধর্মুন্ধন বাবু। আমার কাগজের বীর। লেখকে তুচ্ছ পাঁচটা টাকা অকার করে অক্ষম করবেন না। নির্দ্বোধ্যতায় একটি সীমা আছে।”

কয়েক বছরের মধ্যে আমি লক্ষপতি। দশ পৃষ্ঠার গল্প একশো টাকার কমে ছাড়িনি। আমার তেলিশিখানা উপভাষার মধ্যে তিনহাজার তেলিশিখা সংগ্রহ হয়েছে। অপারিত সমালোচক অপারিত মাসিকের চোখ পৃথিবীর জুড়ে আমার প্রতিভার প্রশংসা গান করে। সকলের মুখে এই কথা। বাঙালীর সমাজকে এমন অনুভূতি দিয়ে দেখতে আমার কাজকে দেখা গেল না।

নারীরাও সার্টিফিকেট দিয়েছেন। আমি তাদেরই একজন। আমিও সেই থেকে ডাক্তার পেলো, মুখে মুখে ছাড়ি। নারী মনের নিত্য অফিস বাঁধা। আমি উদ্দেশ্য করে কিছু অফিসের কোনো বোঝান।

নারী রা হয় লজ্জাবদ্ধ লতা। আমি নারীর অভিসারী বোঝ। মেয়েরা ডাক্তার পরে কি কোনো পরে ভাই কোনো মুখ তুলে ডেকেছি, মেয়েদের সঙ্গে আমার লক্ষ্যের সঙ্গে। তা হল কী হয়, আমি তাদের অন্তরাজ। আমার তেলিশিখানা নতুনের কোথায় কেন নারীকার রূপ বর্ণনা। বেশ বর্ণনা। অলঙ্কার বর্ণনা অলঙ্কার করে পাড়বেন না, কিন্তু পাড়বেন
গন্ধ

কী তাদের নিজমুক্ত ভাবনা নীরব বেদনা নিঃসার্থতা ভাগ্য ও সময় সময় কি নিষ্ঠুর উদ্দেশ্যহীন তারা হতে পারে। কিন্তু তা বলে ষরতান তারা নয়। তারা দেবীই। 
বাতে তাদের দেবী বলে চিনতে তুল না হয় সেজন্যে আমি তাদেরকে বেচ্ছায় কৃতো সাধনা করাই। তেমন কৃতো সাধনা ইদ্রের শাল তো দূরের কথা নিবের পার্থীবী করেননি। কাজেই তারা দেবীদের চেয়েও দেবী। বিশেষে ধাতুদ্ধাতুর গাছের বেশারাই ব্যাপ্তচিন্তা, বি-রাগের উচ্চারের সাহিত্যাত পড়ে, বিশবারা তে বিদ্বত্তব্য অপগামতা। চরিতের আদর্শ কাঠের বলেই ওরা জ্ঞানহীন, ওরা নির্ধর—কার এটি? না, প্রেমাস্পদের এটি। প্রেমে পড়তে ওরা করে না, কে যে ওদের প্রেমিক তাও ওরা জানে, কেবল প্রেমের যা সহজ ও স্বাভাবিক পরিসত্তি সেইটে ওরা বাচিয়ে চলে। নায়ক-নারিকের 
একটি চুম্ব বিনিময়েরও জো নেই, আলিঙ্গন তে। অভাবনীয়।

নারীরা তো। আমাকে তাদের একজন বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, 
অন্তরাল ও আমাকে নিজে নারীদের সঙ্গে কাড়াভাটি করেছেন, আমি যে 
তারোগের উজ্জ্বল। আমার নায়কগুলি সাধারণত বাঙার পয়সায় উক্ততা। 
প্রেম যখন ওরা পড়বেই, না পড়ে ছাড়বে না, তখন ওদের জন্যে সে ব্যবহার 
আমি করে থাকি। সমাজে উঝা ও বিশ্বাস নায়ক হুট বোঝার শাসন 
বিদ্বান ধারতে প্রেমের ভাবনা কি? কিন্তু প্রেম তো জীবনের সরঞ্জাম 
নয়, যেখানে প্রেমের, সামাজিক সম্মানের প্রয়োজন। 
তুলন মনের বড় জারের 
শুয়ে প্রেম, কিন্তু কোন পান্তরের রাজনৈতিক এসে শ্রেষ্ঠভাবে দিলে তুলনের অন্তর 
বলে, চাইতে, চাই মান। আমি রিয়ালিটি বলে হাসতে কেন? কারণ 
আমার নায়ক বেশারকে কিংবা বিধবাকে বিবাহ করতে না পেরে রাজকুমরি 
ও অর্থের রাজনৈতিক লাভ করে। জাত কুল গণ গোষ্ঠী সমষ্টিশেষের পর্যন্ত টিকে 
হয়। অধিকাংশ অক্ষের রাশি রাশি টাকা ও প্রহরের মধ্যাহ্ন।

স্বজাতীয়ের মিলিত এক ইতিমধ্যে আমাকে গড়ের মাঠের জীবিঠেরের 
মেতা। অশ্চন্ত করেছে। এখন মনে হয় ঐ যখন আমার অস্পষ্ট অবিকার, 
আমার প্রকৃত হীন। ব্যাখ্যাতে আমি সংঘর্ষে এক্ষণ কৃত্তে পেরেছি, কোনো 
জন্ত তা নিয়ে উদ্দেশ্যে উন্নয়ন বোধ করিন। তবু 'ভক্তি' ও 'শক্তি' অভ্যন্তর 
বেশারের মেটা আমারও অণুষ্ঠান জুটিয়েছে। ব্যাখ্যাতের এখন জোঁগাতেই হবে—

ষি বাস্ত্রীভাবের নারীকের কাছে মত বাড়ি করেছি, বিল অভেত না
নবরবণী

পারার অপমানকে বাধা করতে। শরীরটা সারেনি, প্রকাশকরা ধান্য দিয়ে বেন তেমনী হাড় থাকিয়ে নিয়েছে। ভক্তরা অনাহূত ভাবে এসে করেন- নিন আমার এখানে পথ এবং মাঠ হাওয়া থেকে যায়। বলে, সর্দিতোকে সারিয়ে তুলুন, বিষেৎ বায়ু। দেশ আগনার কাছে এখনে। অনেক আশা রাখে। দোবেল হাইজ, এখনে জল থেকে তাড়া তোলা বাকি।” আমার ফটোগ্রাফ ও অটোগ্রাফ নিয়ে এবং আমার বহীরের এক সেটের উপহার দিতে হবে আনিয়ে ওয়া। “আবার আলিব” বলে পরম আগাছিয়ে করে বিদায় হয়।

সব চেয়ে অশ্চর্চি, এই আমার বয়স, এই আমার বাস্ত্র, তবু এখনে আমার কাছে জীবনবিশার এজেন্ট ও বিধেয় ঘটক আনাগোন। করে। তাদের অভ্যস্তর জমা একটা সশস্ত্র ওর্জন পুরুষের, তাতেও ফল হয় না। তারা আসে আমার ভেজর চুয়াবেশ। আমার উপহার বাছাবিক ও পরে গুড়েছে, কখনো কখনো এর পাকা পরিচয় দেয়। নিম্নুলা করে নতুন কী লিখি, কবে প্রকাশিত হবে, “বন্ধ ও বিপ্লাব” গল্পটার অন্তরালে অভিস্বাদ কী, “কার যায়” গল্পটার শেষ অমন হলো। কেন, ইত্যাদি। তারপর ধীরে ধীরে প্রস্তুত পাড়ে। ভক্তকে ভাগিয়ে দিতে পারিনে। এজেন্টকে বলি, “কার জন্য বীমা করব আমার তিন কুলে কেউ নেই?” অপশু কথাটা। সত্য নয়। আমার মাস্তুত ভাইরের খুবতুত ভাইরা ও পুত্রকন্তারা ঘন ঘন আগমন করায় আমাকে সর্দা সর্দা থাকতে হয়। তারা আর কিছু না হোক সেকেল কৃষি শহীদভাবে না গেলে নতুন না।

এজেন্ট বলে, “আগনার মতো লোক ব্যারেণর মতো কেবল নিজের ব্যারেণ ভাবলে দেশের অর্থুত্তা কেমন করে হবে। দেশের কাছে অনেক পেয়েছেন বিদেশের বায়ু। দেশকে কিছু দিন।”

ঘটককে বলি, “বানগ্রহের বয়স হলো। এই ভীতি শরীর。”

ঘটক বলে, “সবাই ভোগায়নের শরীর। ভোগ সম্পূর্ণ না হলে বানগ্রহের বিধি নেই। শরীরের তথ্য নেবার জন্য চাই একটি গুণবতী গ্রন্থ, তার নাই বা ধারক রূপ। ( রূপ ধারকে তো তাকে রূপবতী বলতুম।) হলোই বা তার কিছু বেশি বয়স এবং পিতা যদি তার দরিদ্র হয় তাহেই বা কী? আগনার মতো পরোপকারী দেশবাস্ত্ব একটি কমবাহারের উদ্ধার করলে চিরকাল নাম থাকবে।”
একটা মোটা গোছের বীমা করতেই হলো। যে আসে তাকে দেবিয়ে বলি, "একটা আছে, আর পারিনে।"
কিন্তু ঘটককে ও কথা বললে পারিন কই?
গোপন করব না। ওদের ইচ্ছিত আমার বড় ভালো লাগে। একটি কল্যাণী বড়ু আমার আয়র লক্ষ্য আপন সীমাস্ত ও কর্মুক্তিকে ধারণ করবে।
একটিবার ভাববে, "ওগো।"। একটি শিক্ষা বা কথা আমার কোলে উঠে একটিবার ভাববে, "বাবা।"। যে সময়ের অগ্রিম লাভ করেছি তিনি সে সময়ের দেবী। যে সময়ের পদ্ধতি আমার ঘর গড়ে পড়ল না তিনি মঃমায়া।
বিভ্য লোকের ফি বলবে। আমার দুর্গ ভবন করবে না কন্তাভরের সম্ভাবনা, বললে বলবে, যে-মেয়ে আমাদেরই কোনো একজনের হতে পারত রুদ্ধী তাকে টাকার জোরে আমারাত করবে। আমার নারীভর।
আর চিঠি লিখে উচ্ছস্ত জানাবনে না। আমি যে আজ্ঞা বঞ্চারী, আমি যে কল্যাণী তীব্র, আমার এই প্রতিপর্থ আমার সৌনার যুক্ত। একটিবার মাঝায় সৌনার চোপর গলে এই সৌনার যুক্ত চিরকালের মতো কথা।
জানি আমার চেয়ে বয়স্ব বড় অনেক সাহিত্যিক এখন। দ্বিতীয় তৃতীয় যুক্ত সৌনার চোপর গলে। বৈঠক পদার্থের রসায়ন বালি বিকৃতিক কৃত্রিম হবার নয়। কিন্তু আমার তো প্রভূতি হয় না এই বয়স্ব।

আমার ভাবি কী এমন বয়স। যদি কোনো কল্যাণী এই রোগাইকুর দেহটার উপর বীমার বিষ্টর মতো হুমে যায় তবে এই ভিতর থেকে যে কষ্ট উঠবে বাংলাদেশ তার অহংকার শোনেনি।

না। কোনাদিন ভালো করে বীলেরকের গানে তাকাইনি। লজ্জায় করে, ভয়ও করে। বীলেরকে কথনা করেই আমার ভদ্র, প্রতিজ্ঞা করতে আমার বংশ।
এই তো বেশ আছি। তাকে তেইশ বাই তেইশটি শিক্ষা মতে শোভা পাছে। দেখেন নিম্নস্তরের চক্ষু জুড়িয়ে যায়।

মনের যখন এইরূপ সৌনারিত অবস্থা তখন একান্ত একান্ত চিঠি পেলেন।
খামের উপরকার লেখা থেকে জানলো বামা হতের লেখা। আর একান্ত এশংসাপত্ত হবে। তবু পড়ে দেখতে কোলুক হলো। যেমন প্রত্যক বাক্য হয়ে থাকে। এশংসা জিনিসটা পদাতিক মতো। ক্ষমতাশালীর পক্ষে নিশ্চয়ে জন, অন্ধ একবার ওর বাদ নিলে প্রত্যেকবার নিজে দোষ হয়।
কে একজন মঠী দেবী বিয়ননভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন সমন্ত চরিত
আমি কোথায় পেলুম? তাঁর বঙ্গুমের ধারণা। আমি তাকেই মনে করি স্যামনাকে এক্ষেত্রে। কিন্তু তা কেমন করে সত্ব?—তিনি জানতে চেষ্টিয়েছেন।
—আমি কি কখনো তাকে দেখেছি? চিনতেছি? যদি না দেখে থাকি, না চিনি থাকি, তবে কেমন করে তাঁর মনের ভাবনাগুলি পর্যন্ত আরম্ভ করেছি? আমি কি তাঁর সত্যিইর মূখে তাঁর মনের কথা অনিচ্ছি?

আমি একটু রাগই করলুম। প্রকাশত্বের বলা হলো আমি ফোটোগ্রাফার। যা আমার শক্তিতেও কমিন্নকলে বলেছি। নিজের ঘরে বসে নিজের প্রাণের কথা লিখি, কারণ বাড়িতে নিম্নরন্ধন রক্ষা করতে যাননে, অপেল আমার তবে আক্রমণ করে আমার জ্বতি রক্ষা করে যাতে এই তো আনন্দৰ। ওদের মধ্যে কেউ কেউ পুরুষের মতো কারণে পরে না বলে তাবাই যে নারী এই অহর্নন্দ করি। নইলে নারী বলে যে একটি জ্বতি আছে তা আমার অজানত না হলেও অর্থতর করে। ভাবের সাহায্যে নির্ভীর ভক্তলোকের এমন হৃদেশেল গলি পাড়িতে তো দেখিনি। এক এক প্রকাশ স্বাদ যা ভ্যাটিনাকে বহন করতে হয়। চার পথে চলতে করে যে কোনো শক্তি সে বেচারার সকলে বেলাটার প্রশান্তি নাশ করতে সমর্থ।

একটা জ্বতি লিখেতেই হলো। রাগ করতে আমি খুশি। কিন্তু এক জ্বতুম যে যা লিখত তা একদিন না একদিন কাগজে ছাপা হবে। একিচ্ছ লেখকের বাড়ির খরচের হিসাব পর্যন্ত ছাপা হয়। লেখনীকে সম্পূর্ণ করলুম। মজরী দেবী তাঁর নামের অন্ত্বর বর্ণনা দিয়ে ‘কুমারী’ শব্দটি বিনয়ে দিয়েছেন। লেখক হামাটিও কথা। বয়স বিশেষে নিচেই হবে যতদূর আঞ্চল হব।

“কল্যাঞ্জ্যাখু” ও “তুমি” লিখতেই রাগটি জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। দেখলুম বক্তব্য তা ছিল কেমন করে তা রূপান্তর ধারণ করেছে। “না, আপনাকে জীবনে সেখানে।”—এর স্থানে লিখলুম, “তোমরকে যদি দেখে থাকি তবে সে আমার নিজেকে জীবনের মিলায়, আমার আপন মনের মূর্ত। হয়তো তুমি যখন জ্বতুনি তখন থেকে দেখা। আমার আপন আইরিন্ন। অন্যের গৃহে তুমিই হয়ে মঞ্জুরী নাম নিলে, আমি আনন্দ না, তাকে এঘো নামিয়ে হৃদে নামকরণ করলুম।”

কয়েকদিন পরে আমার সেই আকারের নীল ধাম, সেই হাতের লেখা। খুলতেই একখানি ফোটো কুল করে গড়ে গেল। রূপবর্ণ। আমার আগে না।

যা তা উপসা দিয়ে গাছে মহানকে হাসার করে তুলি সেই ভরে মঞ্জুরীর
প্রতিক্রিয়াকে বিলোপন করব না। শুধু এইসব বলব যে হৃদয় বাড়ি কমলোক চেরো মরলোকে অবতার্ণ হতো তবে এই স্পষ্টই পরিগ্রহ করত।

লিখেছি, রাম না হতে রামায়ণ কেমন করে রচিত হয়েছিল তা একমিন্ত বিখ্যাত করেনি। মনের প্রবণতা সংশয়ের লিকে। মা পুরাণকে ইতিহাস বলে বিখ্যাত করেন এজন্যে তাঁর সংবাদ করত তর্ক করেছে। আমার এই যে অতিমান্যক্ষ পুরোধীর পরিচয় হাতে হাতে পেলে এতে ওকে সংশয়বাদীর প্রতি সংশয়প্রকাশ করেছে। ওর কিছুদিকের ছায়া হওয়া বৃথা। কিছুদিকের তো এই রহস্যের নিরক্ষণ নেই। অবশেষে সমুদ্র পূর্বে নিবেদন করেছে, “হে মনোজ্ঞ মনীষী, আমার প্রণতি এই করন।”

পুনর্দিন দিয়ে জানিয়েছে, “একবার অন্যান্য পাঠাতে হাতৎ বেশাল হলো।”

এর উত্তরে আমার কিছু বলবার ছিল না। ছবিখানাকে অটি সত্তাপর্ণ
বাস্তবত্ব করলুম, বাইরে রাখলে পাচে কেউ তুলু ভাবে। মাঝে মাঝে বাস্ত
বাস্তবত্ব পালে আলোচ চূলে দেখি। আমার মাসে হৃদয়কে যে প্রতিরোধ ছিল এ কি
সত্যই সেই? হা, সেই। “মনোজ্ঞোন্তা” যদি নট্টাকায়ে অভিনন্দিত হয়—
যেমন আমার “গোয়ালা প্রেমিক” হয়েছে—তবে মঞ্জরীকে নূরিতিত মানবে। ইতিমধ্যে একখানা নতুন উপস্থাপ আরম্ভ করছিলুম।
তাই নিয়ে এত নিষিদ্ধ ছিলম যে দাড়ি কামতে চলে যাবার মতো। মঞ্জরীর
ছবি দেখাও তুলুল।

কিন্তু তুলতে দেয় কিনা? আবার সেই খাম, সেই গোটা গোটা অক্ষর
আমার নাম-চিহ্নান।—“আমার প্রতিদিনের প্রতীক্ষা ব্যঃ। এক পূর্ণাঞ্চ
একবার চিঠি লেখা আপনার জন্যে কিছুই নয়, কিন্তু আপনার এক একটি ছত
আমার খাট পানিয়। আপনার বাস্তব আলোকে আমি জীবনের পথে দেখতে
পাই। হৃদয়কে অনুমােন করে চলেছি—আমার পুরুষচরিত্রী ছায়া সে।”

এর পর কোন ভক্তের ভজন স্বত্ব ধারোতে পারেন?

“বে কথা কথো” লিখতে লিখতে আলাদা কাগজে মঞ্জরীকে চিঠি লিখতে
গুরু করি। কিন্তু লেখার কি আছে? আমার বাচ্চাদের তালী, আমার
বাঢ়া কুলুক, আমার মানীর হাত। ছেলে, এদের বর্ণনা দিয়ে কোনো মতে
একটি পৃথক ভরানো গেল। লেখার হাত যত্ন আছে তার হাতের ছায়াও
সোনা আনে।
নজরবন্দী

এমনি করে সে যাতে উচ্চ পাওয়া গেল। কিন্তু মঞ্জীর ছাড়ে না। তবে ধারা না তার পরবর্তী গলা পরিসূচিত করলে। সে চায় সাদা দিন এখানে করে আমার চিঠি। চাইলেই পারত সাদা দিন এখানে করে আমার কোনো। 

বুঝল না যে দর্শনের চাঁদাকে লেখার মতো বিষয় আমি কোথায় পাব। ধরিবের "মূর্ত" নিখে একারাটার বলে ধাচনের "মূর্ত"। আমার অধন কোনো code word নেই। পাঠক-পাঠিকাকে যখন পাড়াবার বাধা দিয়ে বিধাতা আমাকে পাঠাননি। বিষয়ের অভাবে অপত্য তার সেই অ্যাপ.টিবানা। —যার সর্বদের আগের বারে অভিদিত দিয়নি বলে সে অভিশাপ জানিয়েছে— 

তার সর্বদের আমার ধারণা আজন অর্থাৎ গোপন করলুম।

এর পর সে লিখেছে, সে যে বাতাবী নয়, সে যে আমার কলালোকের বাসিন্দা, কর্মশ তার চেতনার ভিত্তি এই অস্বীকৃত ব্যাপ্তি হচ্ছে। সে মঞ্জীর নয়, সে হমন। সে পৃথিবীতে নেই, সে আছে সেই অর্থস্বরূপ যে—

ভাবতে হচ্ছে "মনোভাবনার" অন্যায় চিন্তা—ময়বারেশ, অপরাজিতা, 

পাচু হানামায়, জুড়ো মালী, তেম তুমুল। মঞ্জীর হিসেবে তার বন্ধার কলা দেখা 

দিয়েছে, সে মরে যাবে। হমন। হিসাবে সে অমর। আমার প্রতি তার 

ক্রন্দ্যকার সীমান। নেই, আমি তাকে প্রাণলোক থেকে তুলে নিয়ে অমরলোকে 

পৌঁছিয়ে দিলাম।—একটি মরা গোলাপ ফুল চিঠির গায়ে একটি দিয়েছে।

এক্ষণে এক একখানা চিঠি আমাকে অভিন্ন করে আমার বিদেশে নানা 

দিয়ে যায়। হমনকে মঞ্জীর ও মঞ্জীরকে হমন। বলে প্রতারণা করলুম না 

তো। অতিরিক্ত? না, না। সত্যই বলেছি। কবি তার কল্পনার উপাদান 

এই পৃথিবী থেকে আহ্রণ করে। কথনা সজ্জন, কথনা অজানাসারে।

সেই উপাদান দিয়ে গোলকচূর্ণ অলোকে সে গড়ে মানব-মানবীর অক্সিড।

অবশেষে একবিংশ ঐ মূর্তিগুলিকে প্রত্যাপন করে পৃথিবীরই হাতে। উদিকে 

অম্বুরূপ উপাদান দিয়ে একত্রিত মাতৃগুরের অলকায়ে মানব-মানবীর মূর্তি 

বানায়, যথাকালে ঐ মূর্তিগুলিকে পৃথিবীরই কোলে তুলে নেয়। দুই সেট। 

মানবমানবীরমূতির মধ্যে এমন ছটি যে খুরালে নিলে না, যাদের সাদৃশ্য কেবল 

ভাবের নয়, রূপেরও? মনের নয়, মুখেরও? ব্যাপারটা অবিশ্বাস হতে 

পারে, কিন্তু সত্য। হোসেনিওর ফিলসফিকে এর সম্ভাবনা পাওয়া যাবে না, 

কিন্তু হামলেট একে ব্যাপক দেখেছে।

আমি অভিন্ন হয়েছিলুম মনে গড়ে। মঞ্জীরকে লিখেছিলুম তার
চিঠির হস্তে প্রাঙ্গণ হলে আমি অর্থ সংহায় করতে পারি। চিঠির হস্তে নিয়ে ডাকনা হয়েছিল ওখান। হয়তো কোনোদিন ছাপা হবে, তখন অন্যান্য ওর বিবর্ণ ব্যাখ্যা করবে। করক, বিশ্ব মঞ্জীর বেঁচে থাক। তার নিজের পক্ষে যেমন আবশ্বক, তেমনি আমার পক্ষেও। কল্পেতাকে জীবিত বলে জানা আসাখার সৌভাগ্যের বিষয়, জগতে এর পূর্বে এমনটি ঘটেছে কি না সম্ভব। একাডামর পিগমেলিয়ন তার নামিতি বিশালতিতে প্রাণকারী বেঁধেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। সে অথু প্রবাদ। এখনের নামিকা এই হৃদয়ের সম্পত্তি উপস্থিত হয়ে কোনোদিন কি বলেছে, “আমি শুক্তলা?” বা “আমি হৃদয়স্থা?”

আমার যুত্তর পর আমার এই ভাবের গড়ে বন্ধুরা বলবেন, বুড়ি বয়সে আমি হেরে বিখ্যাতবাদীর বুদ্ধিভঙ্গ হয়েছিল। তার সীমায় পক্ষাবলী বছর বয়সে নিজেই তিনি এই তারিখে শিল্প অথচ বালিকা রূপে কোনোদিন দেখে ভাবার সম্পূর্ণ ভঙ্গ গেলেন, গল্পের মধ্যে বিস্তারি অর্থের ঘুচে গেল। একটি ভূত্র করলে প্রাকাশ পেত যে মহনা দীর্ঘ বন্ধের দাদা একে ভেসে বেড়ে থেকে জলে বাঁচিয়ে গেছে তুলেছিলেন।

শুধু বলবে, বিষয়ের সাক্ষী বুদ্ধিভঙ্গ বে হয়েছিল সে বিষয়ে আমারও লিখেছিল। তবে তার সঙ্গে কিছু অসাধুতা ছিল। সোভালি লিখেছিল হতে। এমনকি তিনি কোনোদিন চাই প্রেমেনি, সুমন চরিত্রটি কল্পিত। লিখেছেন কিনা মেটেটেক তিনি তার জন্মের আগে দেখেছেন। বিষয়ের নিরাপদের। বোকা মেয়ে এই বড় সময়ে পাঠালো তার চুবি। সে চুবি আমাদের চোখে গড়েনি, তবু আমার চোর করে বলতে পারি যে স্বর্ণনার বে চুবি বইতে ফুটেছে—অর্থাৎ ফোটারা নিকল চেষ্টা কর। হয়েছে—সে চুবির সঙ্গে ও চুবির সারুষ থাকতে পারে না। কিন্তু নেশার ঘোরে বৃষ্টি মহারানী লিখেছেন কিনা একই চুবি। এর পর যদি মেটেটের বর্ণনা না সারে, মাদ্ধি পড়ানো ও বালিকায়। চাও করে অলসভাবে ধান করতে থাকে যে সে সমন্তে মতো। তিনি তিনি করে মরলে সেইটেই হবে রোমাঞ্চিত যুত্তর, তবে সেই বিপর্যয়ের জন্য আমার পরজন্মের নারীতাতে বিষয়ের তাজুড়ী।

ছই পক্ষী তুলতে পারে গোড়াতেই। তাই এ স্থানে খুব স্পষ্ট ভাবায় বলি যে মহনার সঙ্গে আমার পত্র ব্যবহারকালে আমার কোন। একার
মনোজ্যোতিঃ হল না। বাকাওলো আমি সংশোধন না করলেও তাহীকান করবেন। অতএব মঞ্জীরনি প্রশ্নে ফিরি আসি।

মঞ্জীর লিখিলে, আমি যে ওর চিকিত্সার অন্তে অধৰ্মাহ্যায় করতে ইচ্ছুক এতে আমার মহাভাবতরঃ মহামানবতরঃ আর একটি নিবারন গেয়েছে। কিন্তু কী নাড়। এই একই রোগে তার বাবা মারা গেছেন, তার বাবাও। এমন কেউ নেই বার জন্য বেঁচে থাকতে চালো নাগে। মা অর্জ কাচেন এবং মারা। কিন্তু ওঁদের সম্ভে তার অন্তরের রোগে নেই। অধু রত্নের সম্ভ। ওঁদের চেয়ে আমি তার আভায়তর। কিন্তু আমার জন্য বাচা জন্ম হুই সমান। চিকিত্সার আমার শ্রদ্ধেতে সে থাকবে।

আমারও মনে হয় ও যে বাচতে চাইলে না এর সত্যিকার কারণ "মনোজ্যোতিঃ"র সুমনে বাচেনি। সুমনে সে অনুমতিও করছিল চোল ব্যক্তি। আমি ধরি সুমনে দিন দিন মিলিয়ে যেতে না দিয়ে বাচিরহ তুলতে তা হলে একধানা উপায়া মাটি হতো, কিন্তু একটি মায়া বাচারের প্রস্তুত গেই। Goethe বাবা "Werther" লিখে কত ব্যক্তির আভায়তর হেতু হল, ভাবিয়ার "মনোজ্যোতিঃ"র লেখাকও কত মঞ্জীর যুতুর ভাগী করবে। কী করেই "মনোজ্যোতিঃ" লিখেছিলে ও কেন মঞ্জীরকে বিধ্যা বলেন এ জন্য আমার পন্থাতাপ হয়। যখন যুধিষ্ঠির বিধান বলছিলে, আমিও বলতে পারতুম। কিন্তু আমার তো পুরোহুটি ছিল না। আমি দৈবজ্ঞ নই, জানতুম না যে মঞ্জীর যুদ্ধ সেখা দেখে দেবে।

আর একটি থেকে আমি তা পরীক্ষার অবকাশ পাই না। "মনোজ্যোতিঃ"র সুমনা কুন্দের গড়ের মতো মিলিয়ে গেল, পৃথিবীর কুলার তার অধুর না। সুমনার সঙ্গে মঞ্জীর যখন এমন অলৌকিক সাদৃশ্য অক্ষর দু' জনের যে একটি পরিমাণ হবে এ তো বিধাতর বিধান। এমন তো হতে পারে যে কুশ-লবণের যুথে রামায়ণ গান শোনার পরে সেই গানের বিবরণকে অন্তর্গত করা হলো। রামচন্দ্রের শেষ জীবনের কাজ ও সে কাজে সাহায্য হলে তার তিরোধানে।

মঞ্জীর যে সুমনা এ বিষয়ে তার সংশয়রাহিত্য তাকে মৃত্যুর অক্ষর প্রকাশ করে রেখেছিল। যা অনিবার্থ তার গায়ে ভাকারী কবিরাজী ইত্যাদি নাট্য প্রফার ঠেকায় দিতে তার অগ্নিত্ব ছিল। তার মা ও মায়ার অবশ নিজেদের কর্তব্য করছিলেন। কিন্তু কালে। মেয়েকে বাচাতেই হবে এ রূপ লুপ্ত সংক্ষে
গল্প

কাহারোর ছিল না। তার বেঁচে থাকা এমন কী জরুরী! লেখাপড়া শেখাচ্ছিলেন, যাতে নে জীবনে একটা অবলম্বন পায়। তারা তাকে সমুদ্রের ধারে বাস করতে নিয়ে গেলেন ও আশা করলেন যে ওই তার জীবনরক্ষার পক্ষে করবে।

এতি সম্পাদিত পুরী থেকে পেতুম সেই নীল থাম, সেই হাতের লেখা। মন্ত্রার পীর পদক্ষেপ তাকে চক্তি করেনি। তারা আছে বিখ্যাত, তুল-চুক্ত করেন, এমন ভাবে যে লেখনীর গতিতে ব্যক্তি করেনি, লেখাতেও না। বা খাটার তা ঘটতে যাচ্ছে, বছর অর্থ নেই, শক্তি ও অমূল্য। দশ এগারো মাস এই ছিল তার ধারা। তারপর হঠাৎ তার অস্ত্র গেল বেড়ে। দাক্ষিণ্য তাকে চিঠি লিখতে নিয়ে করে দিলে। লুকিয়ে লিখতে গিয়ে সে ব্যক্তি ও উত্তেজনা প্রকাশ করল। আমাকে একবার দেখতে চাইলে।

এখানের আলাদা। তবু সাক্ষাৎ করবার কথা কৌনসিল মনে অঠিয়ে নি। প্রায় আমাকে বিভক্ত করে তুলল। দেখতে না পেলে মন্ত্রীর বেঁচে নিয়ে মরবে। আর যাওয়া কি আমার মতে। এলোকের পক্ষে মুখের রঙ? আমার গতিবিধির 'সর সমগ্র দেশের নজর। আমি আমার দেশ-বাসীর নজরবদনা। বলতে কাজের রিপোর্টের আমার উপর পাহারা দিছে। মনোরম থেকে কলকাতা গেলে সাড়া পড়ে যাচ্ছে, হাওড়া স্টেশনে ক্যামেরা ও আটোগ্রাফের বাহাত ছুটে করে পায়ের উপর ভর দিয়ে ভিড় করে আসে। পূরী যাচ্ছে, তার পেলে স্পেসেশাল এক্সপ্রেস সঙ্গে চলবে। মন্ত্রীর সঙ্গে আমাকে অন্তত কী অপর রোমান্দ রচিত হবে কে জানে? বদরু লক্ষিত হবে, শক্তি চিটারী লেখে, বেচারী মন্ত্রী মরেও নিজতি পাবে না। তার নাম মুখে মুখে ছড়াবে, ইত্যাদি। তার নামে ছড়া কাটবে।

না, মন্ত্রী, যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমাকে তো তুমি মার্শিকের সামাজিকের তৈরীকের ছবিতে দেখেছে। আমার বাগীও সম্পাদে সম্প্রতি নেন। লেখাধুনার কিছু বাকি আছে কি?

আমার চোখ দিয়ে কোঁচ। কোঁচ জল টাপ টাপ করে পড়ে আমার নূতন উপরায় "সভার সতীন"-র পাতা শেষ ভিজাল, অকর মুছে দিল। সে বে সিঁড়ি রেখে রেখে নয়, মৃত্যু যার অবধারিত তার জন্মে শোক করে কি হবে? আমি যে তার সামাজিক স্বাভাবিক পূর্ণ করতে পারলুম না কোন এই জন্মে। আমি লক্ষণসমূহ, রেলভূমি জন্যে ভাবিনী। গরিব কোনাকিঃ
মতো ছুট চেয়ে পাইসি এও নয়। আমার ভয় আমার ডাককামড়েক, আমার প্রতিশ্রুতিগণকে। পাপিন অধ্যাত্ম সেবাকর্মী ছিলুম, ততবিন মাছুরকে ভয় করিনি। আজ আমার ধ্যাতি আমাকে রেল প্ল্যাটফর্মের পানবিদ্যায়ালার নিম্নািতীক করেছে।

দিন কয়েক পূর্বে মঞ্চরীর বড় মায়ার পত্র গেলুম। যা অহমান করেছিলুম তাই—মঞ্চরী নেই। যা অহমান করিনি তাও ছিল। মঞ্চরী নাকি মৃত্যুকালে বলে গেছে যে আমি তার গৌরী।

বড় মায়া জিজ্ঞাসা করছেন, তা কেমন করে হলো? কেমন করেই হোক মঞ্চরীর মা নেই সম্পর্কের স্বত্ত ধরে শীবই এখানে আসছেন আমাতা বাবাজীকে আপীলি করতে।

আমি আকিং ধরলুম।

(১৯৩০)
গাথা পিটিয়ে ঘোড়া

আমি বয়সে তরুণ না হলেও আমার মনটা তরুণ এবং আমার লেখনী তাকের লক্ষ্যকে তাই দশটা তরুণ লেখকের নাম করতে বললে লোকে আমার নামটাই করে সব আগে, আর গালাগাল যখন দেয় তখন আমাকেই দেয় সবচেয়ে বেশী। তা জিনিস, নিম্নাষ্ঠ আমার আন্তঃ কমে না, তাই মনটাও তরুণ থাকে। উপরন্তু আমার নামটা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। দৈনিক সাহিত্যিক মাসিক বিনা পর্যায় আমাকে বিজ্ঞাপিত করে। আমার কার্টুন যা ছাপে তা আমার চেহারার চেয়ে দেখতে ভালো। টাইমে টেনে বাসে মেসে আমি চারের লোককে আমার নাম তত্ত্বাবধায় ওঠে কোনো ঠাকুর- দেবতার নাম তত্ত্বাবধায় ওঠে না। এখানে বলে রাখি আমি যে ঠাকুর-দেবতার প্রতি কটাক্ষ করলুম তারা শরীরের বর্তমান। না, আরে খোলাসা করে বলব না।

সখ্যাতি ও অধ্যাত্রির মধ্যে গেলে যাই থাকুন, উভয়ই খ্যাতি। আমি খ্যাতি ভালোবাসি। পথে যেতে যেতে যখন কানে পড়ে কেউ কিছু ফিরে দিয়ে অন্ত কাউকে বলেছে, "ইনিই তরুণ সাহিত্যিক মহেশ মহলানবীশ" তখন আমি অনেক কষ্টে আনন্দ সংরঞ্জ করে গান্ধীর রক্ষা করি।

আমাকে খ্যাতির চেয়েও যা উৎসুক করে তা তরুণ সাহিত্যিকের খাতির। তাদের সকলে যে সাহিত্যিক এটা একটু বাড়িয়ে বলা, হয়তো বানিয়ে বলা। কিন্তু তারা সকলকেই তরুণ—বয়সের তরুণ। সক্ষমতা তারা কম্পাসের দশটা দিক থেকে উন্নত্ত্বাবধায় যাপুর মতো। আবিষ্কৃত হয় এবং আমার বৈঠকানায় বলে আমার চা-সিরামেট উঠাড় করতে করতে আমার গলে উপড়াস নিয়ে বুঝতে মেতে ওঠে ঠাকুর-দেবতাদের। কথা জনলে ততটা বেতে ওঠে। আমি যে তাদের একজন এই আমার গুরুত্ব হচ্ছে। তারা যে আমাকে বাড়া বলে, মামাকি কিংবা খুঁড়ে বলে না, এই আমার অতিথিদের চরম পুরষ্কার। তারা আমাকে তাদের নিজের নিজের রচনা লেখতে দেয়, আমি আগাগোঁড়া পড়বার যুগাং পাইনে পেলেও পড়তে তত্তা বোধ করতুম। তবুও ঐ সব একসারসাইদের ছুট্টায় জাগায়ন লাগ দিয়ে মনে রেখে দিই, কথায় কথায় উচ্চার করে লেখকদের উদ্দার করি। ওরা অবাক, কুঁড়ে ও কুঁড়ে হয়ে যায়।
গীতা সত্যিই রোদ্ধা

অতু তাই নয়। ওদের রচনায় যেটুকু ওদের ধর্ম, যেটুকু ওদের তাত্ত্বিক, সেটুকু আমি চেষ্টা দিবে আলাদা করি। কাজে আতিথিত্য, কাজে বিধি, কাজে ধর্মচারী। তবে গানের প্রথ যখন চুরি করি তখন অনিয়ে ওঠিয়ে চুরি কর। নিরাপদ আন করি। “ওবে শ্লোকে, তোমার ঐ গল্পটা আমার এমন ভাবো লেগেছে যে, তোমার কাছে আমার উপরে এই—তুমি তোমার প্রাচীন আমাকে গুরুদেরণ। দাও।” শ্লোকের বাদ করি ওটা কোনো কৃত্রিমতাল নভেল থেকে তুলেছে। ও কাজ করতে তার কুটা নেই। আর আমিও ব্যতি মাছুফ। কৃত্রিমতাল নভেল পড়ি কখন? এতে আমি অভাব কিছু দেখিনে। প্রেরের গানে কপিরাইট লেখা নেই। কৃত্রিমতালমাত্র যে কাজ কাছ থেকে সরিয়েছে যে বলতে পারে। যদি শেখরীগীর ছাত্র হাতে প্রাচীন লুক করেছেন। “পূর্বাপেক্ষায় মাথে মনী কালে। বন্ধু দেখি?” শেখরীগীরের বেলা। কোনো সত্ত্বগুণ অপহরণের অপবাদ দেয় না!

আমার তর্ক ভাইগুলির মধ্যে প্ররজিঙ্কে আমি একটা বিশেষ সেহ করি। ও আমার প্রসন্ন করে কাজ হয় না। ও আমার চোরাই গানের উপর বাটাপাড়ি করে। ভাষা নকল করে, শিরোনামা জান করে। আর তাম্রাণ সেখন, আমার হাতে দিয়ে বলে, “দাদা, একবার। সেখে দিন।” আমি তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলি, “শাবাস! সে যদি সত্যি সত্যি আমার কাক মারতে পারত তা হলে আমি তাকে ধাককে দিতে ইত্যাদি করতুম না। আমি জানি আমার একটা শুন আছে যা বাংলা দেশের অন্য কোনো সাহিত্যিকের নেই। আমি অবচেতন মনের মনীরী। কিন্তু দেশের নায়ক নক্তের তো আনতে আমার বাকী নেই। ওয়া ভাজে বিদেশে, বলে পটল। আমি তুলি পাকে। কিন্তু তার অংশ একটু গঠাযুক্তিকা মাধ্যমে দিয়ে। আমার গল্পের গঙ্গ তোঁকে পাঠক ভাববে পুণ্যালঙ্কর্ত করেছেন। কারণ পাপকে আমি শ্রুণ ভাবে দেখাই সমস্তকে পাপমুক্ত করতে। আমার বইয়ের শেষ পাপাত্ত। আগে পড়বেন। শেখরের পাপের শান্তি আছেই। অন্তত পাপীর ব্যর্থতা আছে, ভুঁষণ ব্যর্থতা। এই অভিজ্ঞ আবিষ্কার করেনি। তার সত্য যথার্থ তুলি। বুদ্ধি করতে পারে না। তাই তার বইয়ের বিচিত্র হবে না। পরস্পর সমালোচক তাকে বলবে মহাদেশ মহালীগীরের সমর্থনীয়।

প্ররজিঙ্কে আমি বিশেষ সেহ করি তার আরো একটা কারণ আছে।
নে হলো কানাই বাচ্চপত্তির চেলে। ।“উষ্টা রথ” প্রণেতা প্রচারনংরে পুরোধ। কানাই বাচ্চপত্তিকে কে না চেন। দৈনিক পত্রে প্রতিদিন ওর বেড়া কলম বরাদ্ধ। লাইন পিছু এক আনা পায়। তা হলো বুরুন ওর মানিক আয় করা। আমার এত বড় প্রতিষ্ঠান আর নেই। আর কিছু না হই আমি একজন এম-এ। আর কানাই হচ্ছে কুটী বাচ্চপত্তি, পাঁচ টাকা দেখিয়া কোনো এক পরিক্ষা পরিষ্কার থেকে উপায়ি গ্রহণ করেছে। অবশেষ কানাই অধুন যে মোটামুটি জনবাসী টাকাটা পাচ্ছে তাই নয়, তার নাম আজ গ্রামে গ্রামে। তারপর কানাই আমাকে অকারণে ঠুকছে। আমাকে ঠুকছে, আমার তরুণ ভাইদের ঠুকছে, আমাদের যা বাড়ি তাকে খোঁটা দিছে। আমরা নাকি এই সনতন সমাজের মরা গানে পাঠাতে সমূদ্রের কর্মক্ষেত্রে কোরাচ্ছ আন্তর। আমরা নাকি বাংলার পুরুষকে বিলিয়া হতে, বাংলার কুললোকের কুলটা হতে উদ্ধুপিত হিছ। অরে। কত কি। তবে রক্ষা এই যে, কানাই রামমোহন রায় থেকে ঐবরহম বিধ্বসনাগর পর্যন্ত কার্যকর মূলপত্তি করতে চাহিয়ে না। ও বেশ অঠালা শত্রুর কোলেশনরী জোয়ারের প্রেতায়। বিকৃত শত্রুর সমাজের সৃষ্টি এর করেছে।

ওর চেলে শর্জিত আমার কাছে ওর নিন্দা করে, ওর জীবনকাশ্য ওর আশ্র করে, এতে আমি বায়ুবিক ভাবি খুশি। খুশি না হওয়াই অবাকায়ি হতো। একবার ভেবে দেখুন কানাই লিখেছ আমাই যথি সবচেয়ে বিশ্ব বাংলা কথা। পরকে আপনার করা, পরের চেলেকে ঘরের চেলের চেয়ে সমান করা, বাংলার সনতন বৈশিষ্ট্য, অধিকারিতর ধর্ম সনতনঃ। তার স্থানে স্থানে খবর গায়ে পড়ে আমাকে দিয়েছে কিল্লা চড়ত। কথা নেই বর্ষ। নেই অন্যদের মাঝখানে আমার নামটা চাপা রেখে ( তা-ও যদি নামটা উল্লেহ করত )। আমাকে নিয়েছে একহাট। “তথাকথিত তত্ক্ষণ লেখে কেহ কেহ বাঙালীর পরমেশ্বরী জামাতা বায়ুজীবনকে লইয়া পথ-হাটি বুঝিয়াছেন। নিজের কল্যাণে কলামার পিছিয়া গেছাইয়া। বেহ-দুর্লভতাময়ী খ্রিস্টমাতাকে জামাতার নাম। করিতে এই কুড়িগুলার কেমন করিয়া প্রবৃত্ত হয় ?”

শর্জিত বাগকে জানিয়েই আমার কাছে আসে, কেয়ার করে না। বলে, “পালানি, আপনার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক লেইটে সত্য। ওর সঙ্গে সেটা সেটা অকষ্ঠিক।” আমি বলি, “তোমার নাম শর্জিত, আমার নাম মহেশ। কী রকম অর্থীকর। তুমি এই লিখোলে লোকে ভাববে আমি ছেলেমান নিয়েছি।"
গাথা পিচিয়ে ঘোড়া

স্মরণিতি ইহাত্মা বোঝা না। ওর বাণের মতে ওর বুদ্ধিটা বুখ। কেন এবং কেমন করে ও বিপদের শিবিরে এসে বিভাজণ হলো, সেইতে আমার আচরণ ঠেকে। এমনো হতে পারে যে, ও অপর পক্ষের চর। সরলতার ভান করছে। কিন্তু আমি ওকে প্রায় এক বছর কাল পর্যন্ত করে মেছেনু। সত্তাই ওর মনটা শান। মনটার শান। বলে গড়নটা মোটা। চূলধুলা। কোকড়া কোকড়া, পাকটা বোচা, হাটে ধরণ ধরণ করে, ওর সবলা বিগতিটায়। ওর যখন পিঠ চাপড়ে দিয়ে তখন মনে হয় ও যদি পুনরা বেড়াল হতো ততকে মোলামের হৃদে ভয় ঘোড়া শপথ করত।

তরুণদের সঙ্গে সাহিত্য চর্চা করতে করতে আমি তাদের মে ক্ষমতায় ব্যাখ্যার ব্যাপি হতে পেরেছিলছু, স্মরণিতি তাদের অবশেষ। তারা হুমকো পেলেই তাদের প্রার্থক কাহিনী আমাকে ভেঙে বলে। তাদের ব্যাখ্যার অভিজ্ঞতার গল্পে আমাকে কথনো ঘুম পাইয়ে দেয়, কথনো বললো নিজে যায়। তাদের রশমের উপায় যখন যখন আমি বিশাল করি তখন বলি, "এমন ঘটনা আমার জীবনেও ঘটেছে, আমি এটা নিয়ে একটা উপায় লিখ
ঠিক করে রেখেছি।" আর যখন বিশাল করতে পারিনে তখন বলি, "কোন
বাইতে পড়েছ, বলে ফেল।" কিছুক্ষণ প্রতিবাদ করিয়া পরে প্রেমিক পুকুর
দীক্ষা করে যে, সবটা ঘটেনি, কিন্তু এই বলে তর্ক করেন যে, আমার
থাকত্ত তাও ঘটনার সামল। আমার এই পয়তালিক বছর যত্নে আমি
আর কিছু না পেরে থাকি একটি জানতে পেরেছি যে; আমাদের অধিকাংশ
তরুণ নিউরোটিক। আমার কাছে যার। আসে তাদের অধিকাংশই
ব্যাখ্যাপের দেখে ও নতুন পড়ে অভিজ্ঞতা করে গ্রহণ করে ও নিজেদেরকে সেই অভ্যন্তরের মাঝখান বলে ভাবতে ভাবতে সত্যি
সত্যি তাই হয় যায়। গৌরধাল বাণে যখন নতুন না পড়া পাঁচ কিংবা
থোঁদো—যাদের ভালো নাম হলেন। কিংবা আরতি—তাদের অত্যধিক অপ্রবৃত্ত
করে। অথবা পাশ না হতে পারলে বাণ কঠিন কথা বলেন। অথবা পাশ
হলেও মার্চেন্ট অফিসে পর্যটন ভয়ে ভাবিনি না-জন্মুর হয়। সাহেবের সঙ্গে একবার
ই-টারেন্ড পেলে ফি শৈলী কাটিন্ট নাই সাহিত্যে নব। অভ্যন্তর সঙ্গে ছুটুর
কথা বলবার ছল পেত না? ছুটো কোটেশন ও নইটা যাত্রিলার বিশেষ নিজের
বুদ্ধি বিশেষ ও উদ্দেশ্য সফল করত না?

স্মরণিতি ঠিক নিউরোটিক না হলেও কালের হাওয়া তাকেও সমীক্ষ করেছে।
নে আমাকে গিয়ে ডেস বলে, "দাদা, আপনাকে বিয়ে করতে সত্ত্বে চাইনে, কিছু একটা খবর না দিয়ে বিয়ে নিতেও পারিনে।" আমি অগত্যা চেয়ে দেখে আমার বসি এবং ঠাকুরের বলি সবুজ করতে। অর্জিত পছন্দ দিয়ে তাকিয়ে বলে, "এগারোটা। কিছু এককণ ওরা সব ছিল, ওদের কাছে কি বলা যায়?"

"কী কথা?"

ার্জিত গৌরচ্ছিক। বিষ্ণু করে। আমি ধামিয়ে দিই। আমার কাছে লজ্জা কিসের? আমি তো ওর খানামা। আমিও তো তোদের।

আর্জিত প্রেমে গড়েছে।
এতদিন পড়েছি কেন তার কৈফিয়ত দিক।
কাউকে এতদিন যেন ধরেছি।

যেন যেন বলি, অর্জিতেরও যেন ধরবার দামী আছে, যদিও তাকে কাঁকু মনে ধরা দুর্ঘট। তারপর?

তারপর অর্জিত কবিত। লিখতে শুরু করেছে, কিছু কেউ দেখিয়ে দেবার লোক নেই। এই বলে সে এক তাড়া কাগজ বার করে আমার হাতে পড়ে পড়িল। সংগৃহীত মৃত্যু-বন্ধ। ভাবের ভাবনায় মৃত্যুবন্ধ ভাবে ধারণা।

ব্যাপক কষ্ট, হে আমার ব্যাঙাঠি
ঠাও ছুটি
প্রতিদিন তোমার গলির পথে
পেলুলাম সম।
তুমি থাকো জেনানার আনালা আড়ালে
তোমার ব্যাঙাঠি
কানেই ওনিনি শুধু অনেকটা প্রাণে।

তার স্পর্শ। আমাকেও ঈর্ষ্যি করলে। আমি এত কিছু পারলুম, কিছু একনা। মাতে মিল জোটাতে পারিনি বলে কবিতা লিখতে পারলুম না।
-অর্জিত আমার চোখ পুরি। দিল। আমি পড়তে পড়তে ভর্তর হয়ে গেলুম।
তুমি যে উঃ শোন অর্জিত নও
নও বিয়াটুল
আর্জিত নও
নও হেলেনা বে
গাথা পিটিরে যোদ্ধা  

তাই তুমি সত্যত্ত 
তাই তুমি আমার  
প্রেয়সী। 
তোমার ব্যাঙালি 
কানেই গুণিনি অম্ব গুনেহ প্রাণে।  
আমি নিজের সবলাভাগরি একটি করবার জন্য জায়গায় জায়গায় বদলে—  
দিলম। পরিবর্তিত সংস্করণ এইরূপ হলো। 

“হে আমার ব্যাঙালি”—ব্যাঙ কহ—  
“ঠাং ঠাং প্রতিদিন পেশুলাম সম।” 
“কোনখানে?”  
“তোমার গলির পথে”—ব্যাঙ  
মত মত করে। 
“তোমার ব্যাঙালি”—ব্যাঙ মুখ ফুটে বলে না—  
“কানেই গুণিনি অম্ব গুনেহ প্রাণে।” 
তারপর মুখ ফুটে—(বলে)—  
“তুমি থাকো জেনানার জানালা আড়ালে।”  

এর পর আমিও কবিতা লেখা ধরলুম। কাগজে যখন ছুটি একটি ছাপা হলো কোনো কোনো সমালোচক ওগুলির নাম দিলে “গবিতা” এক প্রতিষ্ঠাতা বানাল প্যারাডী। এই তে আমি চাই! শ্রুতি সকলের অদৃষ্ট জোটে না, কিন্তু দূর্বল জোটে ক’জনের অদৃষ্টে? আমার মতা ক্ষুদ্রতার পুরুষের। আর দূর্বলে আমার হার হলো। কই? কাগজওয়ালার। আমার গলা আর কবিতা চেয়ে বিনামূলে ওদের গলিকা পাঠায়। ধাম দেবে না— 
সেটা আমি। কিন্তু নাম তো হবে।  

ইতিমধ্যে পররজিতের পাদের পেশুলাম হুলিনীদের পাড়ায় আন্তরিত হতে হতে আঙ্গোলন তুলেছে। তাকে একসময় পাকড়াও করে হুলিনীর বাবা তার বাবার নাম ঠিকানা। আমার করে কানাই বাচ্চাজ্ঞাকি চিত্র লিখেছেন। পররজিত পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বাগাকে ধরা দিচ্ছে না। তবে আমার এখানে হাজিরা দিয়ে যায়, বিষ্ণুভাবে জ্ঞানসা করে,—“দাদা, ব্যাঙালির বাড়ি ঠাঙালি থেতে তব করিনে। কিন্তু ব্যাঙালিকে না দেখতে পেরে বাচব না।”
গাথা পিটিয়ে যোড়া করা আমার পেশা নয়। আমি ইংরেজ মাস্টার নই।

তুমি দরজায় হাত নিলুপ। কানাই বাচসপ্তির উপর শোধ তুলতে হবে। সমর্পণ আমার অন্য। ওকে বললুম আমার এখানেই উঠতে।

তারপর চুলনিদীর বাণের কাছে নিশেই গেলুম ঘটকালি করতে।

তিনি আমাকে বললেন রেকর্ড চড়িয়েছেন চুলন জল্লোলাকে শোনানি।

আপনি স্বাতন্ত্র্য বিচিত্র গল্প করে তোলের উপর চাপড়া মাঝে মাঝে।

আমাকে দেখে বললেন, “আমারই নাম তিনকড়ি, বন্ধন।”

আমি প্রথমে বুঝতে পারলুম না এই সকল বলা গান বাজনার এ আয়োজন কেন।

“এই আমাদের নিউ মডেল। কেমন পরিকার আওয়াজ। কেমন মজবুত মেশিন। দাম মোটে হল্লো। দারুণ টাকা। আমার কাছে কিনলে দশ পারেস্ট কিমত পাবেন।” এই বলে আমার দিকের তাকালেন।

আমি ছাড়া যে চুলন আগতভাবে বললেন তাদের একজন মাঝা চুলকাতে

চুলকাতে বললেন, “হেই হেই হেই—আমাদের অনেক একটি কাজ ছিল। আরে এর পরিচয় নিই। ইনি হলেন পাঠ্যাঙ্গ কানাই বাচসপ্তি।”

তিনি বড় চক্ষু বিদ্যমান করে চেয়ারের ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, “এক কথায়

বললেননি! না জেনে বড় অপরাধ করেছি। ওর ও ফেলুন পান নিয়ে আসব।”

হাত ছোড় করে বাচসপ্তির মত একটি নমস্কার করে ভুলকের

দুইশাড়িয়ে রইলেন। বাচসপ্তি মৃদু হার্স করতে ধাকলেন। আমিও বাচসপ্তিকে

অবহিত হয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলুম। দিবা বলীবদ্ধের মতো অকার ও

গাথা পিটিয়ে যোড়া করা আমার পেশা নয়। আমি ইংরেজ মাস্টার নই।

তুমি দরজায় হাত নিলুপ। কানাই বাচসপ্তির উপর শোধ তুলতে

হবে। সমর্পণ আমার অন্য। ওকে বললুম আমার এখানেই উঠতে।

তারপর চুলনিদীর বাণের কাছে নিশেই গেলুম ঘটকালি করতে।

তিনি আমাকে বললেন রেকর্ড চড়িয়েছেন চুলন জল্লোলাকে শোনানি।

আপনি স্বাতন্ত্র্য বিচিত্র গল্প করে তোলের উপর চাপড়া মাঝে মাঝে।

আমাকে দেখে বললেন, “আমারই নাম তিনকড়ি, বন্ধন।”

আমি প্রথমে বুঝতে পারলুম না এই সকল বলা গান বাজনার এ

আয়োজন কেন। তারপর তিনি নিশেই আমার সংশয় ভঙ্গ করলেন।

“এই আমাদের নিউ মডেল। কেমন পরিকার আওয়াজ। কেমন মজবুত

মেশিন। দাম মোটে হল্লো। দারুণ টাকা। আমার কাছে কিনলে দশ পারেস্ট

কিমত পাবেন।” এই বলে আমার দিকের তাকালেন।

আমি ছাড়া যে চুলন আগতভাবে বললেন তাদের একজন মাঝা চুলকাতে

চুলকাতে বললেন, “হেই হেই হেই—আমাদের অনেক একটি কাজ ছিল। আরে

এর পরিচয় নিই। ইনি হলেন পাঠ্যাঙ্গ কানাই বাচসপ্তি।”

তিনি বড় চক্ষু বিদ্যমান করে চেয়ারের ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, “এক

কথায় বললেননি! না জেনে বড় অপরাধ করেছি। ওর ও ফেলুন পান নিয়ে আসব।”

হাত ছোড় করে বাচসপ্তির মত একটি নমস্কার করে ভুলকের

দুইশাড়িয়ে রইলেন। বাচসপ্তি মৃদু হার্স করতে ধাকলেন। আমিও বাচসপ্তিকে

অবহিত হয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলুম। দিবা বলীবদ্ধের মতো অকার ও
গাথা পিটিয়ে যোঢ়া

আবৃতি। মৃদুত মতে বিঘ্নমূলক শিখা। পাগল পণ্ডিত চট্ট ও গারে কোয়ারা চাষর।

বাচস্পদির সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল সেটি বোধ করি তার আপিলের কেউ হবে। সে বললে, “এই যে—এই—আপনার কাছ থেকে একথানি পত্র গেরে বাচস্পদি মশাই একাংশ বিলিয়ে হয়েছেন। তিনি দেখতে যে বার্গ দিনের পর দিন গুনিয়ে যাচ্ছেন এক কথায় সেটি হচ্ছে এই যে অর্থসই নিধনঃ শেষঃ পরধর্ম। তায়াবহ। অর্থসই কাছে বলি? না, যা খদেশের ধর্ম। আর ধর্মই বা কাছে বলি? না, যা লোকটার। তারই জোট পুত্র সঙ্গে আপনি যে অভিযোগ এনেছেন তার থেকে অমূল্য হয় যে, তার নিজের পৃথেই পরধর্ম—ঝাঁঝার—বিভূতীয় কোর্টশিপ বৃদ্ধি শিক্ষা অতীত হচ্ছে।”

বাচস্পদি মৃদু হাত করতেই ধাকলেন। দেখে মনে হলো। না যে তিনি কিছুরাত্ম বিলিয়ে।

নেই লোকটি নিখোঁজ নিয়ে তার বক্তার অনুরূপ করলে। “বাচস্পদি মশাই যথা নামকরণ সমাধিপতি।” তিনি অভ্যাস্তরিক শব্দে নিজেকে অত্যন্ত বিপর্যয় হতে দেখে হন। তার মত এর একাংশ পাতির মতী পরিবর্তন। কিন্তু ব্যাপার পুত্রের মতী তিনিই বা সহপত্তের বাধ্য নয়। অতএব নিতান্ত দাসের পুত্রে তিনি স্বর্ণ করেছেন—রতনান্তর নিপাত হয়ে তিনি প্রত্যাহার করেছেন যে—

বাচস্পদি অমনোযোগের ভান করলেন। আমি মনোযোগের বরাদ্দি ব্যাক্তির দিলের। গ্রামমারের এজন্য তিনকাংে বাড়িতে হীরে করে নেই লোকটির কথানি গিলিতে ধাকলেন।

“প্রস্তাবটা বেশি কিছু নয়। বাচস্পদি মশাই যখন বিপর্যয় ও মেয়েটি বিবাহযোগ্য। তখন আপনার দিক থেকে আপনি না ধারাকার সম্মান। ধাকলে কিন্তু আমরা আপনার উপর গীড়ারো করতে অনিচ্ছে।”

তিনকাংি বাবু প্রতিষ্ঠিত। আমি তথ্য। বাচস্পদি তখন। মৃদু চিন্তে হাতে ধাকলেন। আর সিঁড়িতে কার পাগলের শব্দ শোনা গেল। পান হাতে করে ঘরে ঢুকে সবাইকে নমস্কার করলে একটি সতেরা আঁকারা বছর বয়সের একটি। মৃদুরী নয়। কিন্তু স্থান্ত্রিত। পান দিয়ে এক পাগলে চুপ করে ধাড়াল তার বাবার আদেশের অনেকদিন। তিনকাংবাবু বোধ করি তার সঙ্গে বাচস্পদিকে মনে মনে মিলিয়ে বেঁধছিলেন। আমি তাই করছিলুম।
গল্প

বাচ্চপ্তির ব্যবস্থা একটি গ্রন্থে তাঁর গায়ের রং ধবলবে শাদা। মুলিনের বিপক্ষে তেমনি একটি গ্রন্থে তাঁর গায়ের রং মুলিন ভাল। সে গা মেজে আসার সময় পায়নি, পেলে হয়তো মুলিনের স্বল্পে উজ্জ্বল লিখতে পারতুম।

তিনকড়িবাবু মেয়েকে যাবার অচ্ছাদি দিয়ে বাচ্চপ্তির বাজায় প্রতিষ্ঠানে বললেন, “এ আমার অশাস্তিত। কল্পনাতীত। ধরণাতীত। তাই মন্মহীর করতে আমির সহায়তা লাগবে। বুঝলেন কিনা এসব তো, এগোফোনের ব্যাপার নয়—”

প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক বলে মনে হলো। তিনকড়ি দরদ্ধর না করে মেয়ে ছাড়বেন না, এটা তাঁহাতে তাঁর দুমিনিট লাগন না। “বেশ, অশনিতে চিন্তা করবেন, আমরা। মেহন মুহালা বীরের সাগরের হয়ে ছেলেটা বেঁচেছে। নইলে বাচ্চপ্তির এমন কী গরজ।” কিছুক্ষণ নারী থেকে সমস্তে—“আশি মশাই, পর্যটন স্টেশনে। সারাজীবন এগোফোন চিঠিদে মাহবু চিঠিদে না। বাচ্চপ্তির চর্চে চর্চ পাত্তুকা ও গাত্রে উত্তরীয় দেখেছেন, বায়ে যে তাঁর নিজের কেনা অস্তিন ধাড়িয়েছে সেটা দেখেননি। তালতলা গলিতে যে তাঁর নিজের করা বেশ থাকলার আছে সেটা দেখেননি। তাঁর পকেট নেই বলে তিনি যে মারের পায়লা তাঁরিহে গড়ে তিনশো টাকা কোনঘাট দিয়ে দিয়ে যান তাঁও অচ্ছান্ন করতে পারেন না। আর এ তো আপনার মেয়ে। বসল পাড়িয়ে কম হবে না। আর বাচ্চপ্তির বেলে চুয়ানিজ বহর বয়স, তাঁর মধ্যে তেরো বছর বিপত্তীক।”

আশি একবার খবরের কাগজের আড়ালে মৃদু লুকিরেছিল। মেহন মুহালা বীরের কার্তুন কেনা না দেখেছে? ওরা যে এতক্ষণ চিঠিতে পারেনি এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে ওরা একটু পরে চিঠিতে পারবে না।

তিনকড়ি লম্ব গলেন। তোল্লাটে তোল্লাটে বললেন, “২-৩-তা আমার পাচটি নয় সাতটি নয় একটি মাত্র মেয়ে। এ-এ এইবার আই-এ দেবে। গ-গ-গরিব হলেও আমার যে একবারে কিছুই দেই তা নয়। সোমাসুদ্ধ না বললেন, কেদ কিছু সহ চাইছি, কী নাম আপনার?”

“গিরিজা পত্তি—”

“গিরিজা পত্তি বাবু।”

ফালাই তাঁর বিরাট বন্ধু নিয়ে উপবেশন করে উপভোগ করছিল, গিরিজা পত্তি তাকে ঠেলা দিয়ে বললে, “উঠুন বাচ্চপ্তি, উঠুন। আপনার
সময় এত বলরম্য্যল নয় যে, চাইলেই দান করে ফেলবেন। কালকের কাগজেই তিনিকের বাজার মেলের কোটিশিক কাহিনী ছাপা হবে। আমি আপনি ভোঁ বেষ্ট পৃষ্ঠা উপর লিখতে যাচ্ছেন, ওকেই এক আয়েরাখা একটি কলকের খোঁচা—

বলতে বলতে ওরা ঘুরতে বেরিয়ে যায়ে মোটরের উঠে বসল। তিনিকের বাজুর কান্দি কান্দি হয়ে আমাকে আবিষ্কার করে বললেন, ”দেখলেন তো মশাই গুণগুমি।”

আমি অসহায় বোধ করছিলমু। কানাইদের হাতে দৈনিকপত্রের শিলনোভা। দৈনিক একটি করে তিনিকের দাত ভাজেন। তিনিকের মামলা করতেও রাজি হবে না, পাচে পারিবারিক প্রাইভেসি সংখ্যা হয়।

বিরক্ত হয়ে বললুম, ”কাই মশাই, কনক দাসের এক সেট রেকর্ড দেখালেন না। আমি কখন থেকে বলে রেয়েছি।”

তিনিকের উদ্বিগ্ন হয়ে, ”এই বে, এই বে” করতে করতে রেকর্ডের বাজা ঘটিতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিনেই কথা পেলেন না। তার মন ছিল অত্যন্ত। বোধ হয় অন্দরে, গৃহীত অঞ্চলে। আমি দ্বী করে উল্লম্ব। বললুম, ”থাক মশাই, অবধির দেওয়া। টিকনাও দিয়ে যাই। সময়মতো পাঠিয়ে দেবেন।”

আমার কার্ড পড়ে তিনিকের বাজু ভান মাথা করে হাসলেন। —”কী লোভাগ্য, সন্নীতী আপনাকে কতবার লেখতে চেয়েছে। আপনার সময় বই ওকে কিনে দিতে হয়েছে। একটি অধিগত করে বসতে আমার করেন তো ওকে বলি চা করে আনতে।”

আমি ঘাড় নাড়লুম। অক্স একদিন আসব। এ পাড়া ও পাড়া।

মনষ্কিতে ভার বিনুমু। সে রাজি রাজি "মুক্তক্ষণ" লিখে বিরহ উদয়পুর করছিল। আমার ভাব মুন থাবাসেই উপচার হয়েছে। আমি টান মেরে বললুম, ”ওসব রাখার রাখো। কাজের সময় কাজ, লেখার সময় লেখা।”

ও থেকে ভয় পেলে। আমি একটি নরম হয়ে বললুম, ”তোমার বাবা সন্নীতীকে হিয়ে করবেন বলে ফেলেছেন। এ বিষয়ে বলতে চাই-ই।” অন্তর্ভুক্ততি তিনিকের দৃষ্টি পরে বাচ্চপতির পাত্রে না হলে পাত্র পাত্রে না।

মনষ্কিতে মুখ তকিয়ে গেল। তার চোখে জল দেখা দিল। তার হাত থেকে কবিতার খাটা মেজেতে পড়ে হাওয়ার উড়ল। সে একবার বললে, ”ও হো হো।” তারপর বললে, ”আমি বাচব না।”
আমি ধরে দিয়ে বললুম, “আল্লামা বাচব। ও মেয়েকে বিয়ে করতে হবে তোমারই।”

যেহেতু কানাইতে বললে, “খমার করেন দাদা। বাবা যার দিকে দুঃখ দিয়েছেন সে আমার মা। মা মাহাপাপ।”

আমি সেখানে রাগ করায়। এ ক্ষেত্রে তুলো পলিনী। তা হলে মরজিত হাতছাড়া হবে। কানাই জিতে যাবে।

আমি মরজিতের মাধ্যমে হাত রুলিয়ে বললুম, “সেই বীরে যে ঠিক সময়ে ঠিক কর্ত্তাত করে। সেই পুরুষে যে নারীকে অভিযাত্রী হাত থেকে রক্ষা করতে ইত্যাদি করে না, অভিযাত্রী৷ যেহে হোক৷”

গাথা শিটেই হোড়া কি একদিনের কাজ? হলুদানরে পরে মরজিতকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিজের যে, সে হুলিনীকে যেমন করেই হোক বিয়ে করবে। ওদিকে কানাই তিনকড়িকে নিয়ে বিয়ের তারিখ ফেলেছে। আমার কাছে কাটাকের একখানা নিয়ম পড়ে এসেছে। কানাই যে খুব মুখোমুখ করে যেই আনতে যাবে এ গুরুত্ব আমি তার আপিস থেকে আনিয়ে নিয়েছি।

বিনাপনে বিয়ে করে দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে সে। বিধানত্যুতে এই সংবাদ গেয়ে একবন্ধ তাকে অভিব্যক্তি করে এক প্রাণার্থে ইতিমধ্যেই তার কাটাকে বেরিয়েছে।

আমারও রোধ চেপেছে কিছুতেই এ বিয়ে আমি হতে দেব না। আমার ভক্তি গ্রহণ। কানাইরের হাতে পড়ে আমার নিন্দা অন্তে খারাব যে এ কাছের কলামে পড়া মেয়ে একটা। “রাজনিষ্ঠ” পড়ে ইংরাজী শেখা চাহতুরী পাশ টিকিওলারার ঘর করবে যে অসম্ভব। থেকানে বয়সের সামর্থ্য নেই, শিক্ষার সামর্থ্য নেই, রুচির সামর্থ্য নেই, এখানে বহুদিন আশা লেশমার ধীরে পাবে না।

বিয়ের দিন মরজিতকে ডেকে চুপি চুপি বললুম, “রংধুনী বামুন সেখে হুলিনীর বাড়ি বহাল হতে হবে। ওর বাবা তোমাকে বারবেশে দেখেছেন, ধানি-গায়ে সেখেলে চিনতে পারবেন না। ওদের বাড়িতে কানাই বিয়ের ঠিক ঠিক, কে কার যোধ রাখে। এক সময় হুলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলার সাদা নটার আমি নেমাট নিয়ে গলির মোড়ে প্রভূত করব। তোমার একে তোমারের একে রে রাজেশ বিয়ে দেব।”

রংধুনী বামুন সেখে ওর লজ্জা, হুলিনীর সঙ্গে এখান। করতে ছাড় এর শখ।
এবং হুলিনীকে বিয়ে করতে ওর বাসনা, এই ক্যাটারাম পড়ে ও কমন হয়ে
গাথা পিটেরে ষোড়া

গেল। হোর বলে না, না-হও বলে না। ন বধু ন তবে। আমি বাধাকে বললুম, “কি হে, জানিতে উচিত ছিল প্রতিমা যখন” আরম্ভিত করতে যাচ্ছিলে। ঐ সাহেবের একটি কণা বেদান্তে বিষয়ে করেছে, যতদয়ার আখ্যায়িকের টাকা পাবে, হয়তো মারাত্মক লেখকও হয়ে দীর্ঘতা পারবে।

ওকে তালিম দিলুম। ওর নাম কর্মমূল। ওর বাড়ি পুরুলিয়া। ফলকাঁধার নিয়ন্ত্রণ এনেছে কাঞ্চু খুঁড়াতে। কে ওকে বলেছ এ বাড়ীতে বিয়ে। ওর রাগার নমূনা দেখেছ। ঐলুলুক মহেশ মহলানবীশ ওর রাগার আশঙ্গা করে ওকে সুপারিশপত্র দিয়েছেন।

ওকে করেকটা রাগাও শিখিয়ে দিতে হলো। কানাইলের চিরিন্দ এই সমৃদ্ধি ছিল না। কানাইল কথা ভেবা করে খেত তখন স্রষ্টাকেই রাগ করতে হতে। সে সব সে একবারে ফুলে যায়নি, তবে ভোলবার বজ্ঞ করছে। তাই আমিও শেখাবার ভাল করলুম।

বলিদানের পাঠার মতে চোখের চোখকে ওঠে, একবার এপারাই, একবার বিশদে ধূঢ়, একবার ফেরে। ওকে তিনক্ষুবর গলির মাথায় পৌঁছা দিয়ে আমি একবারের শেষ শিক্ষা তাকে চোপে গাড়ি ভাঙ্কিয়ে দিলুম।

ওর উপর আমার ভয় ছিল না। শেষ পর্যন্তই হয়তো তিনক্ষুবর তিন
তাড়া খেয়ে শিখিয়ে দিতে। তিনক্ষুবর ওকে চিনে কেলেনও পারেন। সেনার আমার এক পুলিশ বন্ধু কাছে। খুলেই বললুম। না বললেও চলত।
কেননা কানাইলের কাগজ ওকে থুকেছে, ওর রাগ আছে কাগজের কর্তারের উপর। ও বললে, “কিশু করতে হবে না। কানাইকে আমি চিনি। অন্ত ভাল লেখে খুওঁ ভাবতে নেই। আমি ওর আপিসে কোন করে জ্ঞানাঙ্গি, দেখবে পাওয়া গেছে ওর লেখা পড়ে মুসলমানের। কেনেছে ও যেন একটি কলকাতা ছাড়ে।”

ওই ওইমতে কি পালন হবে? আমার সংস্কার গেল না। কিন্তু তারিখ
বললে, “ফলেন পরিচালন। তুমি সবর করে দেখ, এ ঠিক মেওয়া করখে।”
গলিতে ওকে অনেকে গেলুম একজন আরেক জনকে বলছে, “আবার বাধা।”

“কি বাধা, মসাই?”

“হিন্দু-মুসলমানের দায়। চোনেননি, কানাইল বাচনিকির পুষ্টিকা
ঝামিয়েছে?”
গল্প

আমি পুলকে নিউরে উঠলুম। নির্দিষ্ট স্থানে গাড়ি রেখে হর্ষ বাজালুম। সরিন্দা ও তার বড়ু আসে না। বিবাহ সন্ধায় উপস্থিত হয়ে দেখলুম দক্ষিণের মাঝে ব্যাপার। গাড়ির অর্ধেক খালি হয়ে গেছে, কলকাতা ছেড়ে উঠাও। গাড়ির চাকর-বাকরেরও বলছে, “আমাদের ছেড়ে দিন, কর্তা। আমরা গাড়ি তোহাঁ।” নিজের থেকে মহিলাদের কাছে রোল কানে আসছে। আমাদের সমস্ত স্বর্ণ রাখানি বায়ুমের বেশে পেশুলামের মতো একটি রেখা ধরে একবার অর্থের দিকে ছুটে যাচ্ছে, একবার সংসার দিকে ছুটে আসছে। আমি তার গতিরোধ করে দাড়ালুম। বললুম, “কী ঠাকুর, কে হয়েছে?”

তাকে নেপথ্যে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে বললুম, “Mind your own business. নিজের কাজ করুন।”

এখনো সে সন্নিধানীর সঙ্গে সংক্রান্ত হয়ে গাড়ি গাড়ি। অকর্মণ্য! কলকাতা ছাড়বার আজ নিয়মে সন্নিধানী ব্যাপার হয়ে রয়েছে। এই তো মস্তক। তাকে তাড়া দিলাম, “যাও, দেখা করে নে। তুমি ওকে উঠার করতে চাও।”

লে কি শোনে? গুলু বলে, “হায় হায় বাবা।”

আমি প্যারভিত করে বললুম, “হায় হায় হায়!” তারপর তাকে ধরে নিয়ে আমার গাড়িতে তুলে দিয়ে এলুম। সে যখন আমার গাড়ি গিয়ে নেমে নিয়ে দেখালুম। তার বালার কথার নিয়ে যেন নিজেদের বাড়িতে যায় না। সেটা গুরুরা যে রাতে করেছে।

“এই যে শ্রীমুখ মহলনবিশ।” তিনক্ষণ বারু উত্তালের মতো বললেন, “ওকথা বিষয়ে কেরেন না, বুঝলেন? মাধার উপর ভগবান থাকতে এ কি কথনা হতে পারে? আমার দশাটা। একবার ভেবে দেখু তো ভগবানের উচিত?”

আমি মনে মনে বললুম, ভগবানকে যত বড় ভাবুক লোকে মনে করে তিনি তা ডাক নন। মহেশ তার উপর ভোলকারী করবে। দেবেই আজ বাজে সরিন্দা দিয়ে।

খবর নিয়ে তিনক্ষণ থাকে পাঠিয়েছিলেন সে এসে পড়ল। বললেন, “মানসিক মশাই ওম হয়েছেন।”

তিনক্ষণ কপালে চাপড়ে নেমে তাক ছাড়লেন, “হা ভগবান, শুভার হাতে তৈরী শুন।”
গাথা পিটিয়ে ঘোড়া

ভিতরে ধামাকন্তের সানাই বেঁধে উঠল।

গাথা সমস্তে নিচ্ছিল হয়ে যে কখনও বাকী ছিল তারাও সবে পড়েক্ত নাগল। পাড়ার ছোকরোরের উপর ঐতিহ্য তর্কযুগে বর্ণ হিচিল তারা নিক্ষর্ণ বলে। এখন তারাই হলো পাড়ার ভরসা। সেখানে সেখানে অনেকগুলি হলো স্টিক্ক ক্রিকেট ব্যাট টেনিস র্যাকেট বাবুলের ভাগু কাঠের যুগ্ম নিঃস্বর্ণ হোলো।

বাপ মরলে ছেলের বিশেষ সাই রাতে হতে পারে না। আমার শেষ চাক ব্যাখ্য হোলে যায়। আমি কিন্তু বাড়ি থেকে তারিখের কেন করসুন। মুক্ত মুক্ত পালিয়ে হোলে কানাইয়ের খুনের শুরু রপ্তানি। কে আমার এই অবলম্বন করে শেষ কালে একটা সত্যিকার বাপু বেঁধে বসে। তারিখে উঠিয়ে হয়ে উঠল। বললে, আসছে।

ইতিমধ্যে সকলে কিন্তু কিন্তু কাঠামো করে একান্না তত্ত্বাবধায়ের উপর আইয়ে দিয়েছিল। পুলিশের কোন দেখে তার চেতনা ফিরল। তারিখে বললে, "তিনকশীং আপনি বিচিত্র ব্যাখ্য। পুলিশের কাছে কবরার সত্য বিড়াল যাচাই না। করে চতায়ে বিবাদ করে কেলেন যে, বাচমান মশাই খুন।"

"গুলজু তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন।"

"অদৃশ্য হয়নি। তিনি বাচাইয়ে হোলেন। অনন্য একটা গুণ জন্যে কে না অদৃশ্য হয়ে যায়।"

এইবার আমার পালা। তিনকড়ি ও তার গাড়ি রাখাহারি বারু আমাকেই মুক্তি পাকড়ালেন। "কৃষ্ণক মহলানবীং বিবাহ তো মহিত ধাকড়ে পারে না।"

"তা তো পারেই না।" আমি একক্ষণ মনে মনে মহলা দীঘিলুজ, মহলানবীংর মহলা। বললুম, "হয় আজ রাজেই বাচস্যতি মশাইকে নির্ভর বাগ করতে হবে, নয় পাতাগোর কত্তা সম্প্রদায় করতে হবে।" কিন্তু এ রাখোহারী গুন্থ চাওয়া চাওয়া করতে নাগলেন। হানত্বে ভাবলে মহলানবী নিজেই কেন বন দিয়ে বলে যান না? কানাইয়েরই সমবয়সী, ভাবতের মধ্যে আছে এক চির শয্যাগতা স্বী। না বাকাই সামিল।

আমি এলোভন হয়ন করলুম। স্বচ্ছক্ষা স্বী প্রেলে আমি তো অত্য অবশেষ মনের মনেই রাখি না, আমার এপে বাবে, বাংলার সাহিত্য আমার বিশিষ্ট দান থেকে বক্স হবে।
বললেম, “দেখুন, বাচস্পাতিকে আজ রাতে কবরকাটার পাড়েন না। পাগ না ছাড়ি, তা পাল্লে ভাচস্পাতি ছাড়া কি পাত্ত মেলে না?
ঠিক তো। বাচস্পাতিকে হেলে পররজিত রয়েছে—”

ঠিককি কোথা কেদে নিয়ে তারি উঠার সহিত বললেম। “সেই হতভাগাটার অতীত তো। এই বিষয়। ছড়েন। সামনের গলিতে যুর যুর করত। ফেলির পাড়াতার মন বসত না, তাই জানি ছিলাম। বাচস্পাতি মশাইকে। কুক্কেকেই জানিয়েছিলুম। শ্রীনি মহলাবিশেষ তো। শুধু থেকে দেখেছেন সে কী করায়।”

“ও কথা তুলে যান, ঠিককি বাড়ু।” আমি প্রবোধ নিয়ে বললেম।

স্পষ্টত বিবেচনা। করে আজকের এই অর্থে খালি কলকাটা। শহরে পররজিতকে মেয়ে দেবেন কি অন্য কাউকে খুঁজতে বেরোবেন। পররজিত বিএ লাগে, এইবার ল দেবে। আপনার মতো মুক্তি আর আমার মতো। হিতেবী শেষ এ মানসিকতা জন্য যে ভবিষ্যতে ধর্মীয় রাসবিহারী কি তৃতীয় আন্তর্জাতিক হবে না কে একথা তো করে বলবে? যেখানে করে ভাবে মহাপুরুষ করে কীর্তি করেছেন।

তুমি। শুধু নিজের পায়ের জুড়ো খুঁজে আপনার বাড়ির সদর রাঙ্গা দিয়ে হেঁটে বেঁধিয়েছে।”

তিনি একবার কৃষ্ণীর সঙ্গে পরামর্শ করে এসে বন্ধুত্ব কাতরকাতর করতে করতে বললেন, “সেই মেয়ে পাগলাকেই মেয়ে দেব। এখন তাকে পাই কোথায়?”

না তার আমি নিলাম। গেলুম পররজিতকে আনতে। জগবন্ধের চেয়েও বড়ো ভাবেই আছে। সে মহেশ। সেই মহলাবিশেষের মহলা বিশিষ্ট বিপদকে পরাজিত করে। গাথা পিটিয়ে ঘোড়া করতে পারে সেই মহলাবিশেষ।

বিষয় কোথা পররজিৎ? রয়েছে একবার চিঠি।—“দাদা, বিদার পিতার ইলিজাবেকে গলায় করতে পারব না। আমার মরণ শেষ। চললুম মরণের সমাধি। ইতি। অভা পররজিত।”

এইখানে পাটীর শেষ করে দিলে পাঠক হয়তো। পররজিতের মরণে অশ্রদ্ধ করবেন। সেটা অন্যতম। পররজিত বিবেচে আছে, তবে আমি ও আমার অজ্ঞানী হী তার মুখবর্ণন করিনে।
উপযাচিকা

বাবা লিখেছিলেন সম্যাগ গাড়িতে আসছেন। তাড়াতাড়িতে বাংলা টাকে নৈক্তিক হিস্ট্রুর আবাস করে তুলতে আমার মতো এক মানুষের সামাজিক পরিশ্রম হয়নি। অবশেষে সেন্সেল দিয়ে দেখলুম তিনি আসেননি। ভাবলুম হয়তা তোমরা মিছুকরেছেন, তোমাদের গাড়ীতে আসবেন। তার জন্য হিস্ট্রুর দোকানের খাবার আর্থিক রেখেছিলুম, তুলে রাখলুম, যদিও জিনিসগুলির উপর আমার নিজের বৈদেহিক বিশ্বাস ছিল না মোটেই।

তোমাদের গাড়ির অবস্থা রাত থাকতে উঠতে হয়। এমন গিয়েও আমার মতো দুর্লভতারে লোকের শরীরে সহ না। পাঠালুম আমার চাপরাশিকে। বাবার নামটা পঞ্চানন মুখ্য করালুম, চেঁচারাটাও বাক্য দিয়ে একে কান ধরে দেখালুম। "রবিনাশ বাবু নয়, অবিনাশ বাবু। মন থাকল?" "জী হুজুর।"

একটা বেলা করে ঘুম ভাঙল। বাবা না জানি কী মনে করছেন। সাফ নিয়ে উঠে দেখো—কোথায় বাবা?

চাপরাশী একটা সেলাম হুঁকে এক গাল হেলে বললে, "হুজুর এসেছেন।" সেখেতে না পেয়ে আমার জিক্ষাসা করলুম, "কোথায় তিনি?"

"না কোথায়, এই হাড়মালায় বিভ্রান্ত হচ্ছেন।"

কী! আমার সামান্ত নিরামিষতা বাবা বুড়ো বয়সে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। দেখলুম কে একটি চোকড় গাছের দিকে মুখ করে লুকিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে।

"হতভাগা! কী নাম ধরে ভেদেছিলি? ওর কী আমার বাবার বয়স?"

"হুজুর, রবিবাবু রবিবাবু বলে কত ডালুম। কেউ সাধা না দিলে আমি কী করব? ইনি স্বাভাবিক বোস সাহেবের কুঠি আসেন, সরার! আমি ঠাকুরালে ইনি হুজুরের—"

"চোপ রও, শুরার।"

চাপরাশী চুঁপা পিছিয়ে গিয়ে দুই হাত ঝুড়ল।

গাছটার ছোঁয়াটি সাহেবের গলা জ্বালায় চমকে উঠে বিভ্রান্ত চুঁড়ে ফেলে দিলে। চুরি করে দেখলে সাহেব সন্ধ্য। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বললে, "গুঁড়া মরিং, সার। চিনতে পারছেন?"
গালে ও গলায় মাস্ত সেই, মাথায় একটু টেরি, পিঠের গোড়াতে এক মুগল। কাঁচা বাঁশের মতো মঞ্চ লজ্জাকে গড়ন। মাঝা দূর্বল। অথবা যেকোন ভাবেও খালনুম, কে এ, সে ততক্ষণ ময়না ধাত বের করে হাসতে চেষ্টা করলে, কিন্তু তরসা পেলে না।

“আরে এ যে বৃন্দাবন।” আমি সেদিনে বললুম, “বৃন্দাবন না?”

“মনে আছে দেখছি।”

“বৃন্দাবন, বিন্দে, তুই হঠাৎ কোথায় এলি? আয়, আয়।”

বৃন্দাবন আমাকে ‘আপনি’ ছেড়ে ‘তুমি’ বলবে কি না ঠিক করতে না পেরে ঘুরিয়ে বললে, “এই বাঙ্গালোতে থাকা হয়?”

“হ্যা! এটা আমার একটা বাঙ্গল। দেখছি তো এত না আছে লাইট না আছে ফ্যান। তুই হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নে, বৃন্দাবন। আগে কিছু খেয়ে তারপর অন্য কথা।”

বৃন্দাবন। বিশেষ আমার আত্মীয় বন্ধ। ধাঁড়ি ক্লাস থেকে বিদায় নিয়ে কোথায় চলে গেল। পরে শুনলুম সে রেলের কন্ট্রোল হয়ে দিয়ে রোজগার করছে। আমি পড়ি কলার্জে, হাতে একটা গায়সা থাকে না, রূঢ়ির যা পাই তাতে পেট শেরে খাওয়াই হয় না। আর বৃন্দাবন হ’তে থাকা ছড়াচ্ছে। বড়, মেজ, সেজ ও ছোট সাহেবদের ঘুঘুই খাওয়াচ্ছে কত! তারপর চাকা ঘুরেছে। এই সেই বৃন্দাবন ও এই সেই শলিত।

রাতের তুল রাখা সন্ধেশ রসগোলা সহবাগে ছোট হাঁজরি খেয়ে বৃন্দাবন বেন বাঙ্গালীকালে ফিরে গেল। কখন এক সময় ‘আপনি’ ছেড়ে ‘তুমি’ ও ‘তুমি’ ছেড়ে ‘তুই’ ধরল। বললে, “বেডে আচ্ছিস তুই ললুতে। তোদেরই, ভাই, সার্থক জীবন। মাইনে পাস আছাড়াই শো——”

“আড়াই শো তো নেটভাবের মাইনে। আমার মাইনে হলো সাড়ে তিন শো।”

“সা—ডে—তিন—শো টাকা। অস্তেই এই। উঠতে উঠতে কত উঠতে উঠতিরকমে কানে। তারপর পাবি পেনন। নিষ্ঠফর কিছু উপরি পাওনাও আছে।” এই বলে সে এক চোখ বুঝে লিড ফাড়লে।

আমি চুপ করে থাকলুম।

সে বক্তু বক্তু করতে করতে প্রায় পেয়ে বলে বলল, “বিশে করিসনি, তা
তো দেখতেই পাচ্ছি। কেন বল দেখি। বিলেভ থেকে একটি অন্ততে পারলীনে?

আমি ওর চেয়ে ভন ভাগ্যের এর অশ্বান করিন। রেলের কন্ট্রোলারের আর কত ভন হবে। হাসির রেলা টেনে বললুম, “বিলিতি মেমসাহেব তোকে এমন করে অভ্যর্থনা করতেন বলে তোর বিখাস হয়?

বৃষ্টাবন তড়কে গেল। বললে, “দেবনি ভাই, কক্ষে মেম বিষে করিনেন, বদি আমার বন্ধু ইতি তোর বিন্দুরাত্ম মততা ধাকে। (লক্ষ করে) সিগার কোন নাম? ‘Corona’? দেখে একটা মুখে দিয়ে?

“নিচু, নিচু।”

বৃষ্টাবন কাশতে কাশতে বললে, “আমরা অবশু বিলেভেত-করের নাই। তবু খান বিলিতি না হোক, এদেশী—হাকে বলে ফিরিডি—মেম আমরাও... (খুন খুন) ...আমরাও...। আচ্ছা, তুই এদেশ লুব করেছিল কেন?

আমি রঙ করে বললুম, “বিষে করতে বারণ করিন, বিষে না করলে love করি। কেমন করে? বিষের পরেই না। love?”

“না রে,” বৃষ্টাবন সিগার খেতে গিয়ে কাশতে কাশতে কাশতে কাশতে কাশতে বললে, “অমন লেবের কথা বলিনি। ও তো স্বর্গীয় গ্রেম। হিন্দু সতী ছাড়া কার কাছে ও গ্রেম পাবি। একটি ভালো দেখে বিষে কর। সেরি করেছিল কেন?

বলিলে তু। আমি পাটীর কোঁজ করি।”

“না,” আমি তার আত্মরক্তা লঙ্ক করে গভীর মুখে তামাশা করলুম। “ও সব পাটীরটার আমার গোবাবে না। বিষে করলেই ধারীর দরকার হবে। চেলে এলেই রঙ যোগ ধাঁধায়।”

বৃষ্টাবন সিগার করিয়ে একাকুই হাঁ করে বলল, “তবে?”

“তবে?” আমি একটি ইতিমত করে বললুম, “তখন সেই তো রক্তিতা রাখতে হবে, এখন থেকে রাখলে দোষ কী?

সে কু মনে করে হেসে ফেললে। বললে, “বাং।”

“বাং।”

“বিষস হচ্ছে না? কেন, এতে নূতনক কী আছে?”

“রাম রাম। রাম। অবিনাশ কাছার হেলে না তুই। কমার্স পাল্লা করেছিল না?” সে রাহাতিতো উদ্ভিজি হয়ে উঠল।
পাপের বললে, “লব্ধ আমরাও করেছি। তা লেখাস বিলিতী মেমের সকে না-ই হেক। বিখাস হচ্ছে না, কেমন? কী করে হবে? আমরা তো রিলেঢার হাতি, পায়তো করিনি। কিন্তু বলুক দেবি কেউ বে আমি পিতৃপিতামহের পিজ্ঞাদের জন্য, সনাতন হিন্দু কার্যকের কুলগর্ভার জন্য, কন্যাদানের উদাহরের জন্য, বিবাহ করতে পাশ্চাত্য হবেছি। অতঃপর, 
একটা কেন, মাটি বিয়ে করব। আদিয়ে পুরুষ।” এই বলে সে তার শীর্ষ 
ফ্যাক্টরীয় কাগজ বাঁক বাঁকিয়ে দিলে, পাক দিয়েও চেঁচা করলে।

সেই গৃহস্থগণের সঙ্গে কিছু নিয়ে আলোচনা করি? বললুম, “এই যাও। 
তোর বিয়ে হয়েছে বিন্যাস করতে ভুলে গেছি।”

“জুলুক যাবিয়ে তো এ। আমরা তো অফিসার নই, আমরা কেরী দী।”

“কেন নে? তুই না আলায়সোলে কন্তুরিক করিলে?”

“ঐ কন্তুরিক আমার কাল হলো। তুই বিখাস করিনেন, বিন্যাস, 
একটার সঙ্গে লব্ধ হলে এক পাল এলে বেরাও করে। সবাইকে উপহার 
দিতে দিতে দেন। ভাল্লির গেল কত। তারপর সেই বিন্যাস রোগ-”

আমি অর্থাৎ উঠলুম। এই লোকের সঙ্গে একটা চলন করছিল।

“সেই বিন্যাস রোগে একটি কুচ্ছ ভুগে কলজাল হয়ে গেলো। দেখ না, 
কেমন হাড় ফুটে বেরাওয়ে। কিছুতেই কিছু হলো না। অবশেষে—”

আমি হাড় ছেড়ে বললুম, “সেরেয়ে তা হলে?”

“সাহেব না আবার?” বুদ্ধাবরে একগাল হেলে বললে। অবশ তার 
পাল বলে কোনো পদার্থ ছিল না। “সাহেব না তো হিন্দুরূপ মিথ্যা। তুষ্কুজ্বল 
শিংরের নাম জনেতুহুস?”

“না।”

“ওদেব তোমাদের মতো। সাহেব হুবোর না শোনবারই কথা। তবে বড়
বড় ফিরিদী সাহেব তুমি সাহেবও বাবা। তুষ্কুজ্বলের পায়ে মানুষ রেখে কুল 
পেয়েছে। যাক, সেই তুষ্কুজ্বলের পায়ে হত্যা মিত্র পড়েছে মূলুক। ‘তুই আমার না বাচারে কে বাচাবে, বাবা? বাচাও যে, বাবা, বাচাও যে।’ সাত দিনের 
দিন বাবা মুখ খুলে চাইলেন। পান দিলেন, ‘হায় তুই বিয়ে কর একটি লতাক 
মেয়ে দেখ। নিজের জীব সহ্বালে আশনি সেরে যাবে।’”

আমি হাসলে কি রাগ করব ঠিক করতে না পেরে চোখে জল এলে 
ফেলেছিলুম। কোন লতাক মেয়ের জীবন বাঁচা করলে এ মৃত্যু।
আমি বললুম, "তোর শরীর থেকে গিয়ে তিনি তোর বীর শরীরকে আহ্রিয় করলেন কি না সংবাদ নিয়েছিল?

ব্রহ্মা তেবল থেকে হারাকিন্টা তুলে নিয়ে চোখ বুজল। ঘরা গলায় বললে, "সত্তা লজ্জা এয়া রাগি। তার আরু চুরেছিল। তিনি ঝামায় পারে মাথা রেখে জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করলেন।"

আমি বললুম, "তারপর তুই বোধ করি আরেকটি নবীন বস্ত্র সংগ্রহ করলি?"

"সংগ্রহ করতে হয় না রে। আপনি এলে পড়ে। ত্রম্ভলোকের বয়সের মেয়ে। বিয়ে না দিলে জাত থাকে না। না বললেন, উদ্ধার কর। আমি জেলেলুম বে বিয়ে না করলে আবার খারাপ হয়ে যাব।"

বাল্য সুখৎকে নিয়ে বেড়াতে বেরলুম। আমার এমন হাসি পাছিল যে তার একটি নিচক্ষনের উপায় না করলে হতে হবে বলে অপরাজে মরিতে।

"তাহ ব্রহ্মাবর, আমি ধীরে ধীরে প্রশংসা পাড়লুম। "দেখিলি তে। আমার বায়ুচিকে। না হঠা না বিলিতিকা কোনো। রাতি শুক্রভাবে জানে না। এমন যাকে আঘাতবী খানা বলে আমি, ভাই, ও জিনিস বরদাত করতে পারিনে। ক্ষুদ্র চেয়ে পুরোপুরি দিনি খারাপ তালো।" বললে।

"তা হলে, ব্রহ্মাবর প্রস্তাব করলে, "একটি ঠাকুর রাখতে পারিস?"

"ঠাকুর? না, ঠাকুর নয়। একটি ঠাকুরার গেলে রাখি।"

ব্রহ্মাবর থমকে হাড়াল। "কী? কী গেলে রাখবি?"

"পাচিকা।"

"বাং!"

"কেন রে?"

"বাং। ঠাট্টা করছিল।"

"গতিজ বলছি। যার হাতে খেয়ে বেশ একটি স্বৰ্গুর পরিত্যাগ হবে, সে আমারকে অনেকের সঙ্গে অমৃতের পরিবর্তন করবে, সে নিশ্চয়ই মেঝের বাস্তু নয়। উঃ, সে কী চুর্ণোগ।"
"ভৃষ্ট বুদ্ধাবন বললে, "যায়।"
আমি বললুম, "যাই বল, একটি সন্নরী সনবীনা পাথিকা পেলে আমি বোধ ও সমরক্ষ দিয়ে দিতে রাজি আছি। চাইতে একপা টাকা মাইনে।"
"এক-পা টাকা! মাইনি?"
"কেন এতে আশ্চর্য হবার কী আছে?"
"না! কিছুমাত্র নেই! যখন আমার নিজের মাইনে হচ্ছে মাত্র পাঁচশো টাকা।"
আমি লজ্জা হলুদ। কিন্তু ভার্ড ক্লাস অবধি পার দোড় তার উপর মা লক্ষ্যীর অনুগ্রহ আছে বলতে হবে।
বুদ্ধাবন বললে, "গুঠ পাথিকা হলে চলবে না, সন্নরী ও স—স—"
"সনবীনা।"
"সনবীনা হওয়া চাই?"
"তা নইলে খাওয়ার মতো একটি মায়ুলি ব্যাপার এসেছে আমন্দের ভরপূর হবে কেন?"
"বুঝেছি।"
আমি ভাবলুম বুদ্ধাবন এসেছে। কথাটার মানে বুঝেছে। তা নয়।
"বুঝেছি তার অজিজস্ব।" বুদ্ধাবন রহস্যের হাসি হাসল।
যাকে, কেন করে বোঝাতে হলো না। বললুম, "আছে অমন কোনো মেয়ে তোর অনামকা?"
"নেই আমার।" বুদ্ধাবন বললে, আমার দিকে আড় চোখে চেয়ে।
"তবে," আমি ভাবি অর্থিয় হয়ে বললুম, "তুই কলকাটা গিয়েই ওকে পাঠিয়ে দিস এখানে। খাওয়ানোয়ার অন্যথা অনিবার্য হচ্ছে।"
"বুঝেছি।" তাতে ছুঁড় হাসি হাসল। বললে, "ভেবেছিলুম বিলেতের কথায় গেছ যখন তখন লোকটা সচরিত।"
"কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে লোকটা অত্যন্ত আশ্চর্য।"
আমি একটা বাণী বলতে পারেন কলকাটায় বাকলুম।
বুদ্ধাবন আরম্ভ করলে, "একটি মেয়েকে আমি, নাম তার পুর্ণ। যেমন-নাম ভেঙেনি রূপ। সেই প্রতিযোগ মতো দ্যুতি। চাইলে চোখ বললে যায়।"
"কুমারী না বিবাহ?"
উপন্যাসিকা

“সদ্ব্যারা।”

আমি সত্যি সত্যি নিরাশ হলুম। বললুম, “তা হলে ধাক।”

“শোন আগে সবটা। সদ্ব্যারা বলে, কিন্তু আমার সঙ্গে সংগঠন নেই। ঐ যাত্রোপরী আমার ভাষার ভাষায় পাইয়ে দিতে হচ্ছে। আমার কুঞ্জিত রোগ।”

আমি বিরক্তি স্থাপিত করলুম। বৃদ্ধিবন্ধুর ফার্স্ট করে বললে, “সে বড় মায়ার। গেছেল সে ঢাকায় না চাটা গায়। নিয়ে এলো হাতে পায়ে কোষ্ঠা। বললে, স্বামিকের বয়স্কের হৃদয়ালোকে অন্য হয়েছে। চুনর বিদ্যমান করলে। তখন তার বন্ধু কতই বল—বেধ হয় বাড়। কি বেো। এমন দেখা করল যে এলা যাকে বল। কিস্ত এত বল। সত্যুর্ধু বয়স্কের কোষ্ঠা গায়রা না। কথা কথে সারা শরীর কোষ্ঠায় চেয়ে যায়। হরিপদকলকাতা শহরের মােলাধাকারা বাসীর মালিক। চিকিৎসারা যা করায় তা আমার মতো কতটুকু সাধ্যের বাইরে। কেউ ওকে চুনকে পরামর্শ দেখিনি, তাই আকুরে ও সময়ের দুরে রেখেছে। প্রশ্ন করেনি। এমন মূর্ত।”

আমি মনে মনে বললুম, “ধনস্যাকৃতি।”

“শায়িয়ের বাস্তবের বস্তু পূর্ব হলো। শায়িয়ের অক্ষর দেখে তার ক্রুর দেখা ধরে গেল। সেবা তো। বড় কম করেনি। এত সেবার পুরুষকার কী হলো।” কতগুলো নাটক নতুন পড়ে এই হলো। তার অন্য। সে একদিন গল্পাংশ করতে গিয়ে হামিবরে গেল।”

আমি বললুম, “নাটক নতুন গুদিম পরিবর্তন।”

“তা নয় তো কী।” বৃদ্ধিবন্ধু উন্মৃত্যুর সহিত বললে, “নয়ে ঘরে ঘোয়ারা তবে রক্ষা কেন? আমি তো। শারীর হাতে দেবার মতে বই একথানাগে দেখলুম না। একে বিং সরুলোকের একে বইও না।”

“তুই এক কাজ কর।” আমি প্রস্তাব করলুম, “শারীর পৃথক নহ এমন কোনো লোকের কী কিনে সে। ঘরের বোধ ঘরে ধাকবে।”

বৃদ্ধিবন্ধু পরিহাসের মর্থ না বুঝে বললে, “সেই বেশ। তোর কাছ থেকে একটা নিস্তা লিখে নেব, লিখত। দেবিস তোর বোঝার প্রতি তোর একটাই দায়িত্ব আছে।”

আমি মনে মনে একটা তালিকার নিয়ে ফেললুম।

বললুম, “তারপর সুন্দর কে হলো। বল।”

“কী আর হবে, কাশী থেকে ধরা হয়ে এল। পাড়া প্রতিবেশীরা তাকে—"
গল্প

কেত বোঝালেন, কেত মিট কথা শোনালেন। তার সেই এক উত্তর। ‘আমি ব্রহ্মাচারী হতে পারব না। আপনারা কে কে ব্রহ্মচারী, তোমি?’ তখন আমরা সবাই লম্বায় যে যার বাড়িতে সেসব গভীর হবেন।”

“আর হৃদয়?”

“হৃদয়কে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তার মায়াবাড়ি। তার বাপ নেই। মা বাকের ঐখানে। কিন্তু নৈতিক বেল কি সৌধ। তিনিঃ। মায়াবা ভাই- বোনে অনেক এক হলো তবে আর প্রতি কি হলো। টের পেয়ে যারেয়া হৃদয়কে তার খামার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে হরিপদর জীবন মিশার এসেছে। আমি তাকে তুষ্টকেশরের ঠিকানা দিয়েছি। এখন সে দেখে এসেছে অবিকল আমারই মুখে। একের হৃদয় সীমনা দেখে শেষেছে। আমার ভালো কথা তার মন লাগে। সে বলে, ‘না। ভোগ চাই বলে রোগ চাইলেন।’ অন্য তো?”

আমি একটু আগে খামারের খেল বলেছিলুম। এখন ত্রৈকে বললুম—

“ধনি।”

“ধনি! ধনি বলবি তুই ওই অধিক অসুখ ত্রৈকে?”

“বাক, তুই তো। এখন ওর গলটা পেছ কর।”

“শেষ?” ব্রজবন্ধ উঁচুক হয়ে বললে, “হরিপদর আমরা তৈ তাহ করে আরেকটা বিয়ে দিদুম। এই তো সেদিন। এখন। দেহার উঠছে সেদিনকার
 সেই তুষি ভোজনের। খাওয়াও তার বেশ বেটে হরিপদর।”

“কিন্তু হৃদয় কে হলো?”

ব্রজবন্ধ বিরক্তির হৃদয়ে বললে, “কী হতে পারে তোমি? হিন্দুর মেয়ের খামার চাই গতি আছে? হৃদি বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে মেঝে।”

আমি নয়সা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, “সব ঠিক হয়ে যাবি তাহলে?”

“না। মায়ে মায়ে আমায় বাড়িতে এসে অনর্থ বাধায়। ‘ব্রজবন্ধবুক, আপনি আমার একটা উপায় করুন। নইলে বেসে হয় যাব।’”

“বেশ তো। তুই একটা উপায় করিসনে কেন?”

ব্রজবন্ধ হ’তে হাত কপালে ঠকিয়ে বললে, “একে ব্রাহ্মণ, তায় পরমতী।”

ফেরবারের পথে আমি বললুম, “ব্রজবন্ধ, আমাকে সত্য করে বল দেবি।
হৃদয়কে ও রোগ নেই!”
“তে চুপ আমি, নেই।”

“কিন্তু আমি চাই ঠিক জানতে।”

“ঠিক আমিনে।”

“তা হলে তোকে ভালবার দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে। পারবি এ তার নিতে?”

“কে? আমি?” রুদ্রবনের মুখ উন্মুক্ত একটুকু হলে গেল।

“হ্যা, রে, তুই। আমি তো কলকাতা যাচ্ছি। যাচ্ছিস তুই।”

“বা রে।”

“বা রে নয়। পারবি কি না বল।”

“বোল, ভেবে দেখি।”

“ভাববর কিছু নেই। অন্ধকার ঘামি তাকে ছেড়ে দিয়েছে কি দেখেছি?”

“ছেড়ে দেবারই সামাল।”

“কত ওর বয়স? সারালিঙ্গ।”

“উনিশ কুড়ি।”

“তবে আর কি? ওকে বলিস আবার হারিয়ে যেতে।”

রুদ্রবন বললে, “নতুন বলতে কি, হরিপদে তাই চায়। কেলেশারির আর বাকী আছে কি? বেঝা হলে বোলো কলা। পুর্ণ হবে। কলকাতা শহরে হরিপদে বোখার মুখ দেখানোর জো থাকবে না। ওর বন্ধুবন্ধবদের মধ্যেই কেউ কেউ যাতায়ত করবে।”

“প্রতিবেশীদের মধ্যেও?”

“প্রতিবেশীদের মধ্যেও।”

“বলিস কি? ঐ সব কলকাতার বালিকাদের মধ্যেও?”

“কেন নয়? পুকুরের আবার নতীজ!”

আমি প্রায় ক্ষেপে গেছিলুম। বললুম, “সবাই তা হলে শক্তির মতো চেয়ে বলে আছে কবে ও সেয়ে মরবে?”

রুদ্রবন শিউরে উঠে বললে, “বাট, বাট! এত রূপ, এমন যৌবন,— মরবে।”

“বেঝা হলে যাওয়াকে আমি মুখোমুখের মরণ বলি।”

“ও সব,” রুদ্রবন প্রত্যেকের সচিত্ত বললে, “ভূগবনের হাত। বেঝা না থাকলে পাপী থাকত না। আর পাপী না থাকলে ভূগবান কাকে তরাতেন?”
গল্প

এই বার মুক্তি তার সঙ্গে তর্ক বৃদ্ধ। আমি চূপ করে ভাবতে ধাক্কায় সাধ্য সম্ভব নয়। ও যদি বেঁধা হওয়া যায় তবে থিক যে রোগাটকে এগাড়ে চায় সেই রোগে মরবে। অথচ পূর্ব বয়সে ক্ষমতার অবলম্বন করা ও যে প্রকারভাবের সন্দর্ভের, কুলিত্ব। সেও বেশাচর্চা তত্ত্বে অবমানিত।

কী যে সেটিমেটাল বোধ করলুম। মনে হলো, পুরুষ হয়ে আঁচিছি কেন? যদি না নারীকে রক্ষা করতে পারলুম। সমাজে যাকে নীতি বলে তার উপরেও একটি নীতি আছে। সে নীতি বীরের। সে নীতি যারা মানে তারাই একচিত্ত হয় সমাজের নমুন।

পরিহাসের পরিপাত এই দুঃখান যে বৃদ্ধাবনকে আমি একটি চাপ দিয়ে বললুম, "তুই ওকে এইখানে পাঠিয়ে দে, আমিই ভাঙ্গার দিয়ে পরীক্ষায় করিয়ে দেব।"

বৃদ্ধাবন চলতে চলতে জটিল হয়ে গেল। বললে, "যে অষ্ট্য তোর কাছে আসা। সেটা একই হলুদ বলি। আমার বৃহৎ সাহেবকে একখানা চিঠি লিখে আমাকে সম্পর্কিত করতে হবে। দেড়শা টাকা একটা vacancy হয়েছে বলেই দেড়শা মাইলে ছুটে আসা।"

"কিন্তু" আমি অপত্তি করলুম, "তোর বড় সাহেবকে আমি চিনি। তিনি কি আমাকে চেনেন?"

"হয়েছে, হয়েছে," বৃদ্ধাবন আমার পিঠে চাপড়িয়ে বললে, "তোর চিনতে না পারলে তোর ব্যাপক চাকরিকে চিনবে। আমেকই—বুঝি তুমি তোমার গাড়িতেই ফিরব।"

বৃদ্ধাবনের চলে যাওয়ার মাঝখানে পরের কথা। তুললেই গেছলুম কী তাকে বললেছি? সামাজের হাতে দিবিয় খাছি মাছি, হথে অাছি। বাবা এসে বিয়ের জন্য সাধারণি করে গেছেন। রাজি হইনি। আমি ইকনমিকের ছাত্র, আমি কি এই আরে বিবাহ করি? বিবাহ মানে যদি বার্ষ কল্পেন হতে। তবে সে ছিল উম্মেদ প্রভাব। কিন্তু আমাদের শীঘ্রতা যে মাত্রুত্ব থেকে আলাদা করে প্রতীত পছন্দ করেন না।

এমন সময় একচিত্ত রাতে কোন থেকে ফিরে বসবার ঘরে দুকুটে বাবা মুখে দেই হয়ে দীঘাটালুম।

কে ঐ নারী!
ব্যাচালারের বাড়িতে নারী মেয়ে বিদ্যার বাড়িতে মাছ। লোকে কী বলবে! আমি যে একজন রেলেপায়ের জেটলম্যান। ক্রাজের মেয়ার।

মা ধর্ষিণী বিধা হলেন না। আমার গা দিয়ে গোঁড় যেতে লাগল। আমি হাড়াট কি পালাব এই বিষয়ে পরবর্তী ভিতর তত্ত্বে লক্ষ্য হলো।

গুরুদেশ আমার চোখ গেল অন্ধকার।

কী রূপ! পেট্রোমাসু বাতির আলোয় সে একটি টিপায়ের উপর ছুঁকে একখানি বিলিটি কাগজের ছবি দেখছে—নিবিষ্টভাবে। কটি সংগ্রহ তার তৃষ্ণকে বেঁধে রেখেছে। নইলে তা হয়তো দিকে দিকে চড়িয়ে যেত, মিলনে যেত। যেন একটি পূর্ণ প্রস্তুত যুদ্ধগোলাগ।

কিন্তু কে সে। কেন আমার ঘরে?

আমি যে পাঁচির রয়েছি এ সে অমূল্যের দাবা বুঝল। আসন থেকে উঠে আমার দিকে চাইল। কিছু বললে না, কিন্তু আমাকে বলে ইন্তারায় জ্ঞানাল, আসতে পারেন।

আমি আকৃতির মতো ভিতরে গিয়ে একটি সূর্য বসলুম। সেই বসল বেঁচে, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে রইল। যেন আমাকে চোখ দিয়ে যাচাই করল। আমাকে তার পছন্দ হলো কি না আনতে পাসরুম না, আনতে ইচ্ছা করছিল।

যেন আমি একটি বিবাহহোলা বলিকা, আর সেই বিবাহায়ত পুষ্প।

আমার ভাতির অর্থনীতি বোধ হলো। কিছু একটা বলা তো উচিত। কিন্তু পরে কথা কইতে পারা যেমন যায় না এস তেমনি। বচন প্রক্ষিত দুর্বৈর হলে ব্যক্তি যাতে ভেঙে। আর এমন স্বাত্বিক এক প্রক্ষিত আমার ছিল না।

আমি তার স্বাক্ষর দুটির লক্ষ্য হয়ে নজরবদল হলুদ আমার আপন গুদাম। বোধ হয় এমনি করে রাত কেটে যেত। কিন্তু আমার প্রক্ষিত বেঁধাতা তা হতে দেবে কেন? সে এলে প্রথম করলে, "কোনো পান্নায় এনে দিয়ে হবে ?"

আমি চমকে উঠলুম। যেন ধরা পড়ে গেছিল। বসলুম, "ত্যান! হ্যালো। আমার জন্তে ছোটো পেগু। আরো... আপনি অবস্থা চি বারেন ?"

সে কটি ভাবে বললে, "চি করে ধাওয়াতেই আমার আসা, চি বারে নয়।”

আমার হঠাৎ খেয়াল হলেন, এ কি সেই—?

মুখ কুটে জিজ্ঞাসা করলুম।

সে সম্প্রতি তাতে বললে, "আমি হুমরণ।"
তখন আমি সে বে কী লক্ষায় পড়লুম তা কেউ অচ্ছাদিত করতে পারবে না। সুর্য নিচে জানে কী জন্যে আমি তাকে চাই। একটি পূর্ণ বসন্তা অর্ন নারী আমার সম্মতি কী না আমি ভাবলে। তা জেনেও যে এসেছে—ছিল ছিল কেমন নির্বাক সে।

আমি তার চোখে চোখ রাখতে শিখের উঠিলুম। ভোরতা করে বললুম, "না, না, তা কি হয়! আপনি কেন চা করবেন?"

তার ঘন পশ্চিমের পর্দা সরিয়ে তার উজ্জ্বল তীর্থ চাউনি আমার চোখের উপর টর্চের আলোর মতো পড়ল। সে বললে, "বিষাক্ষা করন, আমার কোনো রোগ নেই।"

আমি বিষম অগ্রস্ত হয়ে বললুম, "আ-আ-মি তা-তা mean করিনী। কিন্তু ম-ম-নে করবেন না।" এই বলে এক হেঁচকি।

সে তখন বললে, "আচ্ছাদি দেন তো। আমি চা করে আমি।" আমি বললুম, "না, না, সুর্য দেবী। আমার লোকজন থাকতে আপনি কেন করবেন।"

সে ক্ষুণ্ণ হলো। বললে, "তবে আমি কোন অধিকারে এখানে থাকব।"

আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি কেমন করে লোকে অপরিচিত মেয়েকে বিয়ে করে। আমার পাগ মন বলে, ওটা ভগ্নামি। অর্থাৎ কামপ্রস্তাবের অপরে প্রত্যেকের মনে যে দিকার আছে সেই দিকারটাকে মন্দ পড়ে শোধন করে নিলে নিজেকে ও অপরকে বক্ষা করতে আর বাছে না, তখন সে তো কামপ্রস্তাব নয়, সে হর্ষাধন, বংশরক্ষা, কঠোর কর্তব্য ইত্যাদি। তখন অপরিচিত মেয়ের গায়ের হাত দিতে অনুমতির দরকার হয় না, মজটাই তো অনুমতি।

তবু একে যদি বিয়ে করবার উপায় থাকত আমি বিয়ে করতুম। ভগ্নামি না করে, মনকে চোখ না ঠেলে এই দেবীপ্রতিমার মত নারীকে শয্যার অংশ দিতে আমার যে লজ্জা, যে পূলক, যে হৃদ্যাপস তা আমার মতো বাছে লোকের সাজে না, তা অর্জনের মতো বীরের পক্ষে শোভান।

না, আমি বীর নই, বখাবনের কাছে বীরপ্রতিমা জাহির না করলে ভালো করতুম।

আমার নির্বাক দেখে সে বললে, "তা হলে এখানে আমার স্বান হবে না।"
উপবাচিকা

এর উদ্বার কী দেবার আছে? “না” বললেই ফুরিয়ে যায়। অবধ সে চলে যাক এ কি আমি মুখ ছুটে বলতে পারি? বিলেত থেকে এলে অবধি আমি জী-জাতির সচেত্না মন খুলে ছুটে। কথা বলবার হয়োগ পাইনি, বাহ্যিক আত্মা কয়েক বিচারে বিচারে আত্ম হারম। আর এমনি এখানে নারীভিত্তিক যে বুদ্ধি মেম ও চেড়িবিচিত ইঙ্গ-বিঙ্গি ছাড়া। অন্ত কারণ সচেত্না মিশাতে পাইনি। এই যেমনটি যখন দেড়শো মাইল দূর থেকে এসেছে তখন এর সচেত দেড় ঘট। আলাপ করব না?

“দেখুন,” আমি আরম্ভ করলুম। কিন্তু অগ্রসর হতে পারলুম না।

সে অভিন্ন বোধ করছিল বলে বোধ হলো। “দেখুন, আপনাকে বৃদ্ধবন কী আশিয়েছে—”

“বৃদ্ধবনবাবু এই আশিয়েছেন যে আপনার একটি পাঁচিকা চাই। আমি বৃদ্ধবনবাবু কথা, মনে হয় মনে রাখুন। তবে বিলিতি রামার কথা আলাদা।”

এখানে আমি একটা ছুটে গেলুম। বললুম, “এইচ তো আমার পক্ষে অস্বল। আমি—বুলবলন কি না—একবারে বিশ্ব বিলেবিলেফেরৎ। গোক ছাড়া বড় কিছু থাইনে।”

সে অভিনিত ঘরে বললে, “যদি কেউ শিরিয়ে দেয় তাই রেখে খাওয়াব।”

আমি ভড়কে গেলুম। বললুম, “তারপর—এই দেখুন—বানাই সব নয়, পিনাও আছে। ওব বিশ্বয়ে—বুলবলন কিনা—আমি একবারে সেকেলে বিলেবিলেফেরৎ।”

সে বললে, “দেখিয়ে দিলে তাও পাওয়া।”

এর উপর আমি আর কী বলতে পারি? তবু যত রকম ভর দেখাতে পারি দেখালুম। বললুম, “ভীম বদরাঙ্গ মায়ু আমি। চারুক নিয়ে থাকে কাজে পাই তাকে মারি। তা নইলে আমার আবার খুম হয় না।”

সে এককণ পরে একটু মুখভঙ্গি হাসল। বললে, “বেশ। না হয় হু’ দশ ঘা মারবেন।”

তখন আমি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললুম, “মাইনে—মাইনে কিন্তু আমি দিতে পারব না। পাঁচিকা চাই বলে পাঁচিকটিকে যে হাড়কে দেব এমন কথা তে। বলিনি। ওবে ওর মাইনে না দিলে ও কি আপনাকে বিলিতি রামা শেখাবে? উপরন্তু আপনাকে যে মাইনে দেব—বুলবলন
ফি না—আমার মাইনে থেকে উদ্ধ থাকলে তা দেব না? ধানাপিনাতেই সব হজ ছিল দিয়া।

"আচ্ছা, আমি বিনা বেতনেই চাকরি করল করছি।"

আমার ইচ্ছা করল, সুবর্ণ, তোমাকে আমি মাথায় করে রাখব। আমার সর্বযোগ তোমার। কিন্তু আমার এমন লজ্জা করতে লাগল তার সঙ্গে ধাক্কার কথা মানতে। ভবারকে ধন্যবাদ, আমি সেটিমেটাল হয়ে সর্বনাশ থাকিনি।

আমি চুপ করে ধাকলুম আনেকক্ষণ।

সে উঠে এসে আমার পায়ের গড়ে বললে, "বিধাস করন। আমার ও রোগ নেই।" তার চোখ বলল। তাকে যে কি রমণীয় দেখাচ্ছিল। আমি শুধু হয়ে নিরীক্ষণ করিলি, পা সরিয়ে নিয়ে ভুলে গেলুম। তাকে হাত ধরে তুলতেও আমার সাহস হচ্ছিল না।

সেদিনে শক্ত করে বললুম, "কিন্তু আপনি যে পরস্পর।"

সে মাথা হিয়ে বললে, "না। আমি আপনারই স্ত্রী।" তার অন্য বাধা মানল না। বোধ হয় সারাধিন অনাহারে কেটেছে—টেনে। সে আমার পশ্চিম করলে।

এল কাঠারের মধ্যেও এত কোমলতা ছিল। কিন্তু এ কি রোমাস! আমি তো আটক নাই, সন্ত্রাসকালিনিদি নাই, আমি কাজের লোক, ব্যাকের চাকুর। তাও রুদ্ধবন্ধ যত বড় মনে করেছিল তত বড়—অর্থাৎ একের নাই। আমি কি রোমাসের যোগ্য?

সামান্য যখন চা নিয়ে এল সে তখন তাড়াতাড়ি পা ছেড়ে দিয়ে আচল বসুধালির নিজের চেয়ে গিয়ে বসল। সামান্য যে কি মনে করলে! অতিরিক্ত গল্পের ভাবে চা রেখে দিয়েছ তা জনকেই সেলাম করলে। যেতে যেতে হাসাহাসি করলে বোধ হয় তুমিও বোঝেন। বিয়ের মত সন্তোষের জুতো পালিয়ে করিছি বারান্দায়।

আমি বললুম, "সুবর্ণ, তুমি বড় হংসিনী। কিন্তু তোমার ছাঁথ মুর কর। আমার অসাধ্য। তুমি দিন পরি তুমি চাইবে মা হতে। আমি কেন করে তার সমর্থন করি?"

সে বললে, "না অনেক পরের কথা। আমি ও কথা তালিবনি।"

আমি হেসে বললুম, "তুমি না ভাবলেও প্রকৃতি ভাববেন। তার নিয়ম অমোদ।"
ুপযাচিকা

সে তবু বললে, "যা হবার তা হবে। এতে ভাববার কী আছে? সংসারে কেউ কি মা হচ্ছে না?"

"কিন্তু সমাজ যে তোমার সম্পন্নকে অসম্পান করবে?"

"আগনি ধাকতে?"

"আমি যা দেন কী! আমার চেয়ে ধারা সব বিষয়ে বড় উঠাও অমন সন্তানের জনক হবার ভয়ে উদ্বেগান।"

সে বোধ হয় বিখ্যাত করলে না। এমন একটা সহজ বিষয়ে এত ভয়ে পাবার কী আছে? অন্য মনে কী চিন্তা করলে। চা খেলে না।

"চা খাও, চা খাও।" আমি একটু দীঘড়া পোড়াভাড়ির হয়ে বললে। "তারপর আমি তোমাকে টেনে তুলে দিয়ে আসব।"

সে অবল উঠে বললে, "চা খেতে আমি আসিনি।" উঠে বললে, "আমার টেনে তুল্যানাস। করতেও আমি জানি।"

তার ছ’ বছর পরে আবার বৃদ্ধাবনের সঙে দেখা। ছ’ চার কথায় পর
কিজাসা করলুম, "ভালো কথা, সুখর্ণ খবর কী?"

সে আশ্চর্য হয়ে বললে, "সুখ্য!" তারপর হেসে বললে, "ও! তোর
নেই পাচিকা সুখ্য!"

আমি অন্থতাপের সঙে লজ্জা মিশিয়ে বললুম, "হ্যাঁ, আবার নেই
ুপযাচিকা সুখ্য।"

"ওর নাম তো এখন সুখ্য নয়। ওর নাম ফরজন্ম উল্লেখ। ওর দ্বারা
এক পেশাওয়ারী ফলওয়ালা, আব্দেল কাদের। ওর একটি হেলে হয়েছে,
জলফিকার। বিবি এখন ঘোর পরামর্শী। ছি, ছি, শেষকালে মুভন্মার
হয়ে গেল।"

(১৯৩০)
স্ত্রীর দিদি

নির্ভরের স্ত্রী শেফালী রূপে গৃহে লজ্জা। শহীদদারের স্মৃতি বিরোধিত তার চক্ষু, প্রভাতের মুখে পুষ্প স্নায়ুত তার মুখ; তার ভূমিকার সেরা জীবন মতো শান্ত।

এমন মেয়েকে দেখে কার না পছন্দ হয়? নির্ভর তাকে এক নিঃশাসে বিয়ে করে খেললে। বিয়ের রাজ্যে প্রথম দেখলে তার স্ত্রীর দিদি সোহিনীকে।

শেফালী যেমন শরৎচন্দ্র প্রতিমূর্তি, সোহিনী তেমনি বর্ধা ভূমিতুর। আর চোখ বিদেশে বিদ্যাও ঠিকতে পারছে। বিদ্যাত তার খুব হাস্য। বিদ্যা তার পরিহাসে, রসার্থতে। স্ত্রী যেন। সতেজ স্বাধ্যায় তাকে সম্পূর্ণ হয়েছে, নইলে রূপ তার বাল্যবিক নেই। চাপা খসখসে তার কঠিন, তবু কি যেন সম্ভাবনা আছে তাতে। বেশ হয় খোঁটার দেখে বিয়ে করার দরকার ঝুঁকায়। বুধের বজ্র, ধরনে বিদ্যাত। তার একটা না একটা অংশ সম্পূর্ণ কথা কইয়ে। যে তাকে গড়বার সময় বিধাতা পারদের খাদ মিশিয়েছিলেন।

সোহিনী নির্ভরের সঙ্গে আলাপ করে, অন্যদিকে হাসিমুখ ফিরিয়ে খেলে তাকে নির্ভরের দিকে চেয়ে চাওনিতে কৌতুক বিজ্ঞাপিত করে। যেন নির্ভরের মনে ভিড়টা দেখতে পায়, যেন ওষুধনীতে তামাশার বিচ্ছ আছে। তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা কইয়ে থাকে নির্ভরেরই সঙ্গে, অন্যান্যকে একেবারে বক্তি না করে।

কালো মেয়ের তালা বর জোটেনি। মধ্যবয়সী সোহিনর, এলাহাবাদের নেটব তাকার। আর শেফালীর খামারভাব তার গলায় রঙের মতো ফরসা। নির্ভর চাকার করণ লেকচার। দেশের কাছে দশের কাছে তার একটা প্রতিষ্ঠা আছে। তবু সোহিনী নির্ভরের গননার মধ্যে আনে না। তার ছোট বোনের বর—সমষ্টি ছোট। মাঙ্গেও শিঠ মূী ছাড়া সমাজের অর্ধে বিচ্ছ না হলো। তবে আর অধিক কিসের?

নির্ভর গয়েরভাবে লম্ব বিকাশ করে। যেন উপস্থিত ভব্যতার। তার ছাড়ি ও এই বাসরের ঘর তার কৃষ্ণ কম। ছোট কানের উপর রক্মার অস্ত্র যেন একটা মায়া।
সোহিনী তাদের নিষেধ করে একটা হাত তুলে, মাথাতে ঈশ্বর দ্বিতীয়।
লে, “তোরা তো বেশ। মাস্টারের কাছে কোথায় কানগুলি পাচ্ছে দিবি,
না মাস্টারের কানটি নিয়ে কাড়ারাকাড়ি। এবার জয়ামীর মিছিলে তোদের
সং বেরে বেদিস।”

নির্মল ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “আপনি ঢাকার জমানটির মিছিল
দেখেছেন?”

সোহিনী অন্তদিকে চেয়ে এমন ভঙ্গি মাথা নাড়লে ও তার ঠিক পরে
নির্মলের দিকে এমন দৃষ্টিতে চাইলে যে নির্মলের দেহের এক প্রান্ত থেকে অপর
প্রান্ত অবধি অতিক্রান্ত ছুটে গেল।

ব্রীয়ে একা পেয়ে নির্মল জিজ্ঞাসা করলে, “তোমার দিদি কতদূর
পড়েছেন?”

“ফোর্থ ক্লাস অবধি”—শেখালী বললে কোনো মতে মূখ ছুটে। নব
বধূদের সরম সে অদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু মূখ হয়নি, তা বোঝা গেল।

“ফোর্থ ক্লাস, মোটে ফোর্থ ক্লাস!”—গ্রোচেসার বিয়ার বদলি হলো।

ব্রীয়ের সঙ্গে এক শয্যায় নিয়ে নে দৃষ্টান্ত করলে ব্রীয়ের দিদিকে। ফোর্থ ক্লাস,
তবু কিছু দীর্ঘ, কিছু ফ্রাঙ্কি, কিছু স্প্রেন্টিভ। শেখালী তো মায়াটি পাস।
কিন্তু সোহিনীর কাছে লাগে না। শেখালী না হয়ে সোহিনী যদি আমার জী
হতো—নির্মল ভাবলে—তা হলে বিদায় এক্সা কি ভুল হতো। বছর তিনেক
আগে এই পরিবারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তখন খালে খর্জু মশাই কি আমাকে না
দিয়ে নেগতোরকে ও মেয়ে দিতেন? তবে তিন বছর আগে আমার
চাকরি হয়নি। আমি রিসার্চ স্কুলার। বিবাহের প্রস্তাবে ব্যবস্থা নিয়ে করেছি।
আমি না হয়ে স্বামীর হবার দিকে ছিল আমার কোক। ব্রী জাটি না বলে
মাথা জাটি বলতুম, আমাদের পারের সঙ্গে ছাড়া অন্য কার্য সঙ্গে আড়া
দিতুম না। তবেও আমাকে নিজেদের একজন বলে ধরে নিয়েছিলেন। In
anticipation ব্যতীতে নির্মলানন্দ বলে। হয়—নির্মল ভাবলে—সেই
মোটে হারালুম ঐ দীর্ঘ, ঐ ফ্রাঙ্কি, ঐ স্প্রেন্টিভ। সেই তো বিয়ে করলুম,
সংসার হলুম, মাতৃভাষিক স্ত্রী সোনারো দাত্ব নিলুম, চাকরি তা
পেয়েছি ব্যাস বলুম গেল মর্যাদা, মায়ের অহরোধের কাছে জাতিজীবি খালক
না। এই বছর আগে করলে ব্রীর সঙ্গে সমস্ত অস্ত্রবর্ধ হতো, এই মেয়ে
আমার কান ধরে টান দিত, এত লজ্জা কোথায় থাকত?
বৌ নিয়ে নির্মল ঢাকায় ফিরল। মা যার পর নাই আকাশায় হলেন।
বোনেরা। বোনিকে ঘিয়ে রইল। বন্ধুরা। বোনিকে কাচারি রামারে অভিনন্দন করে গেলেন। পাড়ার মেয়েরা নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে রাশির রাশিউপহার দিলেন।

নির্মল কিন্তু সোহিনীকে ভুলতে পারলেন না।

শেফালীকে দেখলে সোহিনীর কথা মনে পড়ে। শেফালীতে সোহিনীর লীলা কই? কর্মী কই? সংগ্রামী কই? শ্রুতি সৌন্দর্য, শ্রুতি শরম, শ্রুতি সিন্ধুতা। এ সব তা জগতে দূর্লভ নয়, নির্মলের বাড়িতেই কিছু কিছু আছে।

এর জন্যে অনন্ত সুকালী। রামারের বিষয়গুলি দিয়ে একটা স্থল রামারের সার্থকতা কোথায়?

বৌর দিকে চেয়ে নির্মল ভাবে, এ তো মাতৃজাতি। একে বৌ বলে কল্যান।

নির্মল পাড়ার মশা বিচারে দুর্লভ। পাড়ার লোকে ওদের জন্যে বললেন,

“অনন্ত বৌর স্বামী হয়ে এমন জিজ্ঞাসিয়! পুরুষ তো নয় মহাপুরুষ!”

আসন্ন পাড়ারা বললেন, “কত ক্ষুদ্র পরমহংসদেবের আরাধনা করে।
তার অহর করে ক্ষুদ্র করে।”

মা’র মনে কাঁটা ফুটল। তিনি নেতাকে নিয়ে ঢাকারার মণিবে নাতির স্বীয়ত্ব পাঠা মান্ত করে দিলেন।

প্রথমে জিজ্ঞাসিয় ধান করে—ফুটক বৃহৎ নয়নে পতঙ্গ চপল চাউনি,
চোখে কপালে ইত্য উচ্চ নিশ্চল মিষ্টিহাস, দীর্ঘ সবল গড়নে, ইম্পারের
মতে রং, চাপা খসুকে কল্লের।

বৌরী জিজ্ঞাসা করে, “দিদি চিঠি লেখেননি?”

শেফালী বলে “তাকে দেখাতে না লিখলে কি সে একথায় লিখবে!”

নির্মল কষ্ট হয়। অনে না দে চিঠিতে সোহিনীর অন্ত মৃতি। হিতিবিজ্ঞি
কুলের লেখচে, নিষেবে পড়তে পারে না। হয়তো লেখতে—বছর বছর দোষারের কুশল সংবাদ না পাইয়। বড়ই ভাবিত আছি। কুশলের বানান
মুখের মতে। সংবাদটি তালব্য না।
শ্রীর চিঠি

অবোধ শেখালী হুবোধ হবার অর্ধে আই-এর পড়া করছে। শেষবর্ষের সময় তার সহপাঠী। তার দিকে তার কাঁদি কেন এতবার দ্রুত করেন তা দিয়ে সে বুঝতে না তো অত পড়াজন্য ধরকার ধারতন না।

নির্ভর স্থির করে ফেললে—পুজার ছুটে এলাহাবাদ যেতেই হবে।

যাতে বললে, “ভূমি পুরী দেখতে চাও, বিমলের সঙ্গে যাও। শেখালীকে তার মিলাওয়ে দিয়ে আমি একা যাই পদক্ষেপে। আমার নীল ‘Military Strategy of the Mughals’ বেস্থানা লিখতে হলে আগ্রা দিলী গোয়ালিয়র এলাহাবাদের হরগুলো চালু করতে হয়।”

তবে না হয়ে যে নির্ভরের নির্ভরি নেই, শুধু পি-আর-এল যে তার পক্ষে অশোভন, কে এ কথা না জানে; মা বললেন, “তাই হোকু।”

এলাহাবাদের নগেন্দুবর পৌরীক অত্রালিক। ভাড়া দিয়ে মেটিব ভাজারের উপকুলী পাড়ায় হেটাসাঁড় বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন, যা দেখে কুই ভরসা করে ভিড়বেন। বাগ বড় ভাজার ছিলেন, বাগের নামভাজারের প্রতিবিন্দুকে তার পালার। প্রথম পক্ষের তিনটি হেলেমেলে, তিনি ও তার দ্বিতীয় পক্ষ এই ক্ষমতার সংসার। ভাড়ার টাকা ও রোগী সেখার টাকায় এক রকম চলে যায়। তবে সাবেক কালের চাল আর নেই, এই যা ছুঁড়।

“বেশ, বেশ, ভূমি এলে, দেখা হলো, খুশি হলুম,” নগেন্দুবার বললেন।

“আমাদের কি কথাও বার্তার যে আছে, ভায়া। ঐ ভাব না, রাত না গেলাহাতেই পাঁচ পাঁচটা কুই এসে ধরা দিয়ে পড়েছে। নগীন ভাজার—নগীন ভাজার না ছোড়লে ওদের বিমার ছাড়বে না। ক্যা ভইলুলে রাশখেলাওন, ক্যা ভইলুলে রে বধূন্নি নানী।”

ভায়া ভাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে তিনি ওদের একজনের রূপে নেতৃবৃক্ষের বাগের দিলেন, এক জনের মুখে হাত পুরে দাতগুলো নাড়লেন।

একটার চাকর এলে বন্ধ দিলে, “মাইজি বোলাতে কেই।”

নির্ভর তার পিছু পিছু গেল। নমক্তর করতেই সোহিনী কিস্ফিস করে থাকলে, “কথিন থাকা হবে না!” তার হাত হঠা জোড়া। সে নির্ভরের অবস্থায় সুচি ভাঙ্গছিল।

“নেটু,” নির্ভর স্বাগতীর ঘরে বললে, “এখানকার ফোর্ট-এর বহুবভার উপর নির্ভর করছে।”
"কী-কিনের উপর?" সোহিনী নির্দেশনের চোখের উপর কৌতুক দৃষ্টি স্থাপন করলে।

নির্দেশন দৃষ্টি এড়িয়ে বললে, "ঐনকার কোট এ লেখার জিনিস বেশি থাকলে বেশী দিন, কম থাকলে কম দিন।"

"তবুও," সোহিনী পুনরায় প্রশ্ন করলে, "কম করে হলেও ক'দিন ক্ষমতা পাই?

"নিজের।" নির্দেশন বিজ্ঞ হয়ে বললে, "ধরন তিন দিন।"

"ওয়ালা,সোহিনী বিজ্ঞাবর্ণ করে বললে, "অত কম কিছুতেই হতে পারে না।"

নির্দেশন তো তাই চায়। পাটীর ভাবে মুখের হাসল। তার পরে চূপ করে সোহিনীর সুগঠিত হাস ছিটে নিয়ুক্ত করেন, তার চুলের নির্দেশন ওঠা নামাজ স্পষ্ট সংশ্লেষণে নিরীক্ষণ করতে ধাকল। যেন সামাজিক লুচি ভাঙ্গা নয়, হরজাহানের মতো সামাজিক পরিচালনা চলছে ঐ দ্বিতীয়ি স্থালে এর।

পারে এমন লৌহার সহিত কাজ করতে শেখালো? হ'ল,হ'ল। খালি পড়া আর পড়া।

"ওকে আনলে না কেন?"

"কাজে?

"চিন্তে—শেফালীকে।"

"ও! ওর মা বাবা আসতে দিলেন না।"

"বিরহ সইতে পারছ?" সোহিনী লুচিগুলি ছুট খালায় সাজাতে সাজাতে অপাঙ্কে চাইল।

নির্দেশন দৃষ্টে ভয়ে বললে, "ষাগরিকণকে আরে। কত ক'দিন সইতে হয়।"

"ষাগরিকণ কী?

"ষাগরিকণে নেই।"

সোহিনী মাঝে খুলিয়ে বললে, "তাই বলে। অক্ষরের ছেলে বাবার নয় বাবার ছেলে অক্ষর এই তোমরা যুথে বের করো। না?

নির্দেশন খালি চোখে বললে, "রাং। অমোঘের ক'টা ছিল হার্ডী—"

"আচার, আমাদেরও তো ইতিহাস লেখা হবে হাসার বছর পরে বের হবে না।"

"হবে বই কিং?
নতুন চিঠি

“এই বিটে খুঁড়ে অজ্ঞতার ধারা বাঁটির খোঁজ এক দিন পাওয়া যাবে। না?”
“বাবা বই কি।”

“তখনকার দিনের ঐতিহ্যের জন্যে ধানকেয়ের লুচি তুলে রাখতে হয়। না, মাস্টার মশাই?”

নির্মল ভাবলে গ্রোফেসার ও মাস্টারের মধ্যে তকাৎ এ জান না, সিবিল সার্কন ও নেটিভ ভার্জার ২ই এর কাছে ভাষ্কার। বললে, “আমি মাস্টার নই, গ্রোফেসার।”

সোহিনী অভিষেক করলে। “গ্রোফেসার তা হলে মাস্টার নয়? পড়াশুন না ছেলেদের?”

নির্মল ভাবলে, ব্যক্তি গে। আনের চেয়ে ঐ ভক্ষ্যের মহার্ষিক।

লুচি চিবাতে চিবাতে নগেন্দ্রভূষণ বললেন, “গোরাকে নিয়ে আলাদান হচ্ছে, ভালো। গোয়ালিয়রের গাইকবাড়ি, ইন্ডোরের সিদ্ধিয়া এদের কাজের কলাপারের আমি কি জানি?”

নির্মল মুখ চিপ বললে, “সে হবে এখন। আমি ওকে ঐতিহ্যে পাকা না করে দিয়ে নড়িয়ে।”

গোরাকে, কালো ও কাঁদা এই তিন ছাত্রছাত্রীকে পাকা করে তোলবার ভাবে নিয়ে নির্মল স্থায়ীত্ব লাভ করলে। দুপুরের দিকে একবার দুর্গে যায়, বাতার পাতায় নকশা একে আনে। মহাগোষ্ঠীর খন্ডু তৈরি করে। আর খুব লুচিই হালুয়া অন্তরী করে।

উপরের চাঁ।

“মাস্টার—না, না, গ্রোফেসার মশাই,” সোহিনী চা দিয়ে যাবার সময় বললে, “এই নাও তোমার চা।”

“নগেন্দ্র খেয়েছেন?”

“উনি তো অনেকক্ষণ বেরিয়েছেন।”

চায়ে চমক দিয়ে নির্মল বললে, “ওঃ!”

“চা খুব ভালবাসলে, না?”

“খু-উব। যদি তোমার হাতের হয়।” নির্মল করে সাহসী হয়েছিল। মেয়েদের কাছে মুখচোরা বলে আর দুর্গশ দেওয়া চলে না।

সোহিনী তার দিকে অবাক হয়ে তাকালে। তার সব সময় স্থির চপলার।

হাসি। বললে, “কেমন হাতের?”
নির্মল খপ করে তার একটা হাত চেপে ধরে বললে, “এমন হাতের।”
সোহিনীরই গায়ে জোর বেশী। সে হাড়টা ছাড়িয়ে না নিয়ে সেই হাতে
নির্মলের গায়ে একটা ছোট ঠোঁট। মেরে বললে, “এ খাঁচা কেমন লাগল?”
“খুঁ-উব ভালো।”
আর একটি ঠোঁট। আর একটি জোরে।—“এবার কেমন লাগল?”
“আরো ভালো।”
আর একটি ঠোঁট। আর একটি জোরে।—“এবার কেমন লাগল?”
“আরো ভালো।”
ক্ষ্যেত্রের সহিত প্রফেসরের কান্টাতে পাক দিয়ে সোহিনী চুদালো,
“এটা কেমন?”
“উপায়ের।”

dিন দুই পরে।
সোহিনী বললে, “এখানকার ছুরি দেখা শেষ হয়ে গেছে বুঝি?”
নির্মল বললে, “না।”
“তবে যে আর যাও না দেখতে?”
“হতভাগ্য দেখেছি তত্ত্বর বিবরণ গুছিয়ে লিখি আগে। তারপর যাব
আবার।”
“কই, লিখতেও তো তোমার ভাব নেই।”
নির্মল বুঝলে এর তাংশের। ঘটার পর ঘট। সোহিনীর ঠোঁটা ও কানমলা
খাওয়া। নজমে একটা বাণামা খুলেছেন, সেইখানে সারা ছপের আঁধা দেন,
সেইখান থেকে কল-এ যান। ছেলে ছুটে বুঝল, মেয়েটি পাড়ার বড়
বাড়িতে।
“হ্যা, এইবার লিখব। অনেক চিন্তা করতে হয়, তোমরা তো বোঝে না।”
“চিন্তা করার চান বুঝি এই?”
“আহা, মজ্জল যে সর্বক্ষণ কিয়া করছে, তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ,
সোহিনী? ”
“দিদি বললে না যে?” সোহিনী কাটাক্ষণ করলে।
“কেন দিদি বলল?” নির্মল নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললে,
“সত্যিকারের দিদি তো না, সম্পর্কে দিদি।”
জীব চিঠি

“সম্পর্ক বুঝি কিছুই নয়?”
“সম্পর্কটা অন্তর রকম হতে পারত।”
এ কথায় সোহিনী আঘাত দিয়ে চোখ ঠাকলে।
নির্বল ঠাওয়ালে নে চোখের জল চাপা দিছে। আহা, কী অসন্তোষ এই মেয়েটি! সোজবার পড়েছে। ও ছাড়া আর কী হতে পারে!
নির্বল উঠে দাড়াল। সোহিনীর কাছে একটি হাত রেখে আর একটি হাতে ওর চোখ থেকে আঘাত সরালে। ও হরি! কই তাঁর চোখে জল?
সোহিনী চুপি চুপি হাসিমিল, খিল খিল করে হেনে উঠল। হতভাগ্য নির্বলকে ঠেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। বললে, “আমাকে একজনদের বাড়ি যেতে হচ্ছে। কিছু মনে কোনো না, প্রফেসার। বাসা পাহাড়া ধিন।”
নির্বল পরদিন কোর্টে গেলে। মন দিয়ে লিখিলেও কিছু। তীরে কুশল সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখিলেন, তার উত্তর গেয়ে প্রতিবাদের লিখিলে খুব খাটলে হচ্ছে। একটা নক্ষা পাঠিয়ে দিলে নমনো হিসাবে।
তারপর যথাপূর্বঃ।
বললে, “কাল রাত্রে নেগনদ তোমাকে এত বক্সিলেন কী নিয়ে?”
“তুমি জানলে কী করে?”
“বা, আমার বুঝি কান নেই?”
“কিন্তু তখন তে তুমি বুঝিয়ে?”
“আমি বুঝিয়ে দুইমিট্রে জন্তে গাই।”
সোহিনী ঘুরিয়ে বললে, “তুমি অবাক করলে। যারা ম্যাজিক করে তারাও তে প্রফেসার। তুমি বুঝি তাঁর একজন?”
সোহিনী বাকির করলে না যে তাঁর খামি তাকে বক্সিলেন। “ও কিছু না। ওর মিটি কথার ছাড়াই ঐ। বহুলির মতো শোনায়।”
নির্বল হেনে উঠিয়ে দিলে।
“হাসছ কী, মশাই। খামি কি তীরে বক্তে গারেন?”
নির্বল হাসতে হাসতে গভীরে গেল। তারপর সোহিনীর হাত ধরে উঠে বসল। সহগো সোহিনীকে টান দিয়ে নিজের পাশে বসাল। বললে, “কি বলো। ঠিক তুমি ভালবাসো?”
এই প্রথম সোহিনীকে গাঢ়র হতে দেখা গেল।
"বলো, বলো, সোহিনী। তোমার ভালবাসো?
সোহিনী জোড়ের সহিত বললে, “কেন, ওর অপরাধ কী? উনি
প্রফেসর নন। এই?"
"দুঃখ! তা কেন হবে? উনি তোমার যোগ্য কি?"
"আমি কি ওর যোগ্য কি?"

মির্জার আবেগের সঙ্গ বললে, "সোহিনী, তুমি কি জানে। তুমি বিদ্বয়ী
রূপগীর কল্যাণীগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? সোহিনী, আমার একমাত্র দুঃখ কেন অমি
তিন বছর আগে তোমাকে দেখি। দেখলেই বিয়ে করতুম নিশ্চিত।"
সোহিনী আবার সাহসিক হেসে জু-বার্ষ হেন বললে, "কিন্তু আমি যদি
ও বিয়েতে অমত করতুম?"
"কেন অমত করতে?"
"কেন করতুম না? প্রফেসর বুঝি পুরুষ?"
"কী?"
"যাও, বলব না।"
"প্রফেসর বুঝি কী?"
"জিজ্ঞাসা।"

নির্মল মনিত্ত্ব করলে। তখন সোহিনী পুনরক্ষণ করলে, "প্রফেসর
বুঝি পুরুষ?"

এ কথা শেষে নির্মল সোহিনীকে একবারে বুকের কাছে টেনে আনলে।
সোহিনী নিজেকে উঠিয়ে নেবার চেষ্টা করলে না। শুধু ফিস ফিসিয়ে বললে,
"চাড়ো, চাড়ো। ছি, ছি।"
নির্মল বললে, "আর বলব ও রকম কথা?"
"কী রকম কথা?"
"ঐ যে—প্রফেসর নয় পুরুষ?"
"পুরুষ নাকি?

নির্মল এর যা উত্তর দিলে তা ভয়ানক।

আরে দিন চার পরে সোহিনী বললে, "লক্ষ্যটি, এই বেলা যাও।"
নির্মল বললে, "যাও, কিন্তু তোমাকেও আসতে হবে।"
সোহিনী পাড় নাড়ল, "বোনের বাড়িতে তুমি বোনের, আমার নন।"
"পাগল? আমি কি আর ওর পুকুর হতে পারি?"

"না, না। ওকে অস্থির করতেও যে পারবে না তুমি?"

"কিন্তু তোমাকে অস্থির করতেও যে পারব না, রানি।"

"একজনকে অস্থির করতেই হবে।"

"তা বলি হয় তবে তোমাকে নয়।"

সোহিনীর ঘোষব যেন বদলে গেছেন। স্বতঃস্ফূর্ত খিদ হাসির স্থান নিয়েছিল করণ গভীর আভা। সে বললে, এমনকি অস্থির করলে ও অস্থির হবে না, কিন্তু ওকে অস্থির করলে আমি ও অস্থির হব।"

"না, সোহিনী, তোমাকে অস্থির করব না।" নির্ভর বার বার এই কথা বললে। এর পর হেমামূহুরের মতো সোহিনীর বুকে মুখ উঠল। পিঙ্কার মতো আঁখে। অধো স্থানে বললে, "না-না, হেমামূহু, তোমাকে অস্থির করব না-না।"

সোহিনী চিন্ত করে হেসে উঠল—"যাও! কোথা গিয়েসার!"

এর উত্তরে সেই ভয়ের কারণ।

এমন সময় এসে পড়ল নগেন্দ্রভূষণের কথা টুনী। বয়স ছয় সাত বছর হবে। তাকে দেখে সোহিনী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মোড় দিলে। তখন তার মুখে কোঁতুকের হাসি। যে কি ভাঙ্কে ভাঙ্কায়?

নির্ভর তো মূখটাকে অস্থির করার জন্য করে টুনীর ভয়ে টুনীর পুত্রলের মতো ঠায় বলে রইল।

"মেসোমশাই, টুনী জিজ্ঞাসা করলে, "মাকে কামড়াছিলে কেন? তুমি কি কুরুন কি?"

মেসোমদারের মুখে কতকটা কুবুরেরই মতো লম্ব। সেখানের বয়সে মতো। তিনি কী যেন জুড়ে মিঠে চেটা করলেন। একটা অক্ষুট ধনী তার কঠিন মূলে আঁচকে গেল।

"বল না মেসোমশাই, টুনী আমার ধরলে, "কেন কামড়াছিলে মাকে?"

মা ওর থেকে ডাকলেন, "টুনী।" টুনী চুপ গেল। মা তাকে একটা পয়লা ঘুস দিলেন। "যা কুল কিনে খা।"

তখনকার মতো টুনীর মুখ বদ্ধ হলে, কিন্তু রাজে বাবার সামনে খুলল।

"আমার বাবা।"

সোহিনী তাকে চোখের ইশারায় নিশ্চেষ্ট করলে।
নোহিনী চোখ দিয়ে অমিষ্ঠ করলে। নির্মলের ভো তখন বাঁধ-বাঁধ অবস্থা। তার মুখ মরাঘ মনে শায় হয়ে অস্পষ্টি।

নানা কারণে সেদিন নগেন্দ্রবাবু বিটিভি করছিলেন। তিনি ভেবেচিয়ে বললেন, "নোহিনী বাবা। কু নোহিনী বাবা।"

নোহিনীর অমনি অভিমান হলো। আর মাদারা হে হে করে হেসে উঠলে।

"নোহিনী বাবা। কু নোহিনী বাবা।" "এই নোহিনী।"

"বাখু, বলব না।" এই বলে নোহিনী হন্ন হন্ন করে বলিয়ে গিয়ে কোষাণ্ডের লুকিয়ে থাকলে।

পরক্ষণে নোহিনী ঠিক সেই সময়টিতে পাড়া বেড়িয়ে ফিরলে। উকি মেরে খেলতে, ওরা পাষাপাষি পড়ে আচ্ছে। ঘরে ঢুকতেই নির্মল "আং ঔ।" করে উঠলে। ভারি মাথা ধরেছে তার।

নোহিনী বললে, "নোহিনী শাই।"

নোহিনী না দিলেন, "আং ঔ। ঐ রুক্ত রে। মারা গেলুম রে।" নোহিনী বললে, "বাবাকে ধরবি হী। ওই নিয়ে আসি।"

নির্মল কঠরাতে থাকলে, "আং আং ঈ। ঈ। ঈ। ঔ। ঔ।"

নোহিনী সকোচতে নির্মলের মাথা টিপে দিতে দিতে বললে, "ওহু আমার কাছে আছে। তোকে যেতে হবে না।" নোহিনীও নেমের পা টিপেতে বললে। কিছুতেই ও ঘর থেকে সরব না।

নির্মলের অথবা সারলে।

রাতের বাবাকে নোহিনী বললে, "নোহিনী শাই অজ ঢুব কই পেলে। এক্ষেত্রে মাথাবাঁধ। হবে না। মানুষকে কামড়ালে মাথাবাঁধ করবে না।" মানুষকে কামড়ালের সঙ্গে মাথাবাঁধার সঙ্গে নেপেন্টনের ভাকারী কোচুল উঠেচু হলে। অনন্য কেকারণ জেনে রাখা ভাকার মারেরই করব্য। এবার যখন কোন কোন এসে বলবে, "মাথা বাঁধ করবে।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কে কাকে কামড়ালে?"

নগেন্দ্র একবার তাকালেন নির্মলের দিকে, একবার নোহিনীর দিকে।

নিঃসর্গ আর অংশহা। ইলেট কুগমন। অংশহা বেরোয়া।

তোহে না হোন, তোহে বংশধর। ধ্যানে সমস্ত জানলেন। প্রথমকে কিছু
বললেন না। পেট ভরে খেললেন চেঁচে পুঁছে। আচ্ছা তোমালের হাত মুছে চেঁচের হাল্লেন বার কর। পান মুছে দিয়ে কয়েকবার মুখবিকৃতি করে নির্বলের ঘরে ঢুকে খানাকাশা করলেন। দেখা যাক তার গবেষণা সত্য না ধারা।

নোটুকুর নয়, কবিতার খাতি। নির্বলও কবিতা লেখে—অন্তত সবে লিখতে চুরি করেছে!

"তোমার আমার মিলন হবে বলে
আসছি কবে থেকে
(গ্রেমের) পশ্চাট মাঠায় করে হায়
চলছি হেঁকে হেঁকে।"

নগেন্দ্রমুখুণ্ড উল্টায় দেখলেন এই চোখ দিনে সাতাশটি কবিতা জাল
হয়েছে।

"তুমি চলবিয়া চল জলকে
আমি ধমকিয়া থাকি পলকে
মম অন্তরে গাছে বল কে সবি আগে। সবি আগে।"

অম্বুগর—

"মম চুম্বন সাদি’ লো সজনি
ঝঞ্চ’ উঠিলি বীণার মত বক্স তুহার ’ক্ষসিয়া’ ’ক্ষসিয়া’
ক্রাফিতে হলে মূল্যহাত।
ঝাঁঝাণ্ডোর জুড় চুম্বনি’
অধর তুহার ফিলাম প্রায়নি’
এই চুমনীড়ে তখন আপনি
পলকে হইলি কুসনরত।"

খাতাকানার ভিতরে গোটি। চারপাশ লয়। লয়। চুল অধিকার করে নগেন্দ্র-
মুখুণ্ড সমস্তে গলা পরিস্কার করলেন। ভাবলেন, “ভায়া তে, এদিকে এসে। নির্বল গ্রামের মায়া চৌকাঠের ওখানে রেখে ঠকুঠকু করে কাগতে কাগতে এল।

নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, “কত দূর এগিয়েছ, ঠিক বলো তো ??"
নির্মল বললে, “আ-আ-আঁক্ষে।”

“অক্ষা সাজছ কেন হে? আমি কি তোমার মাখা কাটছি? তবে আমার মাখাট। তুমি কত দুর কেটে রেখেছ আনতে ইচ্ছা করে। চৰ্চন আলিঙ্গনের পরিধি পারে দেখেছে, না ঘুরেছ করেছ?”

“আ-আ-আঁক্ষে।”

“তুমি তো ব্যাঙ্ক ভালো মানুষ হে।”

নির্মল কঠোর হর্ষে কী বললে শোনা গেল না। বাইরে সোহিনী
মেলে লুটিয়ে পড়েছিল।

নগেন্দ্র আরাহ দিয়ে বললেন, “খুন মশাই সেই খুন মশাই থাকবেন, আমাই অল বলল হলেও। অতএব এতে ভয় পাবার কী আছে!?”

নির্মল তু’ হাতে চোখ ঢাকল। সোহিনীও উকি মেরে তার দশা দেখে হাতে মূখ ঢাকল।

নগেন্দ্র গর্জে উঠলেন, “যাও, এটিকে নিয়ে যাও। গিয়ে ওটিকে দাও পাঠিয়ে।”

ওদিকে সোহিনীর হাসি গেল দপ্প করে নিবে। এ দিকে নির্মল কণ তুলল।

(১৯৩৩)
নবনীমোহন সম্বন্ধে অনন্যতা আছে যে সে দশ বছর বয়সে অবধি মাহুক্তকে সেবন করেছিল। এর মধ্যে অতিরিক্ত থাকতে পারে, কিন্তু এটা অনুমান নয়। কারণ মায়ের একমাত্র সন্তানদের একটি কিছুই হয়ে থাকে। আর বড়বোধ করে একাদিন পুত্রের পক্ষে অসহ্য বলে কিছু নেই। আমি আমার উক্তির স্পর্শে অসংখ্য নামীর ও দৃষ্টিতে পারস্পর, কিন্তু তা হলে নবনীমোহনের পাল নয়। হয়ে কমার উৎপলদু রায় ও রায় বাহাদুর তার কবর পাল চৌধুরীর জীবন-চরিত হয়ে বেঁত।

মোট কথা, দশ বছর ধরে নবনীমোহন অন্যতম না করক সন্তানের অভ্যাস রক্ষা করেছিল, এই ব্যাখ্যা বোধ হয় নিতান্ত অবিষ্কার হয়ে না।

এই নবনীমোহন সত্ত্বে মূর্খ হল। তখনো সে কতক খিদের ভেবে কিছু বিপ্লবী থেকে গেল। নারী দেখলেই সে মাতভাবে বিগলিত হয়ে পড়ত।

কথা বলত আধো আধো। স্নেহ। সে নারী বিনিম হন, যত বয়সেরই হন নবনীমোহন তার নক্তবর্তী হয়ে নানা। হলে একবার হাটখানা থেকে ফেলবেই, চুড়িয়ে বেলে তুলে টাঙ্গে কথাবারে, প্রায় গেলে বোচাটা খুলে পরিবে

দেবে, নেক্সুসের সোনা বটা কি না। তাও একাদিনে পালাই কথাবারে, এবং—

আলগেছে একটি বার তুলি স্পর্ধা করবে।

তার এই দুর্বলতা পুরুষদের চোখে পড়ত না। তারা তাকে উপরপিছবে করুন্নার্ক অবনবীমোহনের পুত্র বলে এতদিন রেখে করতেন যে তাকে সমন্ধ করবার কথা ধরেও ভাবতেন না। ( অব্যক্ত নগ্ন কেউ কিছু ভাবে না।) তার পর সত্যই সে সচরাচর এবং পতঙ্গাঙ্গনতেও সে ভাবে। ( কলেজের অধ্যক্ষ গোলমার বার প্রাইভেট টিউটার সে কি পড়াজাত ভালো না হয়ে

পারে ?)

মেয়েদের মধ্যে হঠা। মাত্রবৃত্তী তারা। কোলের ছেলেকে সমন্ধে করতেন কি ? তাদেরই মোহিনীভাব সঞ্চালিত হয়। তারা ভাবতেন ঠাঁক

নবনীমোহনের ইচ্ছাকৃত নয়, আনন্দিত।

আর হঠা। মোহিনী বলী—বৎসর বাংলা বা মোহিনী বলী—ঠাঁকের বলে একটু

শটক। বাধ্যেও তারা আগতি করবার মতো। স্পষ্ট কিছু গেলেন না। চেলেটির
চালচলন এমন আজ্ঞাধী-আজ্ঞাধী যে তারা তার হাটবার কায়দা, বসবার ধরন, আলাপের এগারী ইত্যাদিতে মনে মনে ধরে তার আচরণকে তারী একটা কোডের বিষয় মনে করতেন। না, ওর মনে গাড় নেই, ও তার কী করতে গিয়ে কী করে ফেলেছে তা ও বাণে না। ছি ছি ছি ছি। রৌদ্রিয়া তার পিছনে হাসাহাসি করেন। আনাড়ি, একবারেই আনাড়ি।

কোনোদিন কোনো পুরুষের কাছে তিনকার বা কোনো নারীর কাছে অপরাধ না পেয়ে নবনীর আশেপাশে অভ্যাস তো কাটল না। ওদেরকে সে ধাপে ধাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চের উপর উঠে অন্ধকার কুসরং দেখালে। সিঙ্গু নয়, জল নয়, টিপল এম এ। ম্যাগাজিনের এডিটর, ইন্টের্নেটের সেকেন্ডারী ইত্যাদি পড়ে বছরদিন ধরে কার্যমূল হয়ে দে মানুষ চিনেন কত! আর কত মাছেরই না তাকে চিনলে। একজন লাজেক অন্ধকার বলে সে এমনি খাতির পেলে যে তার সাহায্য না। নিলে কল্পেরকারের নিবাচন হয় না, ছেলেরা যে তার হাতে। নবনীমোহনের স্টেমেন্ট ও চিবর কাগজে কাগজে বেরিয়ে তার দেই নন্দনলালী চেহারাকে কুমারী মেয়েদের মধ্যে রেবারেবির বিষয় করে তুললো।

বড়লোকের এক ছেলে, টাকার ভাবনা নেই, তাই কিছু না করার যে আট সেই আটের আর্টটিস্ট হলো সে। সহজে কাউকে ধরা দিলে না। নারীর কাছে যায় নারীর মানুষাত্মক বলে। নারীকে বিয়ে করার কথা করলাম করতে পারে না। তবে কেউ বিয়ে করতে গুলিল স্বাধীনের বর্ধাত্মক হবেন নবনী বাবু। উপহারের সে জুন্ন সর্বাংশের দেয় তাই নয়, সব চেয়ে বাহু ও সৌন্দর্য উপহারের যুগি পেতে চাও তুমি তোমার বিয়েতে খবর দাও নবনীকে। কষ্ট করে নিয়মিতরূপে করতে হবে না, নবনী ওই ফর্মালিটি মানে না। তোমার সঙ্গে তার কতদিনের বন্ধন—কিংবা বন্ধনই আছে কি না—নবনীর পক্ষে এসব ধর্মব্যাপ নয়।

তবে নবনীর ঐ সর্বনেশ ব্যবহার সে মানুষ পর্যবেক্ষকে বোকাটি অক্ষরে অক্ষরে গালন করবে। চাপাকা গল্পের অমন যাহিয়ারা শিয়া আদাই হাজার বছরে এই একটা বেদিয়ে গেল।

বর অক্ষরে করে না। কে এই নিয়ে মাথা খাটায় বলে। সন্নেহ
করাটাও বে চোট লোকের কাজ। তারপর সে বিন আর নেই বে ঘরের
সঙ্গে অভিনব বা বন্ধকে ইন্টের্নেটের করে দেবে না। বন্ধুর কি লোকে।
ছেলে। নিজেই অন্যের গিয়ে হাজিরা দেয়। স্বপ্নগুলিকে অবনী মোহনের ছেলে, নিজেও নামকরা বাল-নেতা, কী রকম উপহারটা দিয়েছে মনে করচে তো?

"এই যে বোধ," নবনী এমন নবনীর মতো করে বলে। এমন চিনির মতো হাসি হাসে। "বেশ মানিয়েছে এই শান্তিধানা। যেখানে স্বপ্ন আপনি তেমনি স্বপ্নে আগন্তু এই ব্যাঘাতের পাদী। ব্যাঘাতের নয়? স্বামীরে সর্বশরীর মূর্তিধারার? বাঁধার আমাদের অথবা শরীর হলে চলবে না, হতে হবে ব্যাঘাতের। ব্যাঘাতের নয়, বাঁধার—এই হেক আমাদের slogan।"

তারপর কখন এক সময়—

কে এত লক্ষ করছে বলো। নববধু একাই হয়েছে। অন্যতম করলেন। তার কোনো আর হলো। তিনি কবোমাতে পালিয়ে অমর্কর্ণ করলেন। এদিকে বালগোপাল আঘাত করলেন পিসিমা কি মানিয়া তাকে আপাতবাদ অন্তর্ভুক্ত করবেন।

নবনীমোহনের শিক্ষা ভারতবর্ষে সমাপ্ত হয়নি। কিছু বাকী ছিল। সেই চেষ্টা তার ভাবে সমাপ্ত হলো তার মুখে আমাদের এই গল্ল।

আজ হেক কাল হেক শিক্ষা। সমাপ্ত করবার জন্য বাঙালীকে একবার বিলেবে মেই হবেই। কতলোক আইবুড়া বয়স না পেয়ে বুড়া বয়স বিলেবে গিয়ে ব্যাঘাত হচ্ছে, মাস্টার হচ্ছে, তত্ত্ব হচ্ছে, কিছু না হেক অথবা জিনার দিয়ে বা ডিলোমা নিয়ে আসছে, তাদের তালিকা। দিতে গেলে নবনী-মোহনের এই গল্ল শান্তিধারা দত্ত বা শরীর আনেনীরাওর জীবনী হচ্ছে উঠবে।

অতএব যুবনেতার নবনীও মাকে না জানিয়ে হয়ে গেলে। কলকাতা থেকে ভাঙ্গাং নিলেন। সে আহার কলের শরদ না। কাজেই অবনীমোহনও পর থেকে ছেলেকে ফিরিয়ে আনবার চাহিদা পেলেন না।

বক্তৃতার গবেষণায় ধারা। নবনী মনে হচ্ছিল যে অতিক্রমকে এক দেশে আবদ্ধ করার এক দেশে অবদ্ধ করা। একাডেমিস্টি। ওই মন্ত্রকে সংস্কারনা করে। যেহেতু বিলেবে মানুষ আছে। মাতৃভাষার মধ্যে বিলেবেড ভালো নয়। 'ইনি আপন, তুমি পর'-এ হলো। লগুচ্ছাদের গণনা। ধারা উদারচরিত তারা। প্রথার প্রতি নারীকে তাদের আপন অনন্যের ভিত্তে শিক্ষা পাচ্ছে বা সাহিত্যকে দাবী করতে বলে।

নবনী প্রচুর টাকা সঞ্চয় করছে নির্যস্ত। বাপও আরো পাঠার দিলে। এই
ঠাকুর বলেন যে বলিয়েছিলেন যে কোনো কিছু না করার আর্থিক আয় লাভ করবে। দেশের কাগজ গুলিকে যে ছাপাও ওখানে সে বিলম্ব ক্রমে বেশি করে সাইমন করিশারের বিচ্ছিন্ন লোকের গথন করছে।

মুসলিম হলো এই যে বিষয়ে নিজেদের গলায় হারাও নেই, কারণ হেরে নেই, তারা হাতে চুরি করেন না। আর ঠাকুরের ক্রমের গুণাবলিত তাদের হাততে দিয়ে পারেন না—সে চিনিন একই অস্টাইট, এই খুলো।

নবনী ছিল বাংলার সচিবি—অন্য প্রচলিত অর্থে। সে অনেক অনেকের অবস্থা মেয়ে বাচ্চা নিয়ে যা তা করলে না। তার যে বিশিষ্ট গবেষণা সেই গবেষণাটি তার অর্থ। পরবর্তী ভাবার বলেই হোক বা চরিত্রের মূর্তিতে মাত্রই হোক নবনী আত্মার দলে ভিড়ল না।

বিশেষতঃ ভারতীয় স্বাধীনতার এই স্বীকার দলটি—এটিতে নাম না লেখালে তোমার অনুরূপ নয়। এরা তোমার চরিত্রের উপর কে গাঢ় পাহাড়ার বলাবে। যদি নিজস্ব কোথায় হয়ে থাকো তবে তোমার তরে গেলে। আর যদি তোমার প্রাণে একটু রসবোধ থাকে, যদি কোনো। মেয়ের সখে একটু রসে একটু রস ভালে অমনি চর মহলে সাড়া পড়ে গেল। চরচর আনন্দে যে তোমি সেই মেয়ের সখে রাত কাটায়েছে। লেখা, লেখ তার বাবাকে, মামাকে, বাড়িতে, মুখেকে। ব্যাট। তুমি তুমি জল থাক।

বোঝা নবনীর কাল উভয়কে—যে উত্তম এভিই মৌলিক যে নবনীর পথে আর পথিক নেই—এই চর সম্প্রদায় তুল বুঝতে। সে একে তাকে লজ্জাচ্ছড়া উপহার কিনে দেয়—কেন? বিজেতার বাহুবলকে নিয়ে ধামি আসনে বসায়—কেন? ভুল ভ্রম রহস্যের তোলা তে এভাবে ওয়ালা খাওয়া—কেন? এত শর্ম যে অত্য তা কি বকুল একটু হিজী তনসর্প? বিখ্যাত করবে তুষ এ কথা?

চরবৃব্য অবনীমোহনকে বেশমী লিখে সতর্ক করে দিলেন। অবনীমোহন পত্রে পত্র লিখিলেন, “বাপু, হে, স্বীকারক অতি ভীরুশ্চিবার, শুধু শত্রুশাসন ঘটে, বিনা তৃণাঙ্গ সহ কোমণ্ড। পত্রপাঠ চলিয়া আসিব।”

নবনী অন্য চলে এল না। কিন্তু তার মনকে প্রেরণ করল যে ইংল্যান্ডের আর হিজীবি আছে। তখন তার ধারণা হলো যে ইংল্যান্ডের কেউ যে-সে নিয়ে বাচে, কেউ লিখিয়ে “বাংলা নাটক” সমাধ্যে—বাকর অতিমন এই, কেউ লিখিয়ে “কলকাতার হরিহরের” উপর—বাকর বর্ণনা। মহাভারতে আছে। ওর চেয়ে চুরির গ্যারিকের লক্ষ্যের উপাধি।
ভিতরে ভিতরে সে ইংরেজ রমণীকুলের উপর বিরক্ত হয়েছিল। তারা বেন মাদ্রা তার নয়। তাদের ভাবে রক্টত পরিবে দেবার ছলে নবনির হাত একটি চুরুল করেছে ফি অমনি তার। সে হাত কৃষ্ণভাবে ঠেলে দিয়েছে।
নবনী বুকের পাতে না, যথা। তার বুক বুক ঠেকিয়ে নাচতে গেলে স্বধি হয়ে যায় তার চেয়ে নিরোধ বিষয়ে কেন তাদের এত অপার্থি। নবনী সাব্‌যুত করলে ইংরেজ জাতাটাই লজিকু জানে না।

নবনী তে গেল পারিস। দেশের কাগজে ছাপা হলো ক্রাস্ট নবনী-স্যোধন ভারতীয় সুগুলী স্থাপন করতে যাচ্ছেন।
কিন্তু পারিস বড় হঘাঁ জাগ।। যেখানে নবনীমোহন যে গোল পান করেন তাতে তার নুপুর্পামা। আমার মতো মিটে গেল।
নবনীর সাথে গেল, সে cabaret-তে নাচবে। না আমি কার পরামর্শে এমন এক কাবারেতে গিয়ে উপস্থিত হল। যেখানে আলিবাবার মতো ক্ষুদ্র দিয়ে ক্ষুফ, ক্ষুব্ধ করে নেমে যেতে হয়। আলিবাবার মত মনে রাখুক আবার উঠানো যায়।
কিন্তু যে হতভাগ্য মতো ভুল তার হয় আলিবাবার শক্রের মতো নিঃসহায় মৃত্যু-অন্তত তার উপর দিয়ে হয়ে যায় নিঃশব্দ দয়াত।

দাঁদা তে নেমে গেলেন এক। সঙ্গে নিয়ে গেলেন না কোনো ভারতীয়কে, পাঁচে সে চর্চার করে। প্রথমেই করলেন যথার্থীতি একটি বোতল ধরিয়ে এবং একটি সমীরীনে নির্বাচন। এতগুলি কলপ-মাখা-মুল, সুমরা-খাকা-চোখের-ওত্তরা, খুর-দিয়ে-কামিয়ে-পেপসিল-দিয়ে-সেথা-ভুত, রঙ্গ-রঙ্গি-ওঠাড় ছাল তরুণী থেকে একটি নির্বাচন করতে অবিচল নয়নের নয় মন্ত্রিসেবায় পরিষ্কার হয়ে বায়।
বিভিন্ন বিভিন্নমোটে এ বিষা শেখায় না।

নবনী ঐ নির্বাচন কার্যে শিখর দেখালে। যে "ভূমিকিতে নির্বাচন করলে সে তে। উজারে কলধ্বনি করতে ধাকল। কিন্তু তার ভাবার বদ্ধি নবনী একটি চূড়া চূড়া। তবে রক্ষা এই যে প্রচুরের সময় হৃদ-পুর্বে ভাবার অভাব হয় না, যথান্তরত হন তাদের ওঘাঁ।

এক চোঁট নাচ হয়ে যাবার পর সমীরীনে জানালে, চলো, নিরালায় কিছু পানভোজন করা যাক। নবনী জানালে, নিষ্ঠা! তবে পান আমি নিজে করব না।
নিরালার নবনীর গবেষণা শুরু হলো। সে দেখলে "যুবতী"র বক্তে এক ছড়া পাঠারের মালা। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ঘিয়েছিল, "কী পাঠার?"

"যুবতী" এই বংশী বুক না, ইদিচ বুক। ফড় ফড় করে বুকের কাপড় খুলে কপট লজ্জায় দুই চোখ চোকল।

নবনী কোনোদিন অনাবৃত তুল দেখেনি। দেখে আয় মুখ। কাউ আনি। চেটিয়ে উঠলে, "Obscene! Obscene!"

এই স্থলে বলে রাখতে হয় নবনী হচ্ছে সেই জাতের মরালিস্ত্রা ধারা দুই ভিন পক্ষ বিয়ে করেন, এক আধ জন প্রকাশ্য জনক হন, তবু কেউ যদি কোনো কিছু উল্লেখ করলে অমন চেটিয়ে উঠেন, "Obscene! Obscene!"

দেখা তা চেটিয়ে উঠলেন, "Obscene! Obscene!" মুখের বুক বুকলেন, "চমকার! চমকার!" তখন বিনা আশঙ্কায় একে একে বৃত্তি অর্থ উদ্যোগ করলেন।

নবনী এর মতে প্রস্তুত ছিল না। তার সংখ্যা লোপ হলো।

যখন তার সংখ্যা ফিরল তখন সে দেখলে এক বিকাটকার পুরুষ তাকে চক্ষু দিয়ে গ্রাস করছে। এই রায় ফরাসী অধ্যা অপাচে অর্থ শুধু।

রাহুল তাকা। ভার। ইংরেজীতে বললে, "তুই আমার বালিকা তুইকে গ্রান্থ করে তার সতীনাশ করতে হয়। অরে দুরাচার, তোর এক বড় স্পর্ধার। আজ তোর প্রাণে নেব।"

এই কথা হলে নবনীর বেস্টাক্স সংখ্যা ফিরেছিল সেই বুক বুক যায়।

"বালিকা পৌরুষ জড়েছে হুরে একপাশে ধীরে।" "সাইকে তার প্রাণের প্রাণ নিতে উত্তর দেখে তার চেষ্টা অব এল। সে ইটুটু কর্মমোৈ প্রাণপিছি করলে।

"বাস্কে" বললেন, "এ লোকটা বিদেশী। বিদেশী-মার্চেই কাজের অভিষেক। একে মার্থন। কর্মমোৈ। কিন্তু আমার মতো মানী লোকের মানটি যে গেল তার সেখানে গিয়ে হবে একে।"

নবনী এতোদিন একমনে ভলানুকে ভাঙ্কিল। বললে, "দোহাই ধর্ষাবতার। আমার প্রাণের চেরো আপনি অন্ত হয়। কিছু নিতে চান সম্মত নিন"—এই বলে সে তার ঠাকুর খণ্ডি কপিট হতে গুঁড়ার চরণে নিযুজন করলে। যেন গুঁড়াই ভগবান।
চণ্ডী

ওয়ালে দেখলে কিছু কম পকে এক হাজার ক্রু। উৎসুক হয়ে বললেঃ
“Merci bien! এখন তোমাকে বাসায় যেতে হবে তো।” রাখো দশ ক্রুঃ সম্ভব। ওরে কুলটা, যা তোর নাগরকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আয়।”

নবনী বাংলাকে তার করলে, “আপনার আদেশ শিরোধার্য। দেখে রওনা হচ্ছ। আহারের নাম নলভেন।”

(১৯৩৩)
বিতর্ক

সেনের শ্রী একারের মেয়ে। সভাতা সমিতিটা নিয়ে অবসর কাটান। সেনের তাতে আপত্তি নেই, তবে খুব বেশী আশাও নেই। তার চুং এই কে সমাজের যেখানে যত অনাধুনা মেয়ে ছিল তারা সমিতির হুত ধরে তার তৃষা পোষ্য হয়েছে।

এই পোষ্যদের একতমার নাম শৈল। আবার বিধবা, মধ্যবয়স্ক। ভাড়া মাথা, মুখে বসন্তের বাগ, ধীরত্বের গজল হুমকির মতো। সেন তার বৃদ্ধকে ক্ষেপিয়ে বলে, “এই পোষ্যটাকে ভারি নিরাপদ। এর সুখে কথা কইতে পারা বায় দেখুন।”

পুরীর ইচ্ছা শৈলকে যাবজ্জীবন অন্ত সংস্থার অন্ত কোনো একটা বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করে সেন। বেচারি বুদ্ধিনী পরের অন্ধকার ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে। সেন বলে, “শ্রী বাণিজ্যবাজার পরিণাম তো এই। সমিতি করে স্বামীর গলগ্রহ সংখ্যা বাড়ানো।”

কড়দিন তারা মক্কালে বয়ে শৈলের কর্তৃত্ব করে উঠতে পারেনি। এতদিন পরে কলকাতায় বদলি হয়ে স্বামীগৃহীতে এ বিষয়ে উদ্যোগী হলে। চিঠি লিখে শৈলকেও আত্মরাও নিলে।

এখন শৈল হচ্ছে পড়ালি যাতে তারা কোনো ‘সন্তান’ বা ‘ভবন’ ভিত্তি করে নিতে চায় না। অথচ খুলে জায়গায় বয়স তার নয়। নানা স্থানে চিঠি লিখে সভাচর্যকর উত্তরও পাওয়া গেল না। বদ্ধ বাধ্যবদ্ধ নিয়ে স্থান করিয়েও শৈলের কোনো স্বত্ব হলো না। তার সব অনিষ্টায় চৈতলে কী কিংবা চাইল।

এদিকে শৈল যে বাড়িতে দু’ পাতা পড়ে তার লক্ষ দেখালে না। তার প্রধান কাজ সারাদিন ফ্যান খুলে দিয়ে বিচারায় পড়ে পড়ে। আর রাতে ফ্যান খোল। রেখে মূষিয়ে পড়ে। এও একরকম পড়। সেন তার বৃদ্ধকে বললে, “শৈল যে রকম পড়ছে তো ওয়েই স্বত্রী পাবে।”

শ্রী ওকে দুর্দশিনবার কথা পুরোকালে বললেন যে ফ্যান লাইটে বিতর্ক করছ। আর সব সময় লক্ষ্যও হয় না। সেনরা নিজেরাই হিষাব করে ব্যবহার করে। কিন্তু শৈল ঐ ইতিহাস রুখল না। ভোরে বখন হাওয়া মিলে তখনকে—
বিভূতিভূষণ

জানলা দরজা বন্ধ রেখে শীত ফ্যানের হাওয়া ধাঙ্গা। সেই ফ্যানের বন্ধ সেনের মাথা বন্ধ দেখাতে। সেন বলে, "এক শীতল ফ্যানের অবস্থায় রাতের টাকা বিল করে বেঁধে রেখে।"

স্বীকার করেন, "তা হোক। এই নিয়ে অতি মাথা ধানালে মনটা ছোট হবে যাবে।"

বেচারা সেন বিল ও বিল দুইয়ের মধ্যে মিল রাখতে না পেরে কোনো আপনি চাচা দিয়ে শীলকে পাঠাতে প্রয়োজন ছিল। কিন্তু স্বীকার উপর অতিরিক্ত সময় হয়ে উঠেছিলেন, সেনের প্রশ্নের সাথে দিলেন না।

শীল নাকি থোকনকে তারি ভালোবাসে। থোকনও তার কাছে থাকতে পেলে মাঝে তুলে থাকে। শীলই তাকে নাওয়ায়, খাওয়ায়, তার সঙ্গে খেলা করে। সেন এখান পেরে ভাবলেন, বিধবা মায়ের, নিঃসন্তান, এই তার জীবনে এক সান্নি সার্থ্যে। আহা, থোকনকে নিজেই খানুক নে। সেনের ভাব আন্দাজ করে স্বীকার করেন, "থোকার নতুন মা থোকাকেও খেলে অন্যে। আমি এবার নিশ্চিতে চোখ দূষিত করে পারি।"

সেন বললে, "তুমিও থেকাকে সেনের হলে। থোকার কি বিশ্বাস গলে যার ঘট শীলবাদ তার ঘট হবে?

এখন সেনের স্বেচ্ছাসেবক নাম কমল। সে স্বীত্ব হয়ে বললে, "বাও।"

শীল সেনের বাড়িতে অতিরিক্ত হিসাব থেকে গেল। সেনের স্বীকার আরামের রাখেননি। আহারেও চুক্তির মতে থাকে (কতকটা) সে কারণেও, আরাম তারা নাকি শিশুকে অফিস বাইরে যুথ পাড়ায় (অংশীদার) সে কারণেও। এতদিন তিনি নিজেই আহার কাজ করতেন, বেয়ারার সাহায্যে। এখন শীলকে পেয়ে তার ভাবনা গেল।

শীলও সেন বর্ষে গেল। প্রায় ছুটে এসে বলে, "কমল, থোকা—করেছে। আমি তুলে ফেলে দিয়েছি।"

সেনেরা লক্ষ করল শীলর তাত্ত্বিক উৎসাহ। থোকন কিচ্ছু একটা করলে সেও শিশুর মতে দোঁড়ালোড়ি করে। তার সোরগোল হেন বাইরের লোক তাতে বাড়িতে ফিসের উৎসব। প্রায় থোকন যদি কিচ্ছু না করে তবে শীলর তাতে নিয়ে অতি হুস্তিতা। পৃথিবীর জনিতে যায়, থোকনের তো এখনো কিছু হলো না।
সেন বললেন, “ও জাতে কী? ধাঁধাড় নয় তো?”
পীর বললেন, “এই অস্পষ্টতা বর্জনের দিনে এ সব মামলা পরিহাস ভলে নয়।”

তবে তিনিও চুপ চুপি হলেন। শিশুর আঘাতের সঙ্কেত মাঝে মনে বিকার নেই, কিন্তু কোন মা তার জন্য গরে ফীত হন?—“শোকন আজ তো করেছে তা এমন চমৎকার হয়েছে! একটা দেখবার মতো জিনিস হয়েছে, কমল।”

একটা মায়া বাড়িতে এক মাস ধাকলে সে যদি মেয়েমাঝুড় হয়ে থাকে তবে বাড়ির নিজের সঙ্গে বোমা-খোলা কথাবার্তা না করে পারে না। আর শৈলকেও ঘটত। অবগৃহিতার মতো দেখায় ততটা সে নয়।

তার অন্তজ্ঞীন কোতুক সেনদের স্বামীকে লিখিতে থাকেন।

কথায় কথায় সে এই একটা গ্রেসিয়ে পাড়ে, আর সেনদের পীরকে পরামর্শ দেয়, উপদেশ দেয়। পীর নাকি স্বামীর উপর বতর মতো নজর রাখে। তিনি নাকি স্বামীর বিষে তর নিচে না। অত্যন্ত রাজ্য যে তাঁর একত্র শোন না সেটাতে স্বার বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় না। স্বামীতে খুব ভালোবাসা আছে বলে দৃষ্টমান হয় বটে, কিন্তু স্বামীকে প্রত্যহ সম্মত না করলে সে ভালোবাসা তবে তলে করে যায়।

এমনি সব উপদেশ ও পরামর্শের শেষে প্রশ্ন করে বড় কোম না। প্রশ্নগুলো যেমন অস্পষ্ট তেমনি অস্বী তাঁর থেকে বোঝ যায় তাঁর নিজের অভ্যন্তর ধ্বংস ক্ষীণতাকৃতি। আবার এন বোঝা যায় যে সে পরের অভিজ্ঞতার সংবাদ রাখতে অভ্যস্ত।

সেনদের পীর হ’সেনবার রাগ করবার চেষ্টা করে দেখলেন শীঘ্র দমবার পাত্রী নয়। তাঁর যা বক্তব্য তা সে বলবাই। তখন তিনি কৌতুকে বোধ করতে লাগলেন। লেখাপড়ায় যে “আজ, ‘আম’ অবধি উন্নতি করেছে, আর পারেনি, পারতে চায়ও না, সেই মায়া অংশ বিবেচনা একজন অধ্যক্ষ করে?“

স্বামীকে বললেন, “ওর একটা বিষে দিতে হচ্ছে।”

সেন বললে, “আজকালকার দিনে বিধবা বিবাহ করতে যদিও অনেকের সাহস হতে তবু কার এত মনের জোর যে অমন সর্বোপরি ও স্বনীতিতে প্রশ্ন করবে?“
বন্ধু ওর ঘাঁটি ঠাকুর চাঁদ ভাবি কোন হতে পারে তার সেনারা খুঁটিয়ে পায় না। কিন্তু অমন ওষুধে ও রাজি হবে না। ও যে ভর্তরের মেয়ে! বিনা প্রস্তাবে বিনা নিযুক্তি না আয়রের কাজে করতে ধাকল।

খোকনকে সংজ্ঞা নিয়ে একা রেখে যেতে পারতেন না বলে সেনার প্রধান রাজতে বোঝাও বড় একটা যাওয়া হতো না। কিন্তু শৈল খোকনের ভার নেওয়া তিনি রোজ টিকে চললেন। বলা বাহুল্য তার না হওয়ায় সেনারও টিকে যাওয়া হতো না, এর জন্য সেন কর্তৃবাহ আয়রা রাখতে বলেছে ও গ্রামে নারাজ দেখে মনে মনে ধরে নিয়েছে যে তুই বোধ করি আয়রা সহজে সবাইর আগ্রহ করতে সম্মত হবে।

টিকে গিয়ে শামী-ষোলে সেনার মনোমালিন রইল না। তারা ভাল্লা রাখলে বোধ করলে। এবং এর জন্য সাধারণ দিলে শৈলকে।

বাড়ি ফিরে তুমি তো থাকো না। খোকন কারণে তো?" শৈল বলল, "না। সত্য একবার করেছিল।"

খোকন যুথিয়ে পড়েছে তার মাও ফিরছেন আর শৈলের এ ঘরে কাজ কী? সে ঘর নিজের ঘরে।

বুলার আগে সেনদের বিষন্নাটের উপর পড়ে তার সুরক্ষা দৃষ্ট। আর এই এক বিহার। আর ওই এক বিহার?

খোকনের দিকে তারকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে না।

শৈলের বৃত্তিভিক্ষার ব্যবস্থা হয় না। সকলের বললেন ওকে আগে কিছু লেখাপড়া। খোকনকে বললে। ওটুকু লেখাপড়া শিখতেই তার লাগবে তিন চার বছর। তারপর আরে তুই তিন বছর ধরে বৃত্তিভিক্ষা। তবেই হবে সে খাল্লী।

তত্ত্বন তার শিক্ষার ক্ষত্র রাখতে সেনের আঘাতিক অপারতি। সেন বলল, "আমাদের আঘাতীর আঘাতীর মধ্যে সাহায্যপ্রাপ্ত রয়েছে কে তাদের দাবী আগে। আর খাবল্যের জন্য শিক্ষার বা আঘাতীর কী? এই তো বেশ আয়রা কাজ চালাচ্ছে। আমি ওর ফ্যান ধরা কোন রেখে বিষয় মাইনেও দিতে আজ্ঞা আছে।"

তুই বললে না, না। আমরা ওকে হাতে পেয়ে ওর চেহারাভক্তকে। এর চার সারা জীবনের একটা সংখ্যা। আর হয়ে ভর্তরের মেয়ে জীবন কাটিয়ে যেতে, এ কী অনুরূপ কথা।

তুই বললে না, কিন্তু গা করেন না। শৈল থেকে তার হাতে সময়-
এসেছে। রাশি রাশি টাকার চেয়ে যৌনকালে একটি বানিস সময়ের দাম কম নয়।

আর শৈলও আছে বলো। এই গরমে ওর দেশে ওর সবচেয়ে ছিল হাল পাখা। এখনো সেই হাল পাখা ওর সঙ্গে আছে। তাতে নাম লেখা—

“শেবালাদেবী।” সেটা লিখে বাতাস করতে যে কসরটা হতো তা বেচেছে, সেটার উভাপশারিণী শক্তির উল্লেখ নাই করলুম। মায়ের সঙ্গারের ধাতুতির বন্ধুর থেকে রেহাই গেলে শৈল এ সঙ্গারে দিয়ে আরামে আছে।

তার শরীরের পুটী—এমন কি তার মুখখীতে লাবণ্যসঞ্চার—পৌষণী করেছে তার ইদানীকা নাচ্ছে। বাধিন্তাতে তার অনিশ্চুতরূপ। সেনের স্ত্রী তার ছোট বেন। ছোট বেনকে সে ভালো বা করবে কেন, আর ছোট বেনের অন্নকড়ি বা কেন নেবে? তার যখন যা খেতে মন যায় তা ঠোকরে বিনয় নিয়ে চায়। তবে সে কাশীতে গয়না তৈল্যে তীর্থ করতে গিয়ে অনেক মুঘরাচক খাট তাগ করে এসেছে। সেন বলে, “তাতে তার দুরর্নিত প্রমাণিত হয়। নভুবা এ বেলা মালিকোয়া ও বেলা রাব্বি খেতে খেতে ওর রায়ান অন্যান্য হয়ে যেতে যে ওর স্বাবলম্বনের আর কুলোত না। কিন্তু ও যে কেমনই কঠিন কাজের অন্যায় হলে উঠেছে, স্বাবলম্ব হবে কি করে?”

স্ত্রী বলেন, “ও যা করেছ তাই বড় সহজ নয়। একটা শিয়র সাহসী ওর হেপাচতে। এমন সচ্চরাইন আয়াই বা পার কোথায়?”

তারপর সেন নিজের চরকায় তেল দিতে অতিরিক্ত বাত্তি ছিল। শৈলগুলো না হলো যৌননেবার অবসর পাইনী। কঠিন স্ত্রী ওর প্রসার চেতলে সেন বলত, “ওল মেয়েদিন ব্যাপারে আমি হতদৃষ্ট করতে চাইনে।”

এক হিসাবে দেখতে গেলে শৈল তার শ্রীর সত্যিকার দিব্যর তো হতে পারত, থোকনের সত্যিকার মাসিম। শৈল যে থাকি হতে আরার কাজ করছে এর নিশ্চয়ই একটা moral effect আছে থোকনের উপর। বিধবা পিপিমা মাসিমারও তা আশ্রিত হলে তাই করতেন। আমাদের বিধবা। দেবী।

তাকের ঐ দৌড় আমাদের পক্ষে ভারি হবিধে। তাতে ঘরের টাকা বাইরে বায় না। অধিকতর চেলেমেয়েওগোলের উপর moral effect যা হবে তাতে তারা মাত্র হয়ে যায়।
বিভাগিকা

হঠাৎ একদিন তোমার লাগে বললেন, “শৈল কি তোমার বাড়ি বি-গিরি করতে আসেছে?”

সেন বললে, “না। তুমি তোমার বিধবা ছিলে। তুমি যেবো।”

“ওর শিকার অতে তুমি কী করলে?”

“আমি এক পক্ষে ক’টা দিক দেখি। তুমি আপিন্স যাও তো। আমি ‘দরনে’ বললে ‘সরার’ ‘সমিতি’তে যাই।”

তিনি কালো কাঁধা হয়ে জেগ ধরে বললেন, “না, না, একটা কিছু করা উচিত। ওকে আর আমি এখানে থাকতে দেব না।”

সেন ভাবলে, কোনো ইচ্ছার কারণ দিয়েছে না কি সে। ভঁতে সে বললে,

“কি হয়েছে?”

তিনি উগ্রমুখি ধরে বললেন, “এই সবের জন্য আমি আরা রাখতে চাইনি।”

সেন মনে মনে কুতিরক্ষা সরবরাহ হয়ে পড়ল। তবু পরিহাসের ছলে জিজ্ঞাসা করলে, “কলমবেনের মধ্যে আপিনি কী অপরাধের অপরাধী?”

তিনি হেসে ফেললেন। “না, তা নয়। কিন্তু এ যে আরে ভয়ানক।”

স্বামীর সহিত আচরণের চেয়ে নারীর পক্ষে আরে। ভয়ানক কি হতে পারে সেন তা আমাকে করতে পারলে না। বসে পড়ে বললে, “আরে ভয়ানক! গন্ধ চুরি করেছে?”

তিনিও হাসলে হাসলে বসে পড়লেন। “তোমরা আমাকে পাগল করে ভুগতে দেখেছি। একজন দিয়ে ভয় পাইলে, আরেক জন দিয়েছে হাসি পাইলে।”

তিনি যে বিবরণ দিলেন তা অনেক সেনেরও আতঙ্কে রোমক্ষপ হলো।

উষ্ণ মাঝারী চুল উঠে যা বার দানিল। হুই হাতে মাঝা ধরে সেন বললে,

“ও আপনকে আসতে লিখেছিল কে? আমি তো এই আশা নিঃসন্তান।
বিধবাদের প্রতি বিক্ষণ। দাও ওটাকে বিধবরিবাহ সহায়ক সহায় পাঠিয়ে।”

ফুে (নিচের) হুই কান মলে বললেন, “আমিও কান মলেছ। আর
কখনো শোকনকে দায়া না হয়নি তাদের কাছে ছেড়ে দেব না। তুমি
উকিতে যেতে চাও তো আরেকট বিয়ে করো।”—তিনি কেঁদে ফেললেন।

(১৯৩৩-৩৪)
চুপি চুপি

বনোয়ারীলাল তার তৃ ইন্দুকে চুপি চুপি বললে, “তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।”

ইন্দু সাক্ষাতে বললে, “আমার সঙ্গে?” সকোচুল বললে, “কী কথা?”

“ভয়ে বলব কি নির্ভরে বলব?”—বনোয়ারীর মুখ অষ্ঠাভাবিক গভীর।

বেন সে হাসি চাপতে চেষ্টা করছে।

“না, আমার তুমি কাজ নেই।” ইন্দু ধীরে ধীরে বললে, “চুমি যা বলব তা আমি জানি।”

“তাই নাকি?” বনোয়ারী সকোচুলকে বললে, “বলো। দেখি আমি কি বলব?”

“কী বলব?” ইন্দু মাথা দুলিয়ে বললে, “বলবে—এই—একটা কিছু ভাষার কথা। কোথায় কার কাছে জন্মে এলেছ।”

“না, না!” বনোয়ারী পুনরায় গভীর হয়ে গেল। “না, না, ভাষায় নয়। সত্যি। আমি ভারি ভাবিত হয়ে পড়েছি।”

ইন্দুও ভাবিত হলে। তবু হেসে উঝিয়ে দিয়ে বললে, “হ্যা! চুমি ভাববে। হাসি ছাড়া তোমার মুখে অন্য কিছু কি কেউ কোনদিন দেখেছে।

মা গেল, বিদ্বঘ্ন যমি কেউ থাকে এ যুগে তবে সে চুমি।”

বনোয়ারী সঙ্গে বললে, “আমি ভাবব না, তো কে ভাববে, ইন্দু।

কোন বলে আছি শক্তিরাজ ভিতে। দেখতে দেখতে গোটা চুই ছেলেমেয়ের হয়ে গেল। আরে হবে যদি না—”

“যদি না?”—ইন্দু অক্ষুশ করলে।

বনোয়ারী ইন্দুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কী বললে তা। আবার আঁধি গেলে আমি।

ইন্দু কোন লজ্জায় উত্তেজনায় ও ঘণ্টায় অপকরণ হয়ে বললে, “ভয়েলোকের

ছেলে না চুমি। অগ্রলোকের যেমন এমন কথা বলতে ভয়কাণ্ড

নাস্ত্র হয়।”

“চুপ, চুপ, ইন্দু। চুপ, চুপ।”
চুপি চুপি

"চুপ, চুপ? চুপ করব কেন? বলব গিয়ে মাথে, বলব বাঁধকে, বলব সবাইকে।"

"লম্বাটি—"

"ছাড়া, হাত ছাড়া। ভিজে বেড়াল। আমি ভাবলুম কী নতুন তামাশার কথাই শোনাবেন। না, জম্মুনাম—"

"তোমার পায়ে পড়ি, ইন্দ্র!"

"ও কী! চি, চি? তোমার আজ হয়েছে কি?"

এর চু বছর পরে বনোয়ারীর চাকরি হলো। চাকরি ধরে এসে তখন আরো একটি চেলে হয়েছে বলে চিন্তা করা অশ্বেদন। বনোয়ারী বরং খুশি হয়ে প্রথম মাসের মাইনে দিয়ে ঘটা করে আপনার লোকজনকে খাওয়ালে। বললে, "এ আমার তৃতীয় সপ্তাহের কয়লায়।" ছেলেটি পরমত।

চতুর্থ সপ্তাহটি ধরে ভুমিশ হবে—সে আরো বছর দেড়ে পরের কথা—তখন যখন মাঝে টারন্টোল। যাকে বলে tug of war. একবার যখন বলে, "হেইও।" একবার মাঝে বলে "হেইও।" অবশেষে যখন হয়ে কারু। প্রায় অঠারো মাসের সময় ভাকারকে সংগে দিয়ে বনোয়ারী জনন ভাকারের এই অংশ, "আপনি কি মাঝে, না মেয়ে?" ভাকার এমন গালাগালি দিলে যে বনোয়ারীর বিখ্যাত হলো সে বাপ হয়ে উঁকের আপত্তি করেছে।

শুধু এসে মেয়েকে নিয়ে গেলেন। তার মুখভাব সেই ভাকারের মুখের মতো। শাক্তীর বললেন, "আমার দুটি নয়, পাঁচটি নয়, এক টিমাটার মেয়ে। তার এই দশা। আহার, বাছু বে! কেন তোকে আগে আনাইনি?"

বনোয়ারী কাজের মধ্যে ভুব মেয়ে বাঁচল। স্বাক্ষে সে ভালোবাসত। বিরহে যে দিন দিন মোটা হলো তা নয়। তবু এক রকম শুষ্কতে বাস করায় তার ভুঙ্গির লক্ষণ রেখা। দিল। বিরহের সময় রেশা বনিন। করে একচে এমন সময় শ্রী এসে শপরায়ের উপস্থিত। বাপের বাড়িতে তার আর কিছুই অধিকার, ভাইদের সংসার হয়েছে, তারাই যা করে তাই হবে। ইত্যাদি।

বনোয়ারীর চার সপ্তাহের সহিত তাদের মাথে দেখে চতুর্থাব্দ খুশি হলো। তা হোক। কিন্তু আসল কথাটি ফুলল না। এখন তার চাকরি হয়েছে। শুধুরের গলগ্রহ নয়। অল্প যুগে বললে, "দৌড়া নিয়েছি। অসিকার ব্রুতে হবে।"
ইশ্ব তো ফেললে হেসে। তুমি দিয়ে শাসিয়ে বললে, "আচ্ছা, নে দেখো যাবে।"

জোতায়ুগে একমাত্র লক্ষ্য ঐ ব্রত উদ্যোগ করতে পেরেছিলেন। কোনো যুগে অতুল কেউ তা পেরেছে বলে পুরোঁরে উল্লেখ নেই। কাজেই বছর না পুরোতেই পঞ্চম সম্পদের আগমনের বাড়া এল। বনোয়ারী এটা লক্ষ্য হয়ে পড়ল যে ব্যাবস্থার দিকে তাকাতে পারলে না। দিলে তাকে তার বাড়ির বাড়ি পাথারে।

পঞ্চম সম্পদের ইশ্ব কে বীচতে দিয়ে নিজেই যথেষ্ট রথে উঠল। যাত্রায় ও শোকে ইশ্বর চেহারা হল। ইশ্বরের মতো। তার সে লাবণ্য নেই, তার আত্মস্বীকার গেছে চিরকালের মতো ভেঙে। প্রথম রথে বললেন, "অমন আমাই এর জেল হওয়া উচিত।" শামতী কাপালে ধাক্কা হেনে বললেন, "আমার নাতি রে।" বুড়োয়া ফোকালু মুখে হাসলেন, "এ কালের চেলোর সংস্থ কালে বলে আনে না।" বুড়িরা ভুড়ি দিয়ে বলাবলি করলেন, "নাতির যুব বেধে পাওয়া কলিয়ুগে ক্রমেই দর্শন হয়ে উঠছে।"

বনোয়ারী ছোকে দেখতে এসে লক্ষ্য মাধ্য খেয়ে বললে, "তুমি বছর বেঁচানো মায় সকলে কোথাও দিয়ে শরীরের ফারাও।"

ইশ্বু বলিয়াই ইশ্বুর হয়েছে, তবু তারও তো একটা অভিমান আছে। নে বললে, "তুমি আরেকটি বিয়ে করো। আমার এ শরীর আর সারবে না।" বনোয়ারী তাকে প্রবাধ দিয়ে বললে, "যখন তোমাকে চূনি চুনি একটি কাঠা বলেছিলুম তখন গলাতে তা এমন দুর্ভাষ্য হতো না।"

ইশ্বু কোল করে উঠল।—"আবার সেই বেয়াদবি। মনে রেখো আমি তোমার ছোক। রক্ষিতা নই।" বনোয়ারী মনে হোচ্চিয়ে খেয়ে পড়ল।

করেক মান বাচাতে কাটিয়ে গায়ে আধ্যাত্মের জলদুর নিয়ে ইশ্বু একিনশন বনোয়ারীর কর্মসূচি এল। বললে, "তোমার কথাই শুনব। শ্রীরামবাবুর গীত কাটে বিভ্রম সমৃদ্ধ পেয়েছি। হাসার হোক পতি পরম গুরু।"

বনোয়ারী কৃত্ত। উৎফুল্ল হলে তা ব্রতীমাদেই অনুষ্ঠান করতে পারলেন। বগল বাজিয়ে লাফ দিয়ে বড় বড় কবিরের ভাল। ভালা কবিতা স্মৃতি অগাভালাল। বললে, "এত মনে জানলেম যে কালে কালেবলে ধর্ম রে ধর্ম।"
বনোয়ারী যা মনে করেছিল তা নয়। শ্রীরামবাবু তাঁর কোন এক ব্যাপারে মাহুল্যী ও সর্বাধিক গৌরবের নাম ঠিকানা দিয়েছিলেন। একদিন তিনি তাঁর সব আপন এসে হাসিয়। বনোয়ারী তর্ক করে বললে, “ওসব মনে করে চোখ ঠাণ্ডা করে। মন ভুলেও দেহ ভুলে না। বৈজ্ঞানিক সাংস আশাতে হবে।”

ইন্দু বললে, “ও যে কৃত্তিম।”

বনোয়ারী বললে, “ওয়ুধ বুকি কৃত্তিম নয়।”

ইন্দু বললে, “ওয়ুধ হলো গাছ-গাছড়ার থেকে তৈরি।”

বনোয়ারী বললে, “রবারও গাছের রস থেকে প্রাপ্ত।”

ইন্দু মাধ্যম হাড় দিয়ে বললে, “ছি, ছি, যে মাস্তহ বুখেও বুখবে না, তাকে বুখিয়ে বলা কী অকস্মা।”

বনোয়ারীরও ঠিক সেই মনন্দ্রই করলে।

খামী-স্ত্রীতে সত্তিযিরোগ হলে ত্রীর মতই বহাল থাকে। এই হলে সন্ত্রাস বিদী।

ধর্নেকালে ইন্দুর মাধ্যম উঠল গৌরবের বিদায়। তে একে এককি পাকল্য হয়ে বাধ্য এর অভাসও দিলে।

বনোয়ারী তাকে এড়াতেই চায়। ইন্দু বললে, “কোথা যে মনেও কেন কামান করে।”

বনোয়ারী তার মুখে হাড় দিয়ে বললে, “পাগল! কী যে বললো?”

ইন্দু হাড় দিয়ে দিয়ে কাঠামো হয়ে বললে, “পাগল বই কি। বলবেই তা পাগল। পুরোনো বোকে পাগল অপরাধ না দিলে তো নতুন যে অনেকে পারছ না।”

বনোয়ারী ভাবলে, এ কী সংকট। তে ভগবান, তে আমি, তে পাকল্য তোমরা সকলে দিলে এ হতভাগ্যের একটা গতি করে।

গতি হলো। তা মামুলি। গুহ্য সত্ত্বান সাধ্যের নোটিস পাওয়া দিলে।

বনোয়ারী বললে, “ধীর বিলাস্বলিত। প্রমাণ করিয়া দিলে হারার টাকার পুরস্কার বিদ। ভূত ভালো যে হাজারটা টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে।”

ইন্দু বললে, “কী? অমনি যাব সকলের সাক্ষাতে প্রমাণ করতে।” ভূতি খামী হয়ে একে ইকিহত করলে।"
বনোয়ারী বোঝার ইতিমধ্যে ঘুড়িটি অত্যন্ত হয়ে মাঠের টাক পড়েছিল। বেশ একটি চর ভুবল, আরেকটি চর উঠল। সে দিঘাটারা হয়ে বললে, “বেশ, বেশ।

ইদু আখালি বম থ্যাকার করেই না। বললে, “দেখের জন্য আমার এই বথতাপ। বেশকে বলবান করে হলে তার জনবল বাড়াতে হবে।”

বনোয়ারী বললে, “ঠিক বলেছ। ইংরেজের চেয়ে সাধ্যায় সাতগুণ হয়েও ভাবের সরক্ষণ হতে পারে যাবে না, অতগুণ হয়ে এমন ধাক কো হয়।”

“সেখানে, এইবার ঘরাগ হবে।”

“হা, আরো বলাচি বাঢ়বে। পরস্পরের মাধ্যম বাড়ি। একার লোক আরো ঘরাগ হবে।”

বনোয়ারীর গত্য দীনফ হয়ে উঠেছিল।

যেনকে তাঁর বাঢ়ির বাড়িতে নিয়ে কাউকে কিছু না বলে বনোয়ারী নিক্ষেপ হয়ে গেল।

তাঁর খাদ্য কাগজে বিস্তাপন দিলেন, “বাবা বনোয়ারীলাল, ফিরে এসো। তোমার শুরু তোমাকে রেখার মধ্যে পাগল।”

বনোয়ারী ভাবলে, পুরো পাগল হয়েছে তা হল।—আরো দু'শের মাইল নোড় দিলে।

ঘরে বিস্তাপন দিলেন, “বাবা বনোয়ারীলাল, ফিরে এসো। তোমার চাকরি এখনো আছে। তোমার শুরু তুর দুঃখ চোখে দেখা দায় না।”

বনোয়ারী ভাবলে, মুক্তির ধার পেয়েছি। দুঃখ মিড়যা। চাকরি মায়া।

—আরো তিনশে মাইল পাড়ি দিলে।

ঘরে বিস্তাপন দিলেন, “বাবা বনোয়ারীলাল, ফিরে এসো। তোমার যথে সমান ভুলিয়ে হয়েছে। প্রথম ও সমান হ'জনেই নিরাপদ।”

বনোয়ারী জন্য পরিতৃপ্তদের যথে ইন্দিয়ার (sixth sense-এর) তপস্যায় সার। যথে সমানের সম্বাদ তাঁর চক্ষুরের গোচর হলো না।

(১৯০৩-০৪)
বিমৃদ্ধি

প্রিয় নির্বল,

নিম্মরেণের জন্য বহু ধন্তবাদ। কিন্তু একটি কথা পরিকার করে রেওনা পরিকার। এক আসতে হবে, না সত্ত্বাক। ওটা কি পুকুরদের পার্টি, না mixed? ইতি। তোমার

সোনানাথ

প্রিয় সোনানাথ,

তুমি জানতে চাও পস্ত্রীক আসবে, না পরগ্রাহী। এর উত্তর দিতে আমি অক্ষম। তবে এটা পুকুরদেরই পার্টি, কাপুকুরদের নয়। ইতি। তোমার নির্বল

প্রিয় নির্বল,

রশিকতা রাখন। কাজের কথা হোক। যদি পুকুরদের পার্টি হয় তবে আমার শ্রী কী করে শুনলেন বে অনু কোরো কোরো। মহিলা বাছেন। ইতি। তোমার

সোনানাথ

প্রিয় সোনানাথ,

তোমার শ্রী ঠিকই শুনেছেন। মহিলাদের জন্য বহু ধন্ত আশুগপ। ইতি। তোমার নির্বলের নিম্নলিখিত করা হবে।

সোনানাথ

প্রিয় করণা,

তোমার নিম্নলিখিত প্রতীক্ষায় বসে থাকলে দেখেছি প্রস্তুত হবার সময় পাব না। এক লাইন লিখে জানিয়ে তোমার শব্দ কি আছে। ইতি।

তোমার

হৈছেনি
গীত হৈমলী,

তুমি আমার নিষ্পুঞ্জ-লিপি পাওনি জনে অবাক। তবে কি আমি নিষ্পুঞ্জ করিনি? তুমি কিছু এসো। নিশ্চয়। তুমি না এলে এত খাবার খাবে কে। ইতি। তোমার

হৈমলী

গীত হৈমলী,

আমি কুষ্টি কত খাবার খাই। অনন্য খাবা। চিঠি লিখলে আমি বাব না। ইতি। তোমার

হৈমলী

গীত হৈমলী,

রাগ করবে তো? আমি জানতুম তুমি রাগি মানুষ। কিছু যাই হয়। এটা ছোটলোক হবে না যে নিষ্পুঞ্জ পেয়ে উপেক্ষা করবে। ইতি। তোমার

হৈমলী

গীত হৈমলী,

ছোট লোক কারা? যারা খামারে তাকলে বীরে তাকলে তুলে যায়, জ্বালাবলে এত খাবে। আমরা কেয়ার করিনে। বুঝলে? ইতি। তোমার

হৈমলী

গীত সোনাতুৰ্ক,

নিষ্পুঞ্জ ক্যানালে করতে বাধ্য হইছ। কিছু যান কোরে না। ইতি। তোমার

নির্বাল

গীত নির্বাল,

আমার বীর কাছে লেখ। তোমার বীর চিঠি পড়তে দিচ্ছ। পড়ে ফেলি যায়। দোষটা পক্ষের নয়। ইতি। তোমার

সোনাতুৰ্ক
নিম্নলিখিত

প্রিয় সোমনাথ,

আমার তো দুটি নয়, পাঁচটি নয়, একটিমাত্র স্ত্রী। দোষ যদি করেই থাকে তবু My wife—right or wrong! ইতি। তোমার

নির্বল

ঢ

প্রিয় নরেশ,

শনিবার

এই চিঠিগুলি পড়ে ফেরৎ দিতে চুলে। না। সেখানে তো কী রকম অযাচিত অপমান। তোমরা যদি ও বাড়িতে নিম্নলিখিত খাও তবে বুঝব তোমরা আমাদের বছর নাও। ইতি। তোমার

সোমনাথ

প্রিয় সোমনাথ,

ব্যাপারটা সত্যি পোচনীয়। কিন্তু আমরা নিম্নলিখিত ধরে না। করলে ওরা ঠাওরার মেটিমেটের উচি দিয়েছে। তার চেয়ে এক কাজ করলে কেমন হয়? আমরা গিয়ে নির্বল ও তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মিটমেটের চেষ্টা করি। ইতি। তোমার

নরেশ

প্রিয় নরেশ,

তোমরা গিয়ে মিটমেটের চেষ্টা করলে ওরা ঠাওরার আমরাই তোমাদের পাঁচটি নয়। আমরা তো দোষ করিনি, আমরা কেন মৃত পাঠাব? তবে কি তোমার মতে আমরাই দোষী? ইতি। তোমার

সোমনাথ
গত সোমনাথ,

আরে না, না! দোষী কেউ নয়। ওটা একটা misunderstanding-। অমন করত হয়। আমরা চললুম বোঝাপড়া করতে। ইতি। তোমার নরেশ

পুনর্পতঃ। ঘুঘুর বিবর্ত বোঝাপড়া হলো না। ওদের ধারণ। ওদের ছোটলোকের বলে অপমান করা হয়েছে। ওরা কমাপ্রাপ্তন। প্রত্যাশা করে। চিঠিগুলি ফেরৎ পাঠালিছি। নরেশ

গত ভাকার সেন,

এই চিঠিগুলি দত্ত করে পড়ে দেখবেন। আপনি যদি আমাদের সহায় না হন তবে আমরা এখানকার সমাজে হুতায় পাব না। অগত্যা আপনার ক্রায় থেকে ইতুলা দিতে হবে। কেননা আছেন? নমস্কার। ইতি। আপনার

সোমনাথ বটব্যাল

গত মিঃ বটব্যাল,

চিঠিগুলি পড়ে দেখলুম। আমি তো এবে মানসিক অসুখের treatment আনিনে। কলকাতা গেলে ভাকার গিরীন বোসের সঙ্গে কন্যাসাঁ করি আসব। আপনি এই কর্মের সবুজ করব। নমস্কার। আপা করি শারীরিক শুধ্র। ইতি। আপনার

পুনরায় সেন

গত ভাকার সেন,

আমার পদপ্রচেষ্টায় গ্রেপ্ত করলুম। অন্তঃজগত করে ক্রায়ের ওআইকিং কমিটির পেশ করবেন। কাল নির্দিষ্টের ওখানে পার্টি। সেখানে ক্রায়ের অন্য সংগত সাবধান থাকবেন, ধাকব না তাক আমি, এ দৃষ্টি অসুখ। নমস্কার।

ইতি। আপনার

সোমনাথ বটব্যাল
নিম্নপ্র

নির্বাচন

কী দৃষ্টান্ত! পাটি’ তেঁতু। কাবে নয়। একজন সন্তানের বাড়িতে। আচ্ছা,
আমি আমার সঙ্গে আশেপাশে, আপনার গৃহিণী আমার গৃহিণীর সঙ্গে।
আপনাদের জন্য এক ছোড়া নিম্নপ্রণালী ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছি। বিকেলে
ঈশ্বর ধাকবেন। আমারা তুলে নিয়ে যাব। ইতি। আপনার

প্রথম পান

নির্বাচন, নির্বাচন

কাল যখন পাটির মাঝখানে ভাস্কার লাগাতে আমার কাছে call এল তখন তিনি উঠে
ছেলে দাড়াতে যাবার চেষ্টা করেন। তখন তুমি কেন উঠে গেলে? অন্যরা তোমার ডাকর
উঠলেন কেন? ওটা কোন দেশী ভর্তা? ইতি। তোমার

নির্বাচন

নির্বাচন

কাল আমি তোমার বছর কিশোর বয়সে বাইনি, গেছলুম ভাস্কারের সঙ্গে যান বছর
কিশোরে। তিনি যখন উঠলেন আমারেও উঠতে হলো। অন্যরা আমার

নির্বাচন

নির্বাচন

তোমার ফিক্স কোড। ভাস্কারের গৃহিণী যে ভাবে ফিরলেন তোমরাও
নিম্নপ্রণালী হয়ে যাবে। অবর্ত আমার গাড়িতে। তোমাদের বাবাদের বেশী
হেসেছে। খেলে বসে খাবার খেলে ভাস্কারের সঙ্গে চোখ ওঠে। বেছে

নির্বাচন

নির্বাচন

তোমার ও মুক্তি খোঁড়া। ভাস্কারের গৃহিণী যে ভাবে ফিরলেন তোমরাও
নিম্নপ্রণালী হয়ে যাবে। অবর্ত আমার গাড়িতে। তোমাদের বাবাদের বেশী
হেসেছে। খেলে বসে খাবার খেলে ভাস্কারের সঙ্গে চোখ ওঠে। বেছে

নির্বাচন

নির্বাচন

তোমার ও মুক্তি খোঁড়া। ভাস্কারের গৃহিণী যে ভাবে ফিরলেন তোমরাও
নিম্নপ্রণালী হয়ে যাবে। অবর্ত আমার গাড়িতে। তোমাদের বাবাদের বেশী
হেসেছে। খেলে বসে খাবার খেলে ভাস্কারের সঙ্গে চোখ ওঠে। বেছে
প্রিয় নির্বল,

তুমি তো আমার বেশ ধারাক্কর্তা বন্ধু। যাকমিলেন কামনা করছ। যদি কোনো অসম্ভব ঘটে তবে তোমায়ই কুচিন্তায়। ইতি। তোমার সোমনাথ

প্রিয় ধাক্কার সেন,

মদলবারক

এই চিঠিগুলি পড়ে লেখতেন। আপনি যদি এর বিষয় না করেন তবে আমি কোনো উকিলের পরামর্শ নেব। অপমানের উপর অপমান। ইতি। আপনার

নির্ধারিতঃ কাঞ্জিলাল

প্রিয় মি। কাঞ্জিলাল,

আপনি কিছুদিন সবর করলে আমি কলকাতা গিয়ে ধাক্কার গৃহীনঃ ঘোষের সঙ্গে কন্যাক করে আসতে পারি। “মণ্ডলীক” “পরব্রহ্ম,” “দশটি নবি, পাচটি নয়, একটিমাত্র শ্রী”—এসব যদি আমাদের যায় তবে বহরের কাগজের খোরাক জুটবে। ইতি। আপনার

পুনর্বর্তি সেন

প্রিয় তাঁ। সেন,

এ সব আপনি কোনায় গেলেন? তবে কি সোমনাথ আপনাকে আমাকে চিঠিগুলি দেখিয়েছেন? তা যদি করে থাকে তবে দেখিয়ে সমস্ত প্রকাশ করতে হবে। বিদ্রে আগে যে সব কেলকান্তি করেছে সে সব যদি শোনেন- তবে লোকার্ককে খাবে চুকতে দিয়েছেন বলে অনুভাব করবেন। ইতি। আপনার

নির্ধারিতঃ কাঞ্জিলাল

প্রিয় মি। কাঞ্জিলাল,

আহুন আমার বাড়িতে চা খেতে আপনার। আমি মিটিকে ফেলি এই অন্তর্ভিক ব্যাপার। ইতি। আপনার

পুনর্বর্তি সেন
নিম্নলিখিত

প্রিয় ডাঃ সেন,
সোমনাথের অনেক আমাকে ছুটে আলাদা পার্টি করতে হয়। ওকে মহিলাদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া নিরাপদ নয়। আমার জী তো শুরু করে ক্লাবে পর্যন্ত যান না। ইতি। আপনার

নির্লিপ্ত কাজিলাল

প্রিয় মিঃ কাজিলাল,
তা হলে আমার কিছু করবার নেই, আপনি উকীলের পরামর্শ নিন। কিন্তু তার আগে হাঁটার ভেবে দেখবেন। ইতি। আপনার

পুরন্দর সেন

প্রিয় ডাঃ সেন,
আমার ইতিকাপত্র শেষ করছি। ক্লাবের সকাল থাকা আমার পকে দৃষ্টান্ত। ইতি। আপনার

নির্লিপ্ত কাজিলাল

প্রিয় মিঃ কাজিলাল,
আপনারা সবাই সমান চেলেমাইহন্স। ক্লাবের কী অপরাধ। আপনার ইতিকাপত্র নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হবে তখন আমি সমস্ত খুলে বলতে বাধ্য হব। তার চেয়ে আমন আজ বিকেলে আমার সঙ্গে চা খেতে। মিঃ কাজিলালকেও আসতে লিখিয়ি। মহিলাদের না আনলেও চলবে। ইতি।

আপনার

পুরন্দর সেন

৫

প্রিয় নির্বল,

বুধবার:
কাল ডাক্টারের ওখানে অনেকক্ষন রয়েছিলুম। তুমি এলে না। শল্য অসাধু চরিত সময়ে এখনে। তোমার মনে অবিশ্বাস আছে। কী করলে। অবিশ্বাস চুর হবে বলতে পার। ইতি। তোমার

সোমনাথ
প্রিয় সোমনাথকে,

ঠিকই জন্মে। অবিশাস দূর হবে কি করবে, বলবে? যদি তুমি বিভূতিসাগরী ধরনে মাঝার চুল ছেটি চালি চাপলিনের মতো তিন ভাগ পৌষ কাথাতে পার, যদি তুমি মাটির সীমায় মেঁো ধূতি কিংবা লুরী পরে টাই কালো আঁটতে পার, তা হলেই বিশাল করে তোমাকে ঘরে ভাবব। ইতি। তোমার নির্বল

প্রিয় নির্বল,

এই চিঠির সঙ্গে আলাদা। একটি মোড়কে কাশানো পৌষ ও ছাটা চুল পাঠালুম। বিশাল না হবে সবারের হাঁচির হতে রাজি। ইতি। তোমার

প্রিয় সোমনাথকে,

ঘোরা! এসো, এসো, আজকেই বিকেল। ইতি। তোমার

নির্বল

৬

প্রিয় সোমনাথদের,

বৃহস্পতিবার

কাল তোমাদের দেখে এত ধরাপ লাগল। কেন তুমি অমন করে সঙ্গ সাজতে গেলে? এ চিঠি ছিড়ে ফেলো। ইতি। তোমার নয় আরণ

আরণ, আরণ, হুদ্ধরী আরণ,

কেন, তা কি তুমি বুঝতে পারনি? পাঁচ বছর তোমাদের চেয়ে দেখিনি, এক বছর এক সময় খেলেছে না। দেখে সত্যি হয়েছি। তোমার আরণই আছে। কেন। এ চিঠি রেখে না। ইতি। অভাব্যন্যায়ী

সোমনাথদের

সোমনাথদের,

তুমি এখন বিবাহিত। হৈম্য'র প্রেত তোমার কল্পনা রয়েছে। তার মনে না জানি কত কিছু হচ্ছে তোমার ঐ বিদ্যমানের চেহারা। দেখে। তুমি আর এসো না। চিঠি ছিড়ে ফেলো। ইতি। হিতৈষী

আরণ
নিসন্ধান

বুঝ,

হৈম সমস্ত জানে। আমার চেহারা দেখে তোমার খুব খারাপ লাগবে।
এই আশঙ্কা সে আমাকে বাদ দিয়ে ছিল। বললেও, আবার বলি আমি
তোমাকে দেখতে বাই তা হলে আমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল চেলে দেবে।
স্নেহে আর যাব না। ইতি। তোমার কল্যাণার্থী

সোমনাথ দাদা

৭

প্রিয় সোমনাথ,

শনিবার

কাল আমার এখানে আনার পার্ট। এবার Mixed, এবার আমি
আপনি গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসব আমার মোটরে। বিকেলে তৈরি
থেকো। ইতি। তোমার

নির্ণয়
মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না

কফি খাওয়া আমার জীবনে সেই প্রথম। একটা হালকা কাঠের ছবি-ঝাঁকা টিপের উপর এক পেয়ালা কফি আর এক প্লেট বিলিতে মিটি। কফিটা পেয়ালা থেকে পরিচিত টেবিলে বেশ একটা আওয়াজ করেই দেখেছিলুম। তখন 
তো আমার ইনি ছিলেন না যে আদর্শসহ তুল ধরতেন।

মা শুনে বললেন, “গেল আত! গেল ধর্ম!” তার ভিতরাভিক 
মাতামাতিরিক। “কিরণ্তান বাড়িতে কফি খেয়ে এসেছিল। এর পরে শুনব 
আগেই।” তিনি কানেই তুললেন না যে কফিটা চায়েরই মতো নেশাহীন 
পানীয়। “চায়ের মতো হলে হিন্দুরা খেত। কই, কেউ খায়, কখনো 
কেনেছিল?”

আমার দশ এগারো বছর বয়সে বাস্তবিক কখনো শুনিনি। তা বলে 
নোটনদিরা সত্যি কিছুই ছিলেন না। ওরা আমাদেরই মতো হিন্দু। চোখের 
মধ্যে ওরা কফি খানি, আর ওদের বাড়িতে ছোট জাতের লোক রাখে, 
আর ওদের মেয়ের অর্থাৎ নোটনদির বয়স যদিও উনিশ কুড়ি তবু বিয়ের 
নামগ্রহণ নেই। তখনকার দিনে ওটা কমলনাটীত।

বাবা বলতেন, “বিয়ের সব ঠিকই ছিল, কিন্তু বর কে পালিয়ে ধরে নিয়ে 
গেল কোটা বন্দরী মামলায়। নোটনও আর কাউকে বিয়ে করবে না।”

মা বলতেন, “হিন্দুর ঘুরে এমন হয় বলে শুনিনি। ওরা কিরণ্তান।”

তিনি তুলেও ওদের বাড়িতে যেতেন না, আমাদেরও যেতে দিতেন না। কে 
আমন্ত্রণ করে কোনো মেয়ে এখান হয়, কোনো মানস ভেবে কোনো 
মানস। এই যে আমি তোমাদের মনে কফি খেয়ে এলম কে বলে ওটা কফি 
না। তারা না মানসের স্পি।

অন্য বাড়িটা খুব কাছেই। একটা মাঠ পেরিয়ে একটা খুব খুবে যেতে হয়। 
বাঙ্লা বাড়ি, চার দিকে না। জাতের গাছ বিলিতে লতাপাতা ও বোঝ। 
খুব কাছে হলেও আমার মতো। বালকের চোখে কেমন দেখে অস্ত্র, আক্ষর, 
রহস্যময়। ও বাড়িতে কাবো। আসা যাওয়া না থাকায় ওখানে যে কি হতো 
তা নিয়ে খুব অজ্ঞান। কখনো চলত।
নোটনিকে কোনোদিন বাড়ি থেকে বেরোতে সেখান না। কারণ বাড়ি যাওয়া দূরে থাকে নিজেদের বাগানে কি বারানস তার পা পড়ত না। বাইরের বাগানের ও বারানসের কথা বলছি, ভিতরের নয়। এর দূর মনে পড়ে নেই কপি খাওয়ার দিন তাই প্রথম দেখি।

আমার কাছে এসে বললেন, “আরো?”

আমি বাড়ি না যাইলে। যখন হুটে ধর্মবাদ অনাড়ম্বর হয়, তা আমার না। তিনি বললে হয় উন্টো বললেন, গল্পটা আরো কন্ঠ করে। রকম লেখে দিতে পারেন। কোনোটা রমেজ মার্ভেলের মতো, কোনোটা বিচ্ছেদ আমলকীর মতো। মুখমন্ডল এক রকম ছিল, তার কিছু আমি লিখিতে পারেছি না। করলেন, সব যথাযথ করে তো সময়ের শিক্ষা করে না যে আমার বলে ওঠে জুটেছিল।

“কেমন দেখিলেন নোটনকে?” মন ধরলেন।

“ভালোরে” ও ছাড় ও বয়সে আর কোনো বিশেষ প্রয়োগ করতে চিন্তিত হয়েছিলেন বেলায়।

বাবার সঙ্গেই সেদিন ওদের বাড়ি যাওয়া। বাবা আমাকে বললেন, “আমার এই ছেলেটির নাম থোক। বাইরের পোকা। আপনার এখানে তো মন লাইরেি। ও যদি মাঝে মাঝে আসে বই পড়তে থাকে।”

জ্যোতিবাদির মুখ হেসে বললেন, “পোকা শনে ভয় করে। যদি কাটে।” তিনি আমাকে কাছে তেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি দৃষ্টর পড়েছি।

আমি লছাড় নিক্ষেপ। বাবা বললেন, “বস্ত্র যাকী নেই। গিরিশ শেষ করেছে। রবি ঠাকুরের বই চায়। সেই মনে নেবেল লিখে প্রাইজ পেয়েছেন।”

“নোবেল প্রাইজ”, আমি সংশোধন করলুম।

তা তবে জ্যোতিবাদির চমকত হলেন। “তাও আমার? আচ্ছা, তুমি রৌঁজে এসে রবিবাবুর বই পড়তে পারে। কেটে না কিন্তু।” তিনি পালালেন।

সেদিন বাবার পত্নী ইংরেজী বাংলা পত্রিকায় ধারে বিজা ও কপি খাইবে তুমি অরবির ভর ভেঙে দিলেন। লোকটা তাকে ভয় দেখলে না সেটা। আমি আর একটু বড় হয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিলম। তখন কিছু বই ছেলের মতো আমি তাকে বাহ্য মতো। তবাকুম।
কথা করে তাঁর জীবনের সঙ্গে আলাপ হলো। আমার মা কেন তাঁকে বাড়ি থান না তাঁর এ প্রেমের উত্তর দিতে পারলুম না। তাকেও বলতে পারলুম না, আমাদের বাড়ি আসবেন। জানুন, মা বেশ খুশি কি মানেন তাঁতে তাঁকে হয়তো অনন্তর হতে হবে।

বইয়ের ভিতরে হারিয়ে গেলুম। একটা ঘর বেন বই দিয়ে ঠান। আমার সাড়াস্থ কেউ পায় না, বাড়ি বিরেচি না চুপ করে পড়িয়ে বোঝ করতে এসে নোটনিফি জমান, “লোকে, এখনো পড়ছি? কি বই ওটা। ’সোনার তারী।’” বুঝতে পারে।”

আমি লজ্জায় নীরব থাকি। তিনি বলেন, “আমি তো পারিনে।”

তিনি আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান। সেখানে ফলমূল খাই। দেখি, তিনি বে কেবল বইটাই পড়েন তা নয়, ব্যায়ামও করেন। এক ক্ষুদ্রা হুই অভ্যেস ছিল তাঁর টোবলে, একটা চারটি বুলছিল সেখানে। তিনি কাছে বিচ্ছে কাপড় পরতেন, মরাঠ ধরেন। বীরাঙ্গী বলে মনে হতো। কেমন একটা গুড়তা ছিল তাঁর চুলে ও চোখে। তাঁর ঘরের এক কোণে পুকুরের সরজাম। পুকুরের পাটটি কোনো দেবদেবী না, একটা যুক্ত। যুক্তটি সেখে ভেজীয়ান। হয়তো একটা নিঃশুর।

নোটনিফি এক বেলা আহার করতেন, মাছের মাংস খেতেন না, বৃক্ষচারিণীর মতো ধাকতেন। তবু লোকে বলত কিরিতান। তাঁর মারা জ্যোতিঃবাহু ছিলেন পরম শান্ত। তাঁর খাওয়া সময় আমাকে সেখানে ঘরে নিয়ে একটা মূর্তী চাঝরে মিরতেন, বলতেন, “তোরা তো বৈসেক। এটিও রামচন্দ্রের বাহন।”

মার তেন বলতেন, “আমার এ ছেলেটা মেলেছে হবে।” মাত্রাবাই বাণ্ড হবার নয়। অক্ষর অক্ষরে ফেলেছে।


তাঁর ঘরে কেমন করে কী হলো ভালো মনে পড়ে না। জীবনের সকল পর্যায়ের মৃত্যু সমান তাঁকে নয়। নোটনিফি চলে থান আঘাত, জ্যোতিঃবাহু তাঁর করেক মাস পরে। ইত্যাদি ছিলেন না অবসর নিজেন, ঠিক জানিনে। লাইব্রেরীর পড়া শেষ করে আমি তাঁদের বাড়ি যাওয়া প্রায় বহি করে এনেছিলুম। তাঁদের প্রধান আমাকে চেনন প্রশ্ন করেনি।

ম্যাট্রিক বেশার অংশে অসহযোগ করেছিলুম, বিশেষ পরীক্ষাটি পাঠদানের
মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না ।

অস্বরূধে দিয়েই কেল্লুম। দিয়েই চল্লুম ভাগ্যমুখীক করতে কলকাতা।
বাবা একবার চিঠি লিখে দিলেন জ্যোতিবাবুর নামে। জ্যোতিবাবুর চাকরি
নেই। পদমর্যাদার মতো মুখোমখো করে পড়েছে। কেল্লুম তিনি চমৎকার
লোক। সেমন হালিকুশি, তেমনি শ্রেষ্ঠবৃন্দ। আমাকে আলাপ করিয়ে
দিলেন সম্পাদক মহলে। গুরু হলে। শিক্ষানীশ।

খবর নিয়ে জানতে গেলুম নোটনদির বিয়ে হয়েছে সেই যুবকটির সঙ্গে।
ভারত সম্রাটের মার্জনা পেয়ে অস্তিক সহায়বাদীর সঙ্গে তিনিও আন্দামান
থেকে ফিরেছেন। তারপর ফিরিয়ে দিয়ে কে সম্ভবতি অসংখ্যোগ আন্দামানে
পিষ্ট হয়েছেন। এলায় মফিস্বলে সফর করে বেড়ান। কলকাতায় থাকেন
কম সময়। নোটনদি কিন্তু শাঙ্গা হুড় ইত্যাদির সঙ্গে কলকাতায়।

ঠিকানা চোপাড় করে গেলুম একদিন বিদিকে যেয়েতে। গড়পার না
বেলোপাটু। টিক স্বর্ণ নেই। বাঁশটা পুরোটা ও ভাঁশ, বাঁশের মেহরের
পরের কাপড় মলদ। ও মোটা। নোটনদি চরকা ঘরের ঘরে করিয়েছিলেন,
আমাকে খেলে নিয়ে কাছে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের পরিবারের
হালচাল, কেন কলকাতা এলেছি, কোথায় উঠেছি, এমনি কত কথা। না
খাইয়ে ছাড়বেন না, কি করি। মেলের খাওয়া খেতে আমারও হাড়ার মতো
ভাব। খেতে বললে আচারার প্রশ্ন তুলি। আর বসত তখন আমি হাড়াই
ছিলুম। কারণ তার কিছু দিন পূর্বে আমার মায়ের নিবিয়ে হয়।

খুব দুর্খ করলেন আমার মা নেই তুলে। বললেন, “আমার সাধ্য থাকলে
তোমার আমি মেলে থাকতে দিতুম না, থোকন। কিন্তু—”

আমি বুঝতে পেরেছিলুম কিস্তির পরে কী। কথা কেড়ে নিয়ে বললুম,
“না, না, আমার অনুরূপ কিসের? মেসে কি কেউ থাকে না।”

নোটনদির সাংসারিক অবস্থা গল্ল না হলেও তার মানসিক অবস্থা পেল
খানড় মনে হলো। প্রফেসরের আনন্দে সেই তাপসী অর্পণ যেন ভীমারী
শিবের অপরূপ। মনের আনন্দ শরীর সক্রিয় হয়েছে। ভরসা গড়ন।
স্মরণ আকৃষ্ট। আমি প্রণাম করে বিদায় নিলুম।

কথা ছিল কলকাতায় যতদিন থাকি মধ্যে মধ্যে দেখা করব ও খেতে পাব।
কিন্তু মেলের খাওয়া ততু সহজ হয়, চোদা পয়সার হোটেলের খাওয়া একবারে
অবচিত। তার পরে ডাল রুটির দোকানে, চিঠে মুড়ির দোকানে, মুখ বলল
করতে করতে ক্রমে ক্রমে হয়ে। সজল উপবাস। খুবে খুবে শেষে
একটি কুচকি নয়ে শয্যাশারী—যেনে নয়, অন্ধকার স্যাত্রেতে একটি কুঠিতে। কাজেই কলকাতা ছাড়তে বাধ্য।

কার্যাবস্থার মিনিট প্রধানে অনরক্ষে জলাশয় বিশেষ তার কাছে থেকে কলকাতা বাধ্য। মকবলের কলকাতা। ভাগ্যপরিবর্ত্তক সুধামালাই ইতি।

নোটনদির কথা অচিন তে জল গেল। মনে বাধ্যতে মতো তেমন কোনো কারণও ছিল না। তার পরে যখন দ্বিতীয় প্রথমে পত্রী তখন আমারা জন কয়েক সতীর্থ মিলে আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক মহাশয়ের নেতৃত্বে দলীয় আগ্রা বেনাস বেঙ্গালুর যাই। সারাদিনে সাকাত হলো জ্যোতির্বারুর সঙ্গে।

তিনি কিছুদিন থেকে কাশীবাস করেছিলেন তার সঙ্গে নোটনদিও। বললেন, "নোটন যদি শোনে তুমি কাশী এসেছিলে, ওর সঙ্গে দেখ। না করে চলে গেলে, তা হলে খুব দুঃখিত হবে।"

অগ্রে অধ্যাপক মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে জ্যোতির্বারুর তাঙ্গাতেই তার কাশীর বাড়িতে গেলো। দিন আমাকে প্রতাষা করেননি, প্রথমে চিনতে ইতনুষ্ঠ করলেন। পরিচয়ে পেয়ে বললেন, "ওঃ! তুমি! খোকন!"

দেখে তার কোলে একটি নতুন মাঝারী এসেছে। মাঝারীর নাম চামেলী। মা হয়ে নোটনদির চেহারা বদলে গেছে। ঝুঁকির মিছুমুখুর যেন তখন দারে করে পড়ছে—চালির, কথায়, চলেন। খাঁজ দ্বিতীয় নয়, সারাদিন গুথুরে যা পরে তাই পরেছেন।

খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলুম, "কবে কলকাতা ফিরছেন?"

"ফিরব না বলেই এসেছি।" তিনি উদাস হয়ে বললেন।

"কেন জানতে পারি!"

"গোপন করবার কিছু নেই।" তার পরে ভেঙে বললেন, "ওর সঙ্কে এক পথে চলা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। অহিংসার ভেকে পরে পুলিশের চেয়ে ধুলো দিয়ে হিংসাবাদীর ধরণ গঠন করা আমি পছন্দ করিনে। আমি হিংসাবাদী, কিন্তু মারাত্মক মন মৃদু এক।"

ঔৎসব লঙ্কা তে তিনি বললেন, "ওর কৈফিয়ত হচ্ছে এই যে ইংরেজের সঙ্গে যখন আমাদের যুদ্ধ তখন যুদ্ধে সব কিছু হয়তো তাতে। শিবাজী যেমন আহঙ্কার থাকে বিখ্যাত অর্জন করে তাকে অত্যন্ত হত্যা করলেন তেমনি অহিংসার ধারা ইংরেজের বিখ্যাত উৎপাদন করে তাদের ধাঁস করতে হবে।"
আমি নিউ উইলিয়ম। তিনি বলতে লাগলেন, “এই মতবাদ আমার
বিবেকবিপ্লুব। যতদিন পেরেছি সহ করেছি, কিন্তু ঝাড়কের চেয়ে অশ্রুতি করি
বিখাসাদাস্তকে। কী করে সে অশ্রুতি চেপ রাখি? এই নিয়ে নেব কালে
রাগারাগি হয়ে গেল। না হলেই তালো হেতো।"

তিনি হঠাৎ উঠে গেলেন। মনে হলো। ওহে গিয়ে কাড়লেন।

জ্যোতিবারু সেই টাঙ্গাইলারা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। হোটেলে
সাথীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাশী থেকে বাহ্য করলুম পাটলীপুত্র। নোটনদির
প্রতি আমার ছায়া হয়ে গেল।

আরে তিন বছর পরে এলাহাবাদে গেছি নিক্লি ভারতীয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে
লক্ষ্যভেদ করতে। পথে বেনাৰসে নামতে হলো একজন বন্ধু আপনারো। মনে
পড়ে গেল নোটনদির, জ্যোতিবারুকে। ভবলুম, এখনো কি তারা প্রেক্ষালে
আছেন? কে আপনি! একবার দেখাই যাক না।

দেখা হলো। নোটনদির সঙ্গে। কিন্তু এ কোন নোটনদি! এ তাঁর রহস্যী
রূপ। ভিতরে আধ্যাত্মী অজ্ঞে, তাই জলছে শাদির পাড়, সিংহর সিংহর,
হাতের কুল। আমাকে বসতে না বলে চলে যেতে বললেন।

“খোকন, বড় অসময়ে এসেছ। এখন এ বাড়ি কানাতংশী হবে। মাফে
আর চামেলীকে নিয়ে বাবা কলকাতা রণনী হয়ে গেছেন। পুলিশ যদি মনা
করে আমিও রণনী। হব গেল হাজতে।”

আমি তো তাছাড়া বললুম। কুঁপোতে কুঁপেতে একটি চেয়ার ধরে বসে
পড়লুম। তখন তিনি জমল। বললেন, “সব ধাকেল শোনাতুম সব
কথা। আবার কবে দেখা হবে আমিকে। হয়তো এ জীবনে এই শেষ।”

আমার চেখ ছল ছল করছিল। তিনি কোমল স্বরে বললেন, “এতে মন
খারাপ করবার কি আছে! যারা এ পথে পা দেয় তাদের পায়ে কোটা ফুটিয়ে
তো। আমি তো এর জন্যে প্রস্তু হয়েই জীবন আরম্ভ করছি।”

“কিন্তু আপনি না এ পথ ছেড়ে দিয়েছিলেন, নোটনদি?"

“কে বললে। না, আমি আমার পথে তুষ্টই আছি। ছেড়ে দিয়েছি
আমার আমার পথ। তুমি তুমি রুম্বেছিলেন।”

তিনি আমাকে এক রকম জোর করে তাড়ালেন। বাড়িটাতে আরো
কোলকাতা জনের পায়ের শব্দ পাচ্ছিলুম। তারা ছিল নেপথে।

তাড়াতাড়ি একখানা খামের উপর ঠিকানা লিখে তাতে এক টিক্কিকা কাগজ
ভরি তিনি আমার হাতে গংজ দিয়ে বললেন, “গামনে যে ডাক বাঁশ দেখে বাতে কেলে দিয়ে, কাছে রেখো না।” এই বলে আমাকে এক ঢেলা দিলেন।

এর পরে আমি বিলেপ যাই। নোটনদির যে কী হলো সে খবর জানতে পাইনে। জ্যেতিবাবুর কলকাতার বাড়ির নথির নমুন হুলো গেছলুম।

বিলেপ থেকে ফিরে পূরা দল্লর সংসারী হলুম, সময় সংসারটা সংকীর্ণ হয়ে আপিস ও বাংলা। এই স্বী বিদ্যুতে ঢেকুল। বিনা যার আপিসের কাজে, রাত কাটে বাংলায়, ছুট কিছু মেলে। এখন কি পুজোর ছুটিতেও আমি আটক, বড় দিনেও আমি তাহা।

নোটনদির নাম একবার খেন কাগজে পড়েছিলুম। শক্ত অর্থে ভুগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন কোন এক গ্রাম—সেখানেও অন্তরাণ। দিয়ে একগুলো সহায়তার ভাল পর লিখি এখন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তখন যে দিনকাল, টেলিফনের প্রতি সহায়তারকে কেউ হয়তো। ভুল বুঝতে টেলিফনের প্রতি সহায়তার বলে। মনের ইচ্ছা মনেই বিলীন হলো।

কলে বছর পরে কলকাতা গেছি এক দিনের ছুটিতে। এক বদ্ধুর বাড়ির তুল একটা উল্লেখ্যে নিমিত্ত। নিমিত্ত ছুড়বে। দেখি নোটনদি ও তাঁর স্থান। দিয়ে এই আমার সাহেবী পোশাক সবুজের আমাকে চিনতে পারলেন একে আমি আশুর হয়েছিলুম। বলতে গেলে এটা আমার সাহেবীঘাটা পর্কে পৌঁছবে বিয়ে নয়। সাহেবের মতো। সাহেব হলে কি কেউ আমাকে বাঙালী বলে চিনতে পারতে?

নোটনদি যখন জন্ম হলেন যে আমি পরের দিন কলকাতা ছাড়া তখন আমাকে সম্ভ্যায় তাঁর ওখানে একবার হাজিরা দিতে বললেন। আমার অনেক এগেছেকে ছিল, যাহ করলেন না।

অগত্যা যেতে হলো। তাঁদের সেই স্থানবাসীর বাড়িতে। সেটা জ্যেতিবাবুর বাড়ি। তিনি ইতিমধ্যে মারা গেছেন, তাঁর স্ত্রী বেঁচে। নোটনদি মার কাছেই থাকতেন। তাঁর স্থানী করণ্ডোরেশনে চাকরি করে সত্ত্ব বছরে তিনখানা বাড়ি করেছেন, কিন্তু স্থানীকে সহ হলেও স্থানীর উপাদানেকে গাঢ়র সহ হয় না। কাজসহ বিজনে আপনাদে আলাদা হয়েছেন। চামেলী থাকে মার কাছে এক মাস তো ঠাকুরার কাছে এক মাস। দিদিও মাঝে মাঝে ঘণ্ট বাড়ি দিয়ে, কিন্তু থাকতেন না। কানাপুরা শোনা যায়, দিদির নাকি সতীন ছুটেছে। অসাধারণ সতীন।
মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না ।

সম্মানে৷ বাঙালী দেরী দিদির ওখানে গিয়ে দেখি, আমি রাম রাম, সবাই সাহেব, হাফ সাহেব। আমি যেন হংসে৷ মধ্যে বঝি৷ ওটা অবশ কাটাল পারি নয়, কিন্তু দুটি চায় তা বিশ্বাস পানীয় জল নয়৷ অভ্যাসগত৷ চুরুট কি৷ বিষ সিগারেট টানতে টানতে এক এক বার গলা ভিজিয়ে নিছিলেন। খুব রাজ৷ উদব মানিয়েছিলেন। পরে গুনেছিলুম এই মহাপুঞ্জৰ নাকি লেফটিনেত।

ব্যাপার দেখে দিদি বললুম, "আমি কিন্তু বেশীক্ষণ বসব না৷ আমার আর একটা এনেগ্রেমেট আছে৷"

তিনি তখন তার দলবলকে বোঝালেন যে আমি তার নিরক্ষিত সোজোাঁ, প্রায় দশ বছর পরে আবি৷ হয়েছি, তাও এক রজনীর তরে৷ ভ্রমো৷ লোকে৷ বিদায় হলো৷ আমিও দিদির দৃঢ়পাত করতার অবকাশ পেলুম৷

তিনি কোনো কালে এতটা শোখী ছিলেন না৷ পায়ের চাঁপল থেকে চোখের চশ্মা পর্যন্ত সব ফ্যাশনেন৷ চেহারাতো আগের চেয়ে চেয়ে চলসাই৷ ফিকার আগের মতোই সিম৷

আমার এনেগ্রেমেটের কথা তুলতেই তিনি কাছে যেন একটা হাসিলুম, বললেন আমার বন্ধু বাড়ি থেকে আমার বিছানা। বাকাঁ আমিয়ে নিতে৷ তার পর চিঠির কাগজ আমিয়ে বললেন, "লিখে দাও, অতীব হুমুক্ত শাহত আনাইবে৷ যে আমার সেই এনেগ্রেমেট কৃষ্ণেল করতে বাধ্য হইলাম৷" ধর্ম দিয়ে বললেন৷ "তোমার জন্তো আমার কর্মদায়কের সঙ্গে হুটো কাজের কথা কওয়া হলো৷ না৷ আর তুমি কিন৷ যেতে চাও আড়া দিতে৷ আজ তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে৷ রাত বারোটা বাজবে৷ সেইজন্যে তোমার বিছানা অন্তত পাঠালুম৷ কো জানি যদি এ বাড়ির বিছানা৷ তোমার মতো সাহেব লোকের নামজুঁ হয়৷"

সত্যি জেমিন রাত বারোটা বাঙল৷ নৌটনী আমাকে সেই কাশীর অধ্যায় ব্যাখ্যা করে শোনালেন৷ আর বলে চললেন কার৷ কাহিনী অক্ষরুল্ল প্রসঙ্গ৷ শেষে তার বর্তমান মতবাদ, মনোভাব ও কাউকে যে বললেন৷ একটি রহস্য৷

"তুমি সাহিত্যিক বলেই তোমাকে বিখ্যাত করে বলল৷" তিনি কৈলিয়ে দিলেন৷
দিনি আমার লেখা পড়েননি। গণু সাহিত্যিক খ্যাতির খবর পেয়েছিলেন।
তাতে আমার সাহিত্যিক অভিমানে আঘাত লাগলেও সাহিত্যিক কৌতূহল
উজ্জ্বলিত হয়েছিল।

* * *

যে স্বামীকে তিনি দেবতার মতো পুজো করতেন তার কাছ থেকে কাশী
চলে গিয়ে তিনি যা চেয়েছিলেন তা শাস্তি। তার কোনো প্রোগ্রাম ছিল না।
সে সময়। কিছু দেখতে দেখতে তাকে ঘিরে একটি দল গড়ে উঠল। দলটি
আন্তঃপ্রাদেশিক।

সে দলে যারা ছিল তাদের মধ্যে মাথুর বলে একটি থুকিকে তিনি সকলের
চেয়ে পছন্দ করতেন। মাথুর যখন বাংলা বলত তখন তাকে বাঙালী বলে
অম হত, যখন মরাঠী বলত তখন মরাঠ। বলে। ভারতবর্ধনের সাত আটটা
ভারী তার সমান দক্ষতা। তার রাটিও ছিল যথেষ্ট ফরসা। সাহেবী পোশাক
পরলে এংলো ইংরিজে বলে লোকে সেলাম করত।

তা ছাড়া মাথুর ছিল যেমন সাহসী তেমনি অদ্ভুত পন্নমতি। তার দৌষের
মধ্যে সে বলিল নয়। কিছু বাহ্যের কাছে সে হার মানত না। বার বার
সে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেল।

এমন যে মাথুর, যার কাছে নোটনদিয়র কিছুই লুকোনা ছিল না, সেই
কিনা অর্থে বিশ্বাসে ব্যক্তীকরণ করে দলজুড় লোককে ধরিয়ে দিল। কৌঞ্চের
সে অমন কাজ করল—মারের চোটে না যদি নেহাত না। ধনের লোভে না।
রূপের কুহকে—তা এখনো অজ্ঞত। মাথুর অবশ্য নেই, ব্যক্তিকরণের
প্রতিশোধ কাশীর ওপর যে মোক্ষ নিয়েছে। মাথুরের শব গদাগড়ে তালিয়ে
গেছে।

কিছু ব্যক্তিকরণের দায়া। সে যা কত্তি করে গেছে তার কাছে এখনো চলছে।
নোটনদির সহকারী এখনো জেল থাকতে।

ব্যক্তিকরণের দায়া। সব চেয়ে কত্তি করলে নোটনদির। কেননা এর পক্ষে
তিনি মাথুর মাত্রকেই অবিশাল করতে শুরু করলেন। কোনো মাহরকেই
বিশাল করতে নেই, এই বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে খোলতে সীমিক
হয়ে উঠলেন। তার মনের বাধ্যের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের স্বাভাবিক হয়।
বেঁচে ধাকতে তার রুচি ছিল না। চামলের জন্যও না। তিনি মরতেই
চেয়েছিলেন, অতে অতে মরে যাব্লি ছিলেনও। এমন সময় তাকে জেল থেকে
চেড়ে দিয়ে অন্তরীণ করা হয়। তাতেও কি তিনি বাচতেন। কিন্তু কেননা
মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না ।

করে তোর প্রত্যেক জমাল বুর্জোয়ারাই বিখাস্বাধী, কিস্মান শ্রমিকরা নয়।
বুর্জোয়ার বিখাস করে তিনি তুল করেছেন, সে তুল অযাচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রতি
আরোপ করা আরো তুল।

কিস্মান শ্রমিকদের বিখাস করতে শিখে তুর মনের অন্য সারাল। শরীরের
ব্যাধিও কয়ে আরোগ্য হলো। কামিউনিজ্ম সমস্তে পুনস্কার পাঠ করে তুর
সম্মানবাদে এলো সম্পূর্ণ অনার্স। যেদিন চাই মজুর এক হয়ে বিশ্ব বাধাবে
সেদিন সব আপনা আপনি হয়ে। সেই সুদিনের জন্যে নিজেকে ও নিজের
দেশকে প্রশংসত করা ব্যাপীত তুর অন্য কোনা কর্মপাল। নেই। যাদের আছে
তাদের তিনি অন্ধকা করেন। নিজের স্বামীকেও।

“উনি একজন ক্যাপাচারওয়ালা। কংগ্রেস ক্যাপাচার করব, করপাশন
ক্যাপাচার করব, কাউনসিল ক্যাপাচার করব, এই তোর প্রোগ্রাম। কার জন্যে
ক্যাপাচার করব? একটি ক্ষুধাপি ক্ষুধা উপস্তরে জন্যে। কিস্তের জন্যে
ক্যাপাচার করব? মুখু লেই জন্যে। এই গোষ্ঠীগত স্বার্থপ্রতিকে আর্থবান
বলে চালিয়ে বাধুরা নিজেরই চালমান হয়েছেন। কম্যুনিয়াল এওয়ার্ডের আর
কোন মানে নেই, ভাই।”

“কিন্তু আপনার কম্যুনিস্টদেরকে দেখে তে। একটি ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ
হয় না, দিদি। ওরাও হয়তো একটা উপস্তর। কংগ্রেসে করপাশনের
কাউনসিলে কর্তৃত্ব করবার একটা নতুন হয়ে চুরিয়ে পেয়েছেন। বিপ্লবের
অভিপ্রায় নেই।”

“বা! আমি কি তুমির সত্যি সত্যি বিখাস করি নাকি? ওরা হাতে
হাতে বুর্জোয়া। ঐ মাথুরের মতোই একদিন ভেড়ে পড়বে মারের চোটে কি
মদের নিশ্চয় কি ধনের লোভে কি রূপের কুহকে। আমার আশা ভরসা
ওরা নয়, চাই মজুর।”

“তা হলে চাই মজুরদের সঙ্গে খুব মিলছেন, বলুন।”

তিনি মাথা নাড়লেন। “না, খুব না। মিষ্টতে তো চাই, কিন্তু মুখোন
pাই কোথায়? যত দিন অন্তঃকরণ ছিলুম বেশ মিলছিলো।”

এর পরে কখন এক সময় তুর রিকাইওয়ালার কথা উঠল। সম্প্রতিকে
যাত্রাযাতের স্বাস্থ্য জন্যে তিনি একটি রিকশা করিয়েছেন।

“আমার আশাভারসা ফাওয়ার মতো মজুর।” তিনি উচ্চসিন্ধন হয়ে
বললেন। একদিন একটা মৌটর সামনে পড়ে অকা পেয়েছিলুম আর
ফাওয়া তখন রিকশাটাকে একমন স্থেলে ঘুরিয়ে দিয়ে গেল যে তেমন হাত সাফাই তোমার বুকের মাঝিয়ানিয়ানদেরও কর্ম নয়। ভারতের ভাগ্য ওবাই ঘোরাবে, তুমি দেখো। ওবাই ঘোরাবে ঠিক অমনি অবলীলাকমে।
বনে হবে যেন একটা দিনীক্ষ।"  

ততক্ষণে আমার খাওয়া সারা হয়েছিল। আমি দিমির খাওয়া লক্ষ করছিলাম। একবার খাওয়ার অভ্যাস কবে ঘুচে গেছে, এখন তিনি রাগেও খান। যা খান তার সমস্ত নিরামিষ নয়, আমিই তার সম্পূর্ণ তৃপ্তি অনুভূমিত হলো। এ নিয়ে আমি একটা রনিকুট করতেই তিনি ফোঁস করে উঠলেন।
"তোমরা পুকুরের সব খেতে পাবো, ওমরা মেয়েরা পারিনে। কেন, এ খৈখ্যা কেন? আমি সামাজিক, জীবনের আর দাতা ব্যাপারের মতো আহরারেও।"

"কিন্তু আপনি তো এখনো সংক্রামক হতে পারেন নি, নোটনদি। আমার সঙ্গে টেরেলে খেলনা, মেয়ের উপর আসন পেতে গেতে বসেছেন।"

"এটা এ বাড়ির দরকার। মা রেডে থাকতে দশশ বদলা না। তা বলে তো তার মরণ কামনা করতে পারিনে।"

আহারারের পর ফাওয়ার গলা আবার চলল। "সেদিন দেখি," তিনি বললেন, "ওদেখে কে একটা রিকশা আসছে। তাতে চড়ে বসেছেন এক বাইপুলকায় কক্সলোক, সঙ্গে এক বিবর্ত মোট। এমন লকের জন্য রিকশা নয়, মোষ্টর গাড়ি রয়েছে। একটি মহিষাসুর বিশেষ।" দিদি হাসলেন।

"তার পর?"

"তার পর দেখলুম, বেচারা রিকশাওয়ালা। বেদনায় বিবর্ম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বার মতো ভদ্রী করছে। নিশ্চয় মাইল চার পাঁচ টেনেছে। আমি ফাওয়াকে বললুম, তোর জাত ভাই মরছে, তুই গাড়িয়ে গাড়িয়ে দেখছিলু। তোর শ্রীপুকুর কি আসে যায়? একটা মরলে আকাশেরকমে পড়ে মতো হাকাবে।" যেই একথা বল। আমিই সে লাফ দিয়ে বাবুর ঘাড়ে হাত দিয়ে তাকে নামাল। 
বাবু তোর রেগে টং। ছাতা উঁচিয়ে মারতে থান। তখন মহিষাসুর তার শিং বেরিয়ে ভেঙে আসে। তখন ফাওয়া তার ছাতা ফেটে নিয়ে তোরই পিঠে ভাঙল।"

আমি ফাওয়ার ম্যাজিস্ট্রেট কাবীনী খুনে বিশেষ পুলিস হইনি।
কাজ্জ বেআইনী। আর আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট।"
মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না ।

“আমি। সে একটা দৃঢ়! এমন তেজ আমি ভজনের মধ্যে দেখি।
সেইসময়ই তো বিষাদ করি যে ভজনের গুলো সঙ্গে পারবে না। শ্রী
কর্মের সিন্দর এক তরফে মার খেয়ে ভাগবে।” তিনি উজ্জাহিত হয়ে বললেন।

শ্রীক সংখ্যা বললে কী বোঝায় ও কী বোঝায় না, এ বিষয়ে তাকে যাচার
কথা বলতে হয়েছিল। ওটা যদি একটা দেশবাসী দাঁড় হতো তবে সব
দেশেই সফল হতে পারত, কারণ সব দেশেই ফাঁওয়ারা বলিঠ ও খুরিঠ।
অথ একমাত্র রাশিয়ায় সফল হয়েছে, তাও ফাঁওয়ারর গুণে নয়, বহ জটিল
বোঝা যায়।

নেটনিনি অনলেন না। তিনি তো বুঝতে চান না, তিনি চান না-বুঝেই
কী পূর্বা করতে একদিন তার বীর ছিলেন উৎপলাক্ষ, তার খ্যাতি। আর
একদিন তার বীর হলো মাথুর, তার সরক্ষ্মি। এখন তার বীর হয়েছে
ফাঁওয়া, তার রিকশা চালক।

পরের দিন ফাঁওয়া অমাকে সেতনে পালে দিল, নেটনিনি ট্যাক্সি
করতে দিলেন না। লোকটা বাঁচাবিল খুঁ। গাড়ি-ঘোড়ার পাশ কাটিয়ে
এমন জোর কলম দেখুলে যে অভ্যন্তরীন সীমার মরাগন রেস মনে পড়ে
নায়। একটা স্টাইচার মেটা পরিপাটি গড়ন, তেমন সৌষ্ঠব একটা ঐতিহ্য।

একটা টাকা বরিশিয় দিয়ে গেলেন। হাত জোড় করে বলল, “মাইজীক।
ঘুরে নেই।” ফিকেতেই নিল না।

* * *

তার পরে তার যৌগ রাখিনি বজ্রকাল। নিজের ধানায় বাস ছিল।
নবে অন্তর একবার একান্ত। বিয়ের নিমগ্ন পত্র এসেছিল, নিমগ্নকর্তা
উৎপলাক সেন। যার সঙ্গে চামুমারের বিয়ে তার নাম পড়ে মালুম হয়নি যে
নবে একটি বিচার বা মজুল। ভাবচিলুম নেটনিনিকে তামাশা করে লিখব,
বাঁচাওকে জামাই করলেন কেন? কিন্তু কে আমে হতো। এ বিয়ে দিলের
সময়ে। সেবার কিন্তু চিঠি লিখে উঠতে পারিনি। একান্ত শাড়ি কি বই,
নবে উপলাক দিয়েছিলুম মনে নেই, সেই তো চার বছর আগের ঘটন।

অঞ্জন মাত্র কেদেক আগে যখন কলকাতায় বোমার ভুজু উঠল, শুজব
নবে মাথুর মহোপদের মধ্যকার গিরিজাত ধনজন সরলেন ও সন্তানের
সরে পড়তে লাগলেন, তখন নেটনিনি ছাড়া আমাকে পরিয়ে গৌরব করলেন। লিখিয়েছিলেন, “ভাবিছি আমার দিনকতক তোমার ওখানে কাটিয়ে
স্ববিধায় একটা বাগা খুঁজে নেব তোমার শহরে। কোনো স্ববিধা হবে কি তোমার গৃহিণীর? তাকে আমার পরিচয় দিয়ে। জেহাদীর্দিন দিলে কি তিনি নেবেন?

উত্তরে আমাদের দুর্বলের প্রশংসা ও আমরণ জানালাম। বাড়ির সমাবেশে লোক লাগিয়ে ঘিলুম।

একদিন স্টেশনে গিয়ে দেখলুম নোটনাক্র এসেছেন বটে, কিন্তু বহুবচনের সার্থকতা নেই। জিজ্ঞাসা করলুম, “কই, আর কেউ আসেননি?”

“না, আর কে আসবে? মা বেধ হয় শোনোনা। চামেলের বিছানা হয়ে গেছে, তা বেধ হয় জানোনা, আর তুমি—ওঁর চাকরি না ছাড়লে কলকাতা ছাড়তে পারেন না।”

“তা হলো,” আমি জেরা করলুম, “কেন লিখেছিলেন, আমরা?”

“ওঃ!” তার খেয়াল হলো। “আমরা মানে আমি আর আমার চাকর বাকর। তা কী করি, বলো। সব কটাই পালিয়েছে। কাউন্টি শেষ পর্যন্ত ছিল। সেও যেই সাহেবের জন্য অমনি উধাও হয়েছে।”

তার কথায় কারণ্য। লক্ষ করলুম তিনি আবার কিছু কাহিল হয়েছেন। তেমন জলুম নেই। তবে ফিগার ঠিক আছে।

কানে কানে বললুম, “নোটনাক্র, তোমার বলি কি নির্ভরে বলি?”

“নির্ভরে বলো।”

“বীরকে বিখ্যাত করতে পারলে কি?”

তিনি উত্তর করলেন না, আমার একধারা হাত ধরে সমস্যার চাকল্য নিঃশেষে সমর্পিত করলেন।

তাকে সাহসী সেবার চেষ্টা করলুম। বললুম, “বাউলরাগান গায়, ‘মন মেলে তো মনের মাঝঝ মেলে নাই।’ যা মিলবার নয় তা তোমার ভাগ্যে মিলবে কি করে?”

তিনি ভর কঠ প্রতিশ্রুতি করলেন, “মিলবে কী করে।”

এ গল্পের এইখানে শেষ হল নামকরণের মর্যাদার রক্ষা হয়। কিছু সত্যের মর্যাদা তার চেয়েও বড়। তাই নিচেরটুকু লিখিয়ে।

নোটনাক্র দ্বারা আমার বাড়িতে করেছিলেন মিলিটারি অফিসার call করতে এলেন। সকলেই ভারতীয়। কেউ লাগে কোনোর, কেউ একার কোনোর, কেউ নেভিও। ঐ যান, নেভার উল্লেখ করতে হয় সর্বাপেক্ষা।
আমি তুল করেছি। তারা একটা স্পেশাল ট্রেনে ভারতময় রণবৈশিষ্ট্য ও রণসচ্ছ। প্রশংস করে বেড়াচ্ছেন।

নোটনির তাদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। যেন কত কারের চেন।
তিনি তার বহুত বড়ি পরিবেশন করলেন, আমাদের কাউকে কাছে দেখতে
দিলেন না। বিদায়ের যেহেতু তাদের গ্রেফ্যাকের কর্পালে চন্দ্রের ঠীক
দেওয়া তার নিজস্ব আইডিয়া। পরে যখন এই নিয়ে তাকে ক্ষেপালুম তিনি
বললেন ভাবাকুল কর্ত, "এরা আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি। এরাই
আমাদের রক্ষী। দেশ কারের? যারা রাখতে পারে তাদের। এরাই এক
দিন দেখতে জ্য করে নেবে, ক্ষান্ত করে দেবে। এত দিনে আমার প্রত্যায়
হলো যে ভারত সত্যিই স্বাধীন হবে, হবে এই উপায়ে।"

তার চোখে আনন্দাঙ্গ।

তখন তাকে বিরক্ত করলুম না। পরে এক সময় তার কানে কানে
বললুম, "নোটনির, মিলেছ তা হলে কি তোমার মনের মাহুষ?"
তিনি অকপটে উত্তর দিলেন, "মিলেছ।"
"কোন জন যদি কানতে চাই বেয়াদবি হবে?"
তিনি কিছু হেসে বললেন, "এরাই কোন।"
"তার মাতে, পুরুষেতেম লাল?"
তিনি সহৃদয়ে বললেন, "মেরে লাল!"
"তা যেন হলো। আমি জেরা করলুম, "কিন্তু মন কি মিলেছ?"
"তায় মিলেছ। শুনলে না কেমন ডাকিল, এ বহিন। এ বহিন।"
আমি রঙ করে বললুম, "আমিও তো। কতবার ডেকেছি, ও সিদ্ধি ও
সিদ্ধি! আমার উপর তো। তোমার কুপালুটি পড়নি।"
তিনি serious ভাবে নিলেন। বললেন, "তুই কি পুরুষেতেম?"

(১৯৪২)
ঝুঁকারকাটা

১

সেই সব সুন্দর ছেলেরা আজ কোথায়, যাদের নিয়ে আমার কৈশোর সুন্দর হয়েছিল! মাঝে মাঝে তার বাড়ি আর মন কেমন করে।

একজনকে মনে পড়ে। তার নাম সুরক্ষ। পোর্বর্ন হঠাম তখন, একটি অনুভূতি আছে তারনি বুঝি। চাদরের পিছনে যেমন রাগ তেমনি চাদরপান। চেলেদের পিছনে রাগর দল পুরত। তাদের কামনার ভাষা যেমন অলীক তেমনি সুল। তাদের থুলহাটাবলে সুরক্ষ গায়ে আঁচড় লাগত। তা দেখে যাদের বুকে বাজত তাদের জনাবেকে মিলে একটি দেহরক্ষা বাহিনী গড়েছিল। আমাদের কাজ ছিল তাকে বাড়ি থেকে ইস্কুল ও ইস্কুল থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। আমরা নিঃসন্তায় ছিলুম না। বে রক্ষক সেই ভক্ত। সুরক্ষ তা জানত, তাই আমাদের প্রশ্ন দিত না। তার সর্বনা আমার অভিযোগ ছিল। থাকবে না? রাগদের একজন আমার জন হাটে এমন মোচড় দিয়েছিল যে আর একটি হলে হাতাটা যেত। যার জন্যে কারি চুরি সেই বলে চোর।

কচিৎ তাকে এক পেতুম। পেতুমে আমার বুকতে মধু তার কানে টালতে বাগ হতুম, কিন্তু তার আগেই সে পাশ কাটিয়ে যেত। সে যে আমার প্রকুল পরিচয় জানল না, এ কথা ভেবে আমার চোখে জল আসত। সময়ে অসময়ে তাই তাদের‘ বাড়ির আশেপাশে ঘুরতুম। ভিতরে চুকতে ভরসা হতেন না। কারণ সুরক্ষ একদিন আমাকে বলেছিল, “তুই আমাদের বাড়ি অতবার আসিসনে, খোকন।”

তখন ঠিক বুঝতে পারিনি কেন এই রুঢ়তা। পরে বুঝেছি ওটা রুঢ়তা নয়। সুরক্ষ বাবা মঞ্চে গেলে তার মা’র সঙ্গে তার ঠাকুরমার বছর। বাধত। খোপা আর এলোচুলের সেই বচন জনে পাড়ার লোক জুতে তামাশা দেখতে। এতে সুরক্ষ মাথা কাটি যেত। তার বাবা যখন ফিরতেন, মা’র কথায় কান দিতেন না, ঠাকুরমার কাহিনী বিখ্যাত করতেন। মাকে দিতেন মার। তা দেখে সুরক্ষ ভাইবোন বাবার পা জড়িয়ে ধরত, কিন্তু সুরক্ষ এক লাঞ্চুক যে লুকিয়ে কাজত। প্রতিদিনে মা ঘোষণা করতেন তিনি বাপের বাড়ি
ছ'কানকাটা

ছাচ্ছেন, বাকুস বিছানা নিয়ে সত্যি সত্যি বাইরের বারামায় দীঘাটতেন। রাজ্যের লোক অঙ্গুতপ হতো তাকে দেখতে ও তার সঙ্গে আলাপ করতে। এতে হক্কুর বাবার মাথা কাটা যেত, হক্কুরা। চাকর এসে বলত, “মা, একখানাত ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া গেল না।” তা শুনে মুখ বলত, “আর একটা দিন থেকে যাও, মা। কথা রাখো।” সেদিনকার মতো মা সাইয়া মুল্যভূতি রাখতেন।

গ্রিি মানুষ এই ব্যাপার। হজ্জেই সমাজ মুখ্য, যেখান মা তেমনি ঠাকুরা।

একদিন হক্কুর মা এমন মার কেলেন যে গাড়ির অভাবে পেছন হলেন না। তারিয়ার লোকের চোখের উপর সেতারা টেনে দিয়ে গেল পড়লেন ও পায়ে হেটে রেল স্টেশনে গেলেন।

হক্কুর ভাইবোন লোকক্ষেত্র তার সাথী হলো না, কিন্তু সব চেয়ে লাঞ্জুক যে হক্কু সেই তার হাত ধরে পথ দেখানোর তার মন। কাজটা হক্কুর মা তালো করলেন না। হক্কুর বাবার মাথা হেট হলো। তিনি সেই হেট মাথায় টোপর পরে শোধ তুললেন। খবরটা যখন হক্কুর মার কানে পড়ল তিনি কুয়াজ খুল দিতে গেলেন। সবাই মিলে তাকে ধরে এনে ঘরে বসল করে রাখল। তখন থেকে তিনি নজরনদী।

মামারা হক্কুর ইসল্যান্ডে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ইসল্যান্ডে ঘুরার নাম করে সেই যে বেরোট ফিরিয়ে রাত করে। কেউ তাকে বকে সাহস করত না, পাছে সে আঘাত হয়। শিবপুরহাটের তিন দিকে নদী। দে দিকে ছিাচাপ যায় সে দিকে গেলে প্রায়ই নদীর ধারে পা আটকে যায়। হক্কু পা ছড়িয়ে বসে, পা চেলে দেয়। কত নৌকা। নৌকার মুখে ভাঙা মাটি, উজ্জাল বেয়ে আসছে।

হক্কুর চালের বস্তা, হক্কুর তন্তু হাতিকাছি, হক্কুর বুলো নারকেল। চাঁদের চার কোণ মাকাল ফল হুলছে, চাঁদের বিছানা তাবা ছুকো বলছে। নৌকার গায়ে কত রকম নক্কাল।

নক্কাল কত রকম রং। নৌকাও কত রকম। জেলের ভিড়ি, বাসঘরের নাও, গল্যান বোট, আরো কত কী। বাংলার প্রাণ নদী, নদীর প্রাণ নৌকা, নৌকার প্রাণ মাকি, মাকির প্রাণ গান। হক্কু এক মনে গান শোনে, আর গুলন্ত করে সুর সাধে। এই তার শান্তি, এই তার মাত্ত।

একদিন মেলা। লোক বাছিল। মেলা দেখতে। রহমানপুরের রামনবমীর মেলা। তা বল হক্কু রামায়ণ তৈফুর। নয়, নিমাই তৈফুর ও আস। নানা বিগ্রেঘ থেকে জমাতে হয় আউল বাউল দয়েরে।
এক দল কীর্তিনিয়া গান করতে যাচ্ছে দেখে সুবুক তাদের নৌকোয় উঠে বসল। মেলায় গিয়ে সে দলছাড়া হলো না, সে বাদু বা ছাড়তে চায় দলের লোক ছাড়ে না। তারা একটা গাছালা দেখে বিজ্ঞামনে গাড়ল। সেখানে গোল কেন্দ্রে বড় বড় হাড়ি চাপিয়ে দিল। কুটনা। কুটতে বসল দলের মেয়ে-ছেলেরা। বলতে ছুলে গেছি দলের কর্তা যিনি তিনি পুকুর নন, নারী। তার নাম হরিদাসী। হরিদাসী নাম শুনে সুবুক ধরে নিয়েছিল হিন্দু, আপনারাও সে কুল করতে পারেন। তাই বলে রাখছি তিনি মুসলমান হবেন। তার দলের পুকুরের নাম শুনে মাবুর হয় না মুসলমান না হিন্দু। ইসরাইল ও আঁধার মাবুর ও আঁধার। সুবুক ধরে নিয়েছিল ওরা সকলেই হিন্দু।

তাই আহার সম্বন্ধে চুবার ভাবেন। কেবল পানের সময় পানির কথাটা নতুন একটু খটকা বেঁধেছিল।

হরিদাসীরা মউজ করে রাখে বাড়ে বাড়ে আর গান করে। সুবুক তাদের শরির। তার গলা। যেন হরিদাসী তাকে কাছে দেখে নিয়ে বললেন, “তোমার হবে।” এতদিন জীবন বিস্মাদ লাগত, এতদিনে নুমা ফিরল। সুবুক চোখে পৃথিবীর রূপ গেল বলল। যেদিনে তাকে সেদিনে রূপের সাহায্য। কানে চেটু তোলে হরিদাসীর কঠিনতা—

“এমন ভাবের নদীতে সেই ভূঃ দিলাম না।
আমি নামি নামি মনে করি মরণ ভয়ে নামলাম না।”

মেলা ভাঙল। সুবুকও ভয় ভাঙল। মামারা যদি তাড়িয়েই দেন তবে তার আশ্রয়ের অভাব হবে না। তখনো সে জানত না যে ওরা মুসলমান। জানল শিবপুরহাটে অনেকের মুখে। তখন তার আরো একটা ভয় ভাঙল। জাতের ভয়। সে মনে মনে বলল, আমার জাত যখন গেছেই তখন চুংখু করে কিছু হবে। যার জাত নেই তার সব জাতই বদ্ধত। ওরা আমার আপনার লোক, আমিও ওরে।

২

অনুমতি না নিয়ে মেলায় যাওয়া, সেখানে মুসলমানের ভাগ থাওয়া, এমন অপরাধের মার্জনা নেই। মামারা মারলেন না, বকলেন না, কিন্তু ধালাবাসন আলাদা করে দিলেন। সে সব মাজতে হলো। সুবুকেই।
তাতে তার আপত্তি ছিল না। বরং দেখা গেল তাতেই তার উৎসাহ।
ছ্কানকাটা

মামিমাদের কাছ থেকে সিদ্ধ। চেয়ে নিয়ে সে নিজেই শুরু করে দিল রাখতে। কলাপাতা কেটে নিয়ে এসে উঠানের এক কোণে খেতে বসে। কেউ কাছে গেল সবিনয়ে বলে, হ্যাঁ তো না, হ্যাঁ তো না, জাত যাবে।” তার মশা দেখে তার মা ছাড়েলা কালেন। একটা প্রায়শ্চিত্তের বয়স্ত্রা না করলেই নয়, মামারা বীরকার করলেন। তা জেনে শুকু বেঁকে বসল। বলল, “মুসলমানের ভাত আরো কৃত্ত্বার খেতে হবে। ক’বার প্রায়শ্চিত্ত করব? গোবর কি এত মিটি যে বার বার খেতে হবে।”

মামাবাড়ি থেকে চিঠি গেল বাবার কাছে। ইতিমধ্যে সৎমার হয়েছিল। যন্ত্রা, তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা অগ্রসর হয়ে উঠিয়েছিল। শুকুর বাবা একটা ছাড় খুঁজছিলেন শুকুর মা’কে ফিরিয়ে আনার। চিঠি পেলে অপনি হাঁক্সির হলেন। শুকুর কোলে টেনে নিয়ে বললেন, “চল আমার সঙ্গে।” লীলকে বললেন, “যা হবার তা হয়ে গেছে। আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারিনে।

এলো আমার সঙ্গে।”

আবার শুকুরের বাড়িতে আদেশের হাট বসল। আমার তার পুরোনো বন্ধুরা তাদের খুব দিন রাত আসব অমালুম। এবার সে আমাদের বারণ করে না, করলেও আমার মানসিক না। এ বলে, আমার শুকু। ও বলে, আমার শুকু। শুকু যখন প্রভূতির একাছাদ অপন। ওর বাবা সাদো করে ইঙ্গিতে দেরির জন্য দিতেন আমার রোজ রোজ ইঙ্গিত করে বিপদে পড়তে।

শিবপুরহাটের সেই যে অভ্যাস শুকু সে অভ্যাস কাঠিন্যে উঠে পারে না। বখন এক সময় খাব থেকে পালাবো, আমারা চেয়ে দেখি সে নেই। আমাদের সহকারা শহরের নাড়ি আছে নিশ্চয়, কিন্তু নাড়ির ধরের ঘন বসতি, শুকুর তাতে অক্ষর। সে যায় আউল দরবহে বেিকের সদানে। ফকির দেখলেই সঙ্গ নেয়। তাদের সঙ্গে ঘুরেফিরে সদ্যায় পরে বাড়ি আসে। আমরা তাতে তাতে তার জন্যে ভেবে আসল। তার বাইন নিয়ে এক এক জন এক এক দিক বেঁচে, পেলে তাকে খেলে সাঁতা মেলে না। আমরা যখন তার আপনার লোক নই, যত রাজ্যের ফেরার আসামীরা ভেক নিয়েছে বলে ওরাই হয়েছে তার আপনার। শুকু যে ওদের মধ্যে কী মুহুর পায় আমারা তো রুকিনে। যত সর সরিয়ে চেরি আর জুঁতার চোররা গৃহস্থের বাড়ি গানে গেলে বেঁটায় কার কি সম্পত্তি অাছে সেই ধরনীটি অনেত। তার পরে একজন

পিঙ্কুর রাতে গৃহস্থের সর্বনিম্ন চূরি যায়।
এক দল করিনিয়া গান করতে যাচ্ছে দেখে হংসকুকুর তাদের নৌকায় উঠে বসল। মেলায় গিয়ে দেখল ছাড়া হলো না, নে যদি বা ছাড়তে চায় দলের লোক ছাড়ে না! তারা একটা গাছের সাথে আস্তানা পড়ল। সেখানে ছোলা কেটে বড় বড় হাঁড়ি চাপিয়ে দিল। কুটুনা কুটিতে বলল দলের মেয়ে-ছেলের। বলতে ভুলে গেছি দলের কর্তা যিনি তিনি পুরুষ নন, নারী। তার নাম হরিদাসী। হরিদাসী নাম শনে হংস ধরে নিয়েছিল হিন্দু, আপনারাও নে তুল করতে পারেন। তাই বলে রাখছি তিনি মুসলমান ধরবেন। তার দলের পুরুষদের নাম শনে মানুষ হয় না মুসলমান না হিন্দু। ইসলাম শা-ও আছে, আবার মানুষ শা-ও আছে। হংস ধরে নিয়েছিল ওরা সকলেই হিন্দু। তাই আহার সংস্কার ছুঁবার ভাবেনি। কেবল পানের সময় 'পানি' কথাটা শনে একটি ধংস্কা বেঁধেছিল।

হরিদাসীরা মাঝে করে রাঢ়ে বাড়ে খায় আর গান করে। হংসকুকুর তাদের শরীর। তার গলা শনে হরিদাসী তাকে কাচে ভেকে নিয়ে বললেন, "তোর হবে।" একবিং জীবন বিষ্ণু নগত, এতদিন না ফিরল! হংসকুকুর চোখে পৃথিবীর রূপ গেল বদলে। যেদিকে তাকায় সেদিকে রূপের সারার। কানে চেউ তোলে হরিদাসীর কর্ধার্থনি—

"এমন ভাবের নদীতে সই তুব দিলাম না।
আমি নামি নামি মনে করি মরণ ভয়ে নামলাম না।"

মেলা ভাঙল। হংসকুকুর ভয় ভাঙল। মামারা যদি তাড়িয়েই দেন তবে তার আচরণের অভাব হবে না। তখনো নে জানত না যে ওরা মুসলমান। জেনে শিপনের অন্যের মুখে। তখন তার আরো একটা ভয় ভাঙল। জাতের ভয়। সে মনে মনে বলল, আমার জাত যখন গেছেই তখন হংসকুকুর করে কী হবে। যার জাত নেই তার সব জাতই খাটত। ওরা আসার আগনার লোক, আমিও ওলে।

২

অন্যথার না নিয়ে মেলায় যাওয়া, সেখানে মুসলমানের ভাব খাওয়া, এত অপরাধের মর্যাদা নেই। মামারা মারলেন না, বকলেন না, কিন্তু খালাসান আলাদা করে দিলেন। সে সব মাঝেতে হলো। হংসকুকুর। তাতে তার আপেক্ষিক ছিল না। বরং সেখানে গেল ভাবেই তার উৎসাহ।
মামিমাদের কাছ থেকে সিদ্ধ চেয়ে নিয়ে সে নিজেই শুধু করে দিল রাখতে।
কলাপাতা কেটে নিয়ে এলে উঠানের এক কোণে খেতে যায়। কেউ কাছে
গেল সবিনয়ে বলে, "ছুঁতাও না, ছুঁতাও না, আর তাকে যাব।" তার দশা দেখে
তার মা হবেলা কানান। একটা প্রায়চিত্তের ব্যবস্থা না করলেই নয়,
মামায়া কীহাল করলেন। তা জন শুকু খেলে বসল। বলল, "মুসলমানের
ভাড় আরো করতবার খেতে হবে। ক'বার প্রায়চিত করব? গোঁদ্র কি
এই মিটি যে বার বার খেতে হবে।"

মামাবাড়ি থেকে চিঠি গেল বাবার কাছে। ইতিমধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল
লন্ত্র, তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। শুকুর বাবা একটা
ছল খুঁজছিলেন শুকুর মা'কে ফিরিয়ে আনবার। চিঠি পেয়ে আপনি হাজির
হলেন। শুকু কেলো টেনে নিয়ে বললেন, "চল আমার সঙ্গে।" স্বামী
বললেন, "ও বাবার তাত হয়ে গেছে। আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারিনে।
এসো আমার সঙ্গে।"

আবার শুকুরের বাড়িতে আনন্দের হাত বসল। আমরা তার পুরোনো বন্ধুরা
তাদের ওখানে দিন রাত আসের জমালমু। এবার সে আমাদের বাণর করে
না, করলেও আমরা মানতুম না। এ বলে, আমার শুকু। ও বলে, আমার
শুকু। শুকু যেন অতোকের একটা আপন। ওর বাবা যদি ওকে ইসলামে ভর্তি
না করে দিতেন আমরা রোজ রোজ ইসলাম কামাই করে বিপদে পড়তে।

শিবপুরহাটের সেই যে অভ্যাস শুকু সে অভ্যাস কাঠিয়ে উঠতে পারল না।
কখন এক সময় ক্যাশ থেকে পালায়, আমরা চেয়ে দেখি সে সেই। আমাদের
মহকুমার শহরে নদী আছে নিচের, কিন্তু নদীর ধারে ঘন বসতি, শুকুর তাতে
একটি। সে যায় আউলান দরবেশ বীরবরের সঙ্গে। ফকির দেখলেই সঙ্গ
নেয়। তাদের সঙ্গে ঘুরেফিরে সন্ধ্যার পরে বাড়ি আসে। আমরা ততক্ষণ
তার জন্যে চেষ্টা করে অক্তি। তার খোজ নিয়ে এক এক মাসে এক দিকে
বেরোয়, গেলেও তাকে খেলে নাড়া মেলে না। আমরা যেন তার আপনার
লোক নই, যত রাজ্যের কেরার আসামী ডেক নিয়েছে বলে ওঠাই হয়েছে
তার আপনার। শুকু যে ওদের মধ্যে কী মুখ পায় আমরা তো বুঝি।
যত সব নিচিয়ে চোর আর জাহাবাঙ্গ চোরনী যুদ্ধের বাড়ি গান গেয়ে
বেড়াল কার কী সম্পত্তি আছে সেই ধরণের জানতে। তার পারে একদিন
নিশ্চিত রাতে যুদ্ধের সর্বান্ত চুরি যায়।
খুঁকুকে আমরা সাবধান করে দিন যে কোন দিন চোর বলে সন্নেহ করে।
পুলিশ তার হাতে হাতকড়ি পরাবে। সে বলে, "সন্নেহ মিটলে খুলেও দেবে।" আমরা বলি, "কিন্তু কলক তে ঘুচে না। মুখ দেখাবি কী করে?"
সে বলে, "ওরা যেমন করে দেখায।" ওরা মানে বাউল বোঁটমার।

খুঁকুর জন্য আমাদের লজ্জার সীমা রইল না, দেখা গেল আমরাই ওর চেয়ে সলাজ। তার সকলে মিষ্টে আমাদের সত্ত্বে বোধ হল। একাধারে মেলামেশা বন্ধ হয়ে এলো, গোপনে মেলামেশা চলল।

হেডমাস্টারের মশাই ছিলেন খুঁকু বাবার ব্যাপার। তিনি পরামর্শ দিলেন ওকে বোডিং এর রাখতে। ওরা একদিন ওকে বোডিং এর রেখে এলেন। ওর তাঁকে আপনি নেই, বরং ছুড়ি জাতের সঙ্গে পাঙ্কি বোঁটনের আশা। আমরা কিন্তু হতাশ হলুম। বোডিংর পাশেই হেডমাস্টারের মশাইরের কোডাংটার।
তার চোখে খুলো দিয়ে যে খুঁকুর কাছে যাওয়া আগ্রহ করব সে সাহস ছিল না।

কিছুদিন পরে এক মজার ব্যাপার ঘটল। হেড মাস্টারের মশাই একদিন সকালে সুনেন দুটি বালিরিয়া বালক ফুটিয়ে গান করছে—

"যৌবন আলা বড়োই আলা সহতে না পারি।
যৌবন আলা তেজে করে গলায় দিব দন্ত।

খুঁকু যে যৌবন আলায় বীরী।"

মশাই তা দুই হাতে জুড়ে কান ধরে টেনে তুললেন। অন্তর্জাগে দোহাল্যামান ঐ দুটি গান অবিলম্বে কবুল করল যে খুঁকুই ওদের ও গান শিখিয়েছে। তখন তিনি খুঁকুকে তাকে করলেন। খুঁকু বলল, "সব সত্যি।
দেখ ওদের নয়, আমার।"

খুঁকুই বলেন, "গৌমায় যদি যেতে হয় তবে সদরবলে কেন? তুমি একা যাও।" এই বলে একটা গাড়ি চাকে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

সেও বাঁচল আমরাও বাঁচলম। তার বাবা কিন্তু তাকে নিয়ে মুখিলে পড়লেন। ঘরে আটক করে রাখলে পড়াশোনা মাটি। ইস্কুলে যেতে দিলে সে টিকানা হারিয়ে ফেলে। দাদার কাছে পাঠ নেতার মাস্টার নয়, বাউল ফকির। কিছুদিন তিনি নিজেই তাকে বিছালায় পাঁচে দিয়ে এলেন, সেখানে তার উপর কড়া পাঠারার বন্দোবস্ত হল।
কিন্তু সে অনেকের খাতায় ইতিহাস ও ইতিহাসের খাতায় সংক্রত নিয়ে শিক্ষকদের উত্তক্ষ করে তুলল। এটা যে
আজ ইচ্ছাকৃত তা নয়। যে নিজেই বুঝতে পারে না ফেন এমন হয়। তারা তার মন ছিল না পাঠে।

হঘুস্কুর মা তার বাবাকে বললেন, “আমি আমার কথা হেসে উঝিয়ে দেবে। কিন্তু সেকালে কর্তারা একমাত্র হলে গিরিদের উপদেশ নিতেন।”

“গুহী তোমার উপরেশেষ্টা হয়।”

“আমার ঠাকুরদার বিষে হয়েছিল বেলো। বছর বয়সে। হঘুস্কুর বয়স পনেরো। হচ্ছে শুধু বাড়িতে গড়ন।”

হঘুস্কুর বাবা হেসে উঝিয়ে দিলেন।

ম্যাট্রিকে হঘুস্কু ফেল করল। আমি গাঁধী। বাধ্য হয়ে আমাকে বড় সহরের বেঁধে হচ্ছে। ভারি হলুম বললে। চিঠিলেখে হঘুস্কুর সাড়া পেতুম না। ওর সঙ্গে দেখা হচ্ছে। হয়তো।

দিন দিন ব্যাধান বাড়তে থাকে। আমি যদি বলি “তুই”, হঘুস্কু বলে “তুমি।” আমার রেখ হচ্ছে। বড়বাবু আসে, না বড়বাবু যেচে করে না।

গুহী দেখে দেখে, কিন্তু প্রাণ হচ্ছে কথা কয় না। একদিন আমি ভালুক, বলেলিলেম, “হঘুস্কু, আমি কি তোর পর?” সে উত্তর দিয়েছিল, “তা নয়।

আমি হলুম ফেল করা ছিলে। আমার ভূমি—”

আমি তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিলেম, “তোর জন্যে আমার সব সময় সুখ হচ্ছে।”

“কিন্তু আমি তা মনে করি আমার মতো মুখী আর কেউ নেই। যেখানে যাই সেখানেই আমার ঘর, সেখানেই আমার আপনার লোক।”

বাউল ফরকিয়া ঘরেশ্বরের ও বলত আপনার লোক। ওরাও ওকে দেল টানত। রবেন রবেন চেনে। আমাদের চেয়ে হঘুস্কু একটা কোলা করে ছিল, ওর পরকালটি ঝরেছে। ওদের চেয়ে হঘুস্কু একজন ভাব। ওর কুপা হচ্ছে একদিন পরমাশ্রয় পাবে। আমাদের হিতিদীপনার চেয়ে ওদের হিতিদীপনাই ছিল ওর পছন্দ।

হাজার হলেও আমি ওর পুরোনো বড়ু। ভোজহাস্ত তার চেয়েও বেশি।

হঘুস্কু সেটা জানত, তাই আমাকে যত কথা বলত আর কাউকেও তত নয়।

10
তাকে দিয়ে কথা বলান। একটা তপস্তা। গান করতে বললে দেখি করে না, কিন্তু মনের কথা জানাতে বললে দশবার ঘোরায়।

স্বুক নিজেকে সকলের চেয়ে স্থায়ী বলে দাবি করলেও আমার অগোচর ছিল না। যে ওর ভিতরে আগুন জগতে আর সে-আগুনে ও পুড়ে খাবার হচ্ছে। কাকে যে ডালোবেছে, কে যে সেই ভাব্যকরী তাই আমাকে জানতে দিত না। আমি অবশ্য অহতামান করতে থাকি পরে রুদ্রেশ্বিত্ত দে সব অহতামান ভুল।

নাযিকা-সাধন বলে ওদের একটা সাধনা আছে। স্বুক নিয়েছিল ওই সাধনা। প্রায়ের নারীর মধ্যে রাধাশ্রিক শুধু রয়েছে। সেই শক্তি যখন আগতে তখন প্রতি নারীই রাখ। যে কোনো নারীকে অবলম্বন করে রাধাতে পেচেছেন যায়। কিন্তু সে নারীর সমস্তি পাওয়া চাই। স্বুক একজনের সমস্তি পেয়েছে। এইখানেই তার গর্ভ। এই জগতেই সে বলে তার মতো স্থায়ী আর কোন নয়। আবার তার মতো হংসী আর কোন নয়।

ভবনের ছেলে ছোটলোকদের সঙ্গে বাড়ি যায়, গায় রাগায়, শোয়া বসা করে। ওদের নোকা বাইতে, গোটো গাড়ি চালাতে, ঘর ছাইতে বেশা গেছে। ওর বাড়ি সমানীন্দ্রিক। তার মাধ্যমে চেট। তিনি বিদ্রুপ বলতে প্রার্থনা দেন না। এই ভেসে যে ইতির নিজের ছোটবেলা মরেছেন, ছেলেকে শাসন করলে যদি বড়ো আবার বাবার বাড়ি যান তবে আর একটা টোপর পরার মতো বল বয়স নেই। মুখে বলেন, “ওটাকে ত্যাগায়ুর করতে হবে দেখছি।” কিন্তু ভালো। করেই মাননী যে স্বুক তার সমালোচনা জগতে লালাগিয়ে নয়। স্বুকুর মা ওকে বকেন। কিন্তু বললে স্বুকুর বাইরে রাত কাটাত। তখন তিনিই ওকে আনতে পাঠান।

মজনু ফকির ওর সুর হুই। গুলো উদ্দিক ও স্বুকুর প্রতিকৃতি কভুকুট। এই রকম—

“বাবা, কানাদে জমাত গেল। যদি সুখের ভিত্তি গুটি থাক তবে আমার লগে আইয়েনা ন য। আমি তোমায় সুখের নাগাল দিতে তারাব।”

“আমি চোখের জলে মাঝারি হয়েছি। কানাদে কি ভাবাইস।”

“সারা জমাত কানাদে রাখি আছ।”

“আছি।”

“আমায় ঘুষবে না।”

“না, স্বুকুর।”

“তবে তুমি সুখের সন্ধান ছেড়ে রাখার সন্ধানে যাও। সে যদি সুখ ছিল
নিরুপাঞ্চ খুন মেয়ে নিয়ে। কিছুতেই 'না' বলে না। তার দলকাল অত নেই। তোমার বলে মনে আসে অন্যের গেল। তোমার কাছে অন্য গেলে এটা কী করবে অন্যের গেল।

স্বীকৃতি এই কেল করল তার পরে আর পরিবর্ত্তন দিল না। তার পড়ালোক সেইখানেই সার্থ হলো। কিন্তু তা সেখানে তাকে পরিবর্তন দিতে হলো, সে পরিবর্তনের কাজে। সে একজন তার নারিকা। তার প্রাণ তাদের পরিসর ঘট্টতে দেন, এই তার আমি জানি, এর বেশি জানিনে। আসার যা জানি তা লোকমুখে শোনা, লোকের কথা আমি বিস্তার করিন, যদিও ল্যাটিন ভাষায় প্রায় আছে লোকের কথাই ভগবানের কথা।

একবার ছুটিতে বাড়ি এসন্ত তাঁ স্বীকৃতি নিক্ষেপে। লোকে বলাবলি করেছে সারী বোধহই ওকে তুলিয়ে নিয়ে গেছে। মেয়েটি নারী প্রথমে ছিল মোস্করোকের বোঝ। অন্য বয়সে বিয়ে হয়। পরে এক বৈঠকের সময় বুঝল। সেখানে বেশ কিছু কাল থেকে চালানো চাহিবার হয়। বৈঠকটির কৌশল প্রতিষ্ঠা হবে মেয়ে বিয়ের সাদা তাঁর জিজ্ঞাসায় ভোগদণ্ড করবে। তারপর থেকে সন্দেহ ছেলে দেখেছিল সে তুলিয়ে নিয়ে যায়, সর্বনাশ করে ছেড়ে দেয়। শুনার সাথে সে গাইতে পারে সান্ধারাত্রি। গান দিয়েছিল আগ মোরাম। ছেলেদের অভিযানকের। অবশেষে হাঁকিয়ের কাছে দর্শন করেন। তখন আরও নিয়োগ বিক্রি করে বৈঠকের একদিন নিয়োগ হয়। তার সঙ্গে স্বীকৃতি। স্বীকৃতি বাবা থানা পুলিশ করেন। কাগজ বিদ্যুত দেন। কিছুতেই কিছু হয় না। তার মা কাতর হয়ে পড়েন।

স্বীকৃতি বাবা বললেন, "হোকন, তুমি তো। পাশ করলে, অলপানি পাশে। আমার ছেলেটি কেন অন্য উচ্চুর গেল। ছিল ছি একটা নট মেয়েমান্তের— তিনি মাথা হেঁট করলেন। কমালে চোখ মুছলেন।

স্বীকৃতি মা বললেন, "যে ছেলে তাঁর সঙ্গে বনবাসী হয় সে কি তেজন ছেলে। আমার মন বলে স্বীকৃতি আমার কেো কুকাজ করেন। ওর সবাই হ। কিন্তু কেন আমাকে বলে গেল না। আর কি ফিরবে!"
ওর নাম সারি, তাই ছুকু ও শুক বলে ভাঙত। শুক দেখতে ছিল, সারি তেমন নয়। কিন্তু সারি রসের বারী, শুক যুক্ত কঠী। রূদ্র ধারণে ধারতে সারি হিংসা বলতে শিখেছিল, যাত্রীদের সঙ্গে মিশে ছ’ছারটে ইংরেজি বক্সিন্ন। হিংসা ও বাংলা অনে যখন যেটা শুনত তখন সেটা কঠোর করত।
এখন একটা গায়িকা নামিকা পেয়ে ছুকু ধন্য হয়েছিল। সারি ও শুকের মতো ছুজনের ছোটে ছোটে রেখে গানের শ্রদ্ধা গান করত। ছুকু অমত কড়াইলে তাঁর গান। সারিকে শোনাত।
ছুকুর মতো আরো অনেকে আসত সারির কাছে, তারাও আশা করত সারি তাদের আদর করবে। করত আদর, কিন্তু সে আদর নিতান্তই মৌখিক। বলের কথা বলে সারির তাদের ভোলাত। যাকে বলে সর্বনাশ সেটা অতিরিক্ত। এখন কি ছুকুর বলাও।
সারির নামে যারা নানিল করেছিল তাদের লোভ ছিল জমিখানার উপরে। কারা কারা দালান ছিল নারীর প্রতিচ্ছ। হতাশ লোলুপের বল অভিভাবকদের সামনে রেখে। হাকিমের এজলাসে ধাড়ায়। তখন সারিকে সমগ্রির মায়া কাটিয়ে শ্রদ্ধা ছেড়ে যেতে হয়। ছুকুর মতো আর যারা আসত তারা সেই তুর্কিতে তার সহায় হলো না, যে যার পথ দেখতে। কিন্তু ছুকু তাকে ছাড়ল না, হাতে হাত রেখে বলল, "এক দিন মা’র সঙ্গে ঘুম, আজ্জ তোমার সঙ্গে যাও।"
সারি বলল, "আমি কি তোমার মা।"
ছুকু বলল, "মাকে যেমন ছালোবাসতুম তোকেও তেমনি ছালোবাসি।"
সারি রসিয়ে বলল, "তেমনি।"
�ুকু অগ্রহ্যত হয়ে বলল, "ধর! তেমনি মানে কি তেমনি?
"তবে কেমনি?" সারি রহস্য করল।
"এমনি।" বলে ছুকু রুকিয়ে দিল।
তখন তারা পর্যন্তের কানে যুথ রেখে এক সঙ্গে গান ধরল—
"আশা করি বাঙালিকাম বাঙাল,
সে আশা হৈল নিরাশা,
মনের আশা।"
ও দরিদ্র, তোমার মনে কি এই সাহ ছিল।"
তার পর রাত্রি ধারতে পথে বেরিয়ে পড়ল।
ছু’কানকাটি  

সারার এক সূর্যহোলা, বিনোদ গোপালিনী। গ্রামে তার বাড়ি। সারার ও শাক্তিশালী নীলফল বাগ।

বিনোদ বললে, "সুর্য, তোর সম্প্রদায় কি ওকে মানায়! ও যে তোর ছেলে ভাইয়ের বয়স!"

সারা বললে, "গোপালও ছিল গোপালের ছেলে ভাইয়ের বয়স। কারো কারো ছোট ছেলের বয়স।"

বিনোদ মুখ বেশি করে বললে, "আমি কি কর তোর সম্প্রদায় কাজ বুলনী।"

সারা মাথা ছুঁড়ে বললে, "না বললেন। তোর বরের সম্প্রদায় আমার বরের তুলনা।"

আসলে সারার বরে অতি বেশী নয়, ওটা। বিনোদের বাড়ি বাড়ি বাড়ি। বিনোদের মনের কিছু ছিল তা কিছুদিন পরে বেরোয়া গেল। সে চেয়েছিল তার দেওয়ার সম্প্রদায় হরিয়ে লইয়ে গেল।

এবার গেল ওরা স্নিগ্ধ চেনা এক সম্প্রদায়ের বাড়ি। অাহার সময় স্নিগ্ধ বাঁচাইয়ের ছিল না, সারার ছিল। ওরা আলাদা রীতি খায়, অহ্লে ফটকটাকের আবাহনে খায়।

সময় অতি সময়। তার ওখানে থাক আসলে তারাও লোক ভালো, কিন্তু তা কী জানি কেন সারার সম্প্রদায় জাগল স্নিগ্ধ তারের একটি মেয়ের প্রীতি বাঁচায়।

স্নিগ্ধ স্নিগ্ধ বলে সারাতাকে সম্প্রদায় পাঠায়। মিষ্টি। অন্তমেয়ের সম্প্রদায় কথা কইতে দেখলে চোখ গোপাল বাড়ি হানত।

তখন স্নিগ্ধ অন্যন্তর করল, "চল, আমরা এখান থেকে যেই।"

সারার অভিমানের স্নিগ্ধ বলল, "কেন? আমি কি যেতে বললেন?"

"না, চুরি বলিয়ে কেন? আমিই বললি। এক জাগাগায় বেশী দিন ধাকছে ঠান পড়ে যায়। সেটা কি ভালো।"

"কিসের উপর ঠান? জাগাগায় না মায়েরে?"

এই নিয়ে কথাকাঠামোটি করতে স্নিগ্ধ মনে লাগে। সে বিনা প্রতিবাদে প্রাণ করে দেয় দুর্বল। তখন সারাতাকে সাবধানে ধরা দেয়।

আসলে করত তারা কর প্রায় ঘুরুল। ঘুরতে ঘুরতে তাদের পুত্তী এলো।

ফিরিয়ে যাও। কাছে তারা কিছু চাইও না, পাওও না, নিলে বড় ঝোর
চালটি আলোচ্য অল্পদিনের কাঠটি নেয়। সারা শৌভিন মহুষ, হাটে কিংবা ভেলায় গেলার ভাব কিছু কথা হয় যায়। পুঁজি ভাঙতে হয়।

সারা বলে, “চল আমি শহরে যাই।”

বলা হল, “শহরে!” বলতে পারে না যে, শহরে আসার পথের কোনো সময়ের দেখা, দেখা কোথায় যেনা, পরিচয় ছিল কেতু না কেউ চিনিয়ে সে কাছের কুস্তিলক।

৫

যে শহরে তারা গেল তারা উত্তর বঙ্গের একটি মহকুমা শহর। পশ্চিমের হত্তও সাহায্যে টমটম বা একটি গাড়ি চলে। টমটম মহকুমার পাথমা দোসাদ।

টমটম পাড়ার এক ধারে পুলিশকারখানা। ভাড়ার সঙ্গে দেখা নেহাট গানাব্যাপনায় ও বিখ্যাত করায়। মহকুমা নামক সেখানে ও গান জন্য তিনি তাকে তার ছেলেদের মাস্টার রাখলেন। বাস ছাড়ে এক গজে যখন পতলের জোড়ার চালক কালি হলো তখন তিনি সামরিক দাবী করে মুহুর্তের বাহাল করলেন।

মহকুমা সারা দিনের কাজ হলো টমটমের জোড়া, চালকদের গাল ও বাসনার মুহুর্তের ক্ষেত্রে পরিকার করে ওজু লাগানো ও ব্যাংকে বাণী। বেচারিদের ব্যবসায় চালক হর কান চলাপালা হলে পাগলা পালাই পালাই করে, কিন্তু পালাবে কোথায়! যে মুহুর্তের করে তাই দিয়ে সারা সংসদ চালায়।

যাবে বাংলায় সীমায় বাণি গান গেয়ে সারার কিছু কিছু পাই। তা দিয়ে কোনো কথা শুনে জিনিস।

বেশ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন মাটিকার মাঝারি মুহুর্ত এলো।

তার ইচ্ছা ছিল মুহুর্তের সঙ্গে নিস্কে, কিন্তু মুহুর্তে তো। এক নয়। অগভীর মুহুর্ত বাঙালি হলো না। তার জায়গায় যিনি এলেন তিনি মানবাজারের কথা। মুহুর্তের কাছে কারা আসার করতে গিয়ে তিনি দেখলেন সে আনাড়ি। তার একটি আলা বেলায় বসেছিল, মুহুর্তে এক কথায় মুহুর্তে চালক গেল।

ইতিমধ্যে টমটম মহকুমার সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল। তার। তার কথা যে বল বেঁধে বড়বাস করল। তাকে কোনো ফল হলো না, কারণ মুহুর্তে না ছিল ব্যাংকায়, না অফিসায়, না মুহুর্তের কোনো। যা ছিল তা হুর্নাম। তখন
ছুঁকানকাটা  

টমটমওয়ালারা বলল, আমরাই চাই করে ভোমাকে খাওয়া এসে, তুমি আমাদের গান গেয়ে শোনা কর।

একবার দেখা গেল খুঁকু টমটম পাড়ার সভাগায়ক হয়েছে। তার সভাসদ হাড়ি ভোম মুচি মোসাদ জেলে মালী গুঁড়ি ইঁজেক্ট শিক্ষায় বকিত অনলাইন। খুঁকু অঁজ গান গাই না, গান ধরিয়ে দেয়। হাটমুক জাতের ঐক্যতার সম্পূর্ণতার পর্যায় হয়। জলসা চলে রাতে একটা অবধি, তার পর খুঁকু বাচায় ফিরে সারার পায়ে পুঁপে দেয় আধঝলা পয়সা ডাল পয়সা।

খুঁকু তার পরিচয় গোপন করেছিল। তেবেছিল কেউ তাকে চিনবে না। কিন্তু টমটম পাড়ার সভাকারী হবার পরে সে এত দূর কুশ্চিত হলে। যে বিশ্ব। পঞ্জিকা মাইল দূর থেকে তার জন্ম নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। এখানে ওখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে করতে এক দিন সে ধরা পড়ে গেল। খবরটা করে তার বাবার কানে পেলুল। বাবা এলেন না, কাকা এলেন তাকে নিতে।

কাকা এসেই শহরের গণ্যাজ্ঞাতরের ভাড়ি গেয়ে বেড়ালেন ভাইপোর কীর্তি। গণ্যাজ্ঞাতরের শিবিরে উঠলেন। ছি ছি! মেয়েমাছুষ নিয়ে ভেগেছে তার জন্তে চূপে নেই, কিন্তু ছোটলোকদের সঙ্গে ছোটলোক হয়েছে। ছি ছি!

খুঁকু কাকার কথা শুনল না। ভালো ছেলে হল। না। তিনি অনেক করে বোলালেন, লোভ দেখালেন, ভয় দেখালেন। বাবার সময় একটা চাল চেলে গেলেন যার মধ্যে খুঁকুকে তুষের আগে পুড়তে হলে।

সারার বড় গন্যনার শখ। কিন্তু কোথায় টাকা যে গয়না গড়াচ্ছে তেবেই খুলায় না। সারার বোঝে সব, কিন্তু থেকে থেকে অবস্থা হয়। খুঁকু মনে আঘাত পায়, বায়দার বায়ো বলে বিশ্ব লাগে। গানের প্রেক্ষা দিয়ে বুকের বেদনা চেলে রাখে। দিন কাটে।

এক দিন টমটমওয়ালাদের সভা থেকে খুঁকু সকল সকল ছুটি গেল। সারার যে তাকে দেখে হত্যাত হবে এ কথা ভাবতে ভাবতে বাচায় ফিরল। বাচায় ফিরে তার মনে একটু খটকা বাড়ল। সে ঠেলা দিয়ে দেখল ভিতর থেকে ধার বংশ। ডাকল, "সারার। ও সারার।"

মিনিট পাঁচ সন্ত ভাকাড়কির পর ধরে যুদ্ধ চলে খুলল কোথায় সারার! সারার বেলে কে একজন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এবং নেমে যুদ্ধ থেকে হস্ত হতে করে চলে গেল। চলন্ত মেয়েলি নয় মোটেই। খুঁকু ভেঙে পড়ল।
তার মনে হলো সে মরে যাবে, বীঝে না। মড়ার মতো কতক্ষণ পড়ে ধাক্কল জানে না। যখন জান হলো দেখল সারী ধরিয়ে করে কাজ করে। কাঁপতে ক্ষালতে তার পা ছুটে চেটা করছে, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। হুকু গা সরিয়ে নিয়ে উঠে বলল।

সে একটি রাত। হুজুনের একজনেরও চোখে ঘুম নেই, আহারে রূপচি নেই। বুকে হঘর্ষ রোদন। হুজুনেই নিত্তন, নিষ্কল।

পরের দিন সারাই প্রথম কথা কইল। "তা হলে এখন তুমি কী করবে?" সারাই তাকে এই প্রথম "তুমি বলল।

হুকু রুমতে গারল না। জিজ্ঞাসা নেতে তাকাল।

"বাড়ি ফিরে যাবে, না এখানে থাকবে।"

হুকু ভেবে বলল, "সেখানে তুমি সেইখানেই আমার বাড়ি।"

"কিন্তু সেখানে না? আমি যে বেঁচে।"

"তুমি কে তাই যদি জানি তো সব জানলুম। তুমি কী তা তো জানতে চাইলে।"

"আমি কে?"

"তুমি রাধা।"

এ উভয় তুলে সারাই স্থিতিত হলো। এবার ভেবে পড়িবার পালা তার। সে এমন কাঠা কাঁধায় যে হুকুর মনে হলো তার সর্বনা চুরি গেছে। অতঃ তখনো তার গলায় দুঃখ ছিল এক ছড়া সোনার হার, সত্য নির্মিত।

৬

কাঠার চাল বাঁচ হলো। কিন্তু সারাইর নামে যে সব কথা রটল তা কানে শোনা যায় না। হুকুর পক্ষে মুখ দেখানো। হায় হলো। কিন্তু নিক্ষুপ যায়। টমটম পড়ার টিটকারি সে গায়ে মাথে না, ছোটলোকের রমিতা মাথা গেতে নেয়।

সে করে তাদের বেশী দিন চালত না। দৈবতে মে সহরে এলেন এক ইউরোপীয় পর্বট, তার সঙ্গে গান রেকর্ড করার যত্ন। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রশস্তের লেখকসমূহ সংগ্রহ করছিলেন। তার সামনে সারাই ও শুক উভয়েরই ভাবে পড়ল। সারাইর গলা তার এত ভালো লাগল যে তিনি তার
ছঁকানকাটা

সাহেব নাতিনি গান রেকর্ড করলেন। তার পর সে সব রেকর্ড কলকাতার বন্ধুহরে বাজিয়ে শোনালেন। তার বন্ধুরের মধ্যে ছিলেন এক রেকর্ড কর্মী। তিনি সাধারণ সারিকে লিখিতে কলকাতা আসতে।

সারিই এলো, তার গান নেওয়া হলো। এই সব গানের আশাতীত আদর হলো। সাহেবের সার্টিফিকেট না হলে এ দেশে বাংলা বইও বিক্রি হয় না। সারির বরাতে ছুটন সাহেবের স্থাপরিষ্কার। রেকর্ডের পর রেকর্ড করিয়ে সারি জন্মায়ত হলো। তখন তাকে বাস উঠিয়ে অনন্ত হলো কলকাতায়। বলা বাহুল্য, শুক্ল রাইল সঙ্গে। তার গান কিন্তু কেউ রেকর্ড করতে চায় না, সাহেবের স্থাপরিষ্কার নেই।

তার পরে সারি পড়ল এক বিশ্বব্যবসায়ীর হনজ্যে। তার রূপের রমণী ছিল না, কিন্তু রূপের চেকনাই ছিল। ভালো করে মেকআপ করলে তাকে লোভীয় সেখায়। যারা ফিন দেখতে যায় তারা লোভনকে শোনতে বলে দুর্লভ হয় ক্ষেত্রে। সে তুলোর পুরো স্বাগত পেল সারি। জিরেক্টার তাকে পরিচালনা দিলেন কিবী গান পিছনে। লোকসঙ্গীতে ছোড়ে সে 'আধুনিক' সঙ্গীত শিখল। কর্তিকার সে মাসের মাসের নাম করল। হীরে পীরে সারি তারা হয়ে আলাদা। চার পাঁচ বছর পরে যারা তার ফিন দেখতে তারা আনল তার অতীত ইতিহাস।

অবশেষে এক দিন গোল্ডে সারির বিখ্যাত হয়ে গেল কলকাতার এক অভিজ্ঞতা পরিবারে। কেউ অনিচ্ছল হলো না, কারণ সারির আয় তখন হাজারের কোটায়।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি চেষ্টা করে ফিরিয়েছি। তিনি বহানাকে ভিড়। কোনোখানে একটি বার্থ কালী নেই। বার করে ঘোরাবৃত্তি করে আমি প্রায় হাল ছেড়ে দিছি এমন সময় একটি সার্টিফিকাট কামরা। থেকে কে কে সে আমাকে ভাব বলল, "থেকান থেকা না?" আমি পিছনে ফিরে দেখি হালু।

শুরু পরে গোকুল আলমারি, মাঝারী লবাড়া চুল, মুখে এক রাশ গৌর বাড়ি, গলায় একটি কালো। কাঁচার কি কালো কাঁচার মালা। ফিটফাটে বেহারা চাপরাশির মেলায় ও নেহাত রেমানান। হতে একটি একতারা না অনন্নবহুলের ছিল, সেটা বাজিয়ে মোটা গলায় গান করছিল একটু আগে—

"প্রেম করো মন প্রেমের তত্ত্ব জেনে।
প্রেম করা কি কথার কথা রে জুর থেকো চিনে।"
আমাকে পিছন ফিরতে দেখে হরদু কামরা থেকে নামল। নেমে জিজ্ঞাসাটি
করল, “কি হয়েছে? আরো খিলাচে না?”
আমি বললুম, “এট রাতে কে আমার অনেক হায়গা ছাড়বে!”
সে আমাকে টেনে নিয়ে চলল হট ক্লাসে, যদিও আমার টিকট দেকে গুল ক্লাসের। দরজায় ধাক্কা মেরে বলল, “ও সারী। একবার খুলবে?”
সারীর বললে সারীর স্বামী দরজা খুললেন। তখন হরদু আমার পরিচয়
দিয়ে বলল, “একটি কষ্ট করতে হবে এর মধ্যে। আমার বাণ্যবন্ধ।”
ভ্রমলোকের মুখে পাইনি, হাতে ভিটেকটি নদী ও পরনে সিল্কেরেঃ
লীলিং হুট। ভ্রমহিলার পরনেও তাই, উপরন্তু রঙছাড়ে ডেসিং গাউন।
তারা বোঝ হয় শয়নের উদ্দেশ্য করছিলেন।
সে রাতে আমি কখনো না। আমি উপরের বার্ষে সংকোচে
নিজের ভান করে পড়ে রইলুম। দিকরে হয় আসলে না। তার বেলায়
আসানোইল স্টেশনে হরদু এসে আমার খোঁজ করল। তার সঙ্গে প্রাইমারে
পায়চারি করতে করতে তার কাহিনী জুড়ান। বাকীটিকে বর্ণনায় ও
ব্যাঙ্গনে।
হাওড়ায় শেষ দেখা। বিদায়ের অনেক হরদুকে জিজ্ঞাসা। করেছিলুম—
“তোর পৌরুষ বিভ্রাহি হয় না? তোর আসামী নেই?”
হরদু উত্তর দিয়েছিল, “ও যে রাখ।”
(১৯৪৩)
হেঁদালি

অজ্ঞাতকাল বিটেক্সটে নতুন পড়তে আর বছরের খোঁজাদেরও দেখা যায়-ভাবের মাঝের তো কখনই নেই। গিরিয়া মনে করেন এতে উঠের উপকার হচ্ছে। হংসপ্রেরিত চোর তাকাতের দেখলেই চিনবেন আর ধরিয়ে দেবেন। চোর তাকাতেরও লেখাজোদে নেই। কে যে নয় তাই জিজ্ঞাসা।

কেউ সলর লরজার কড়া নাড়লেই গিরিয়ার মনে পড়ে, চোর নয় তো। তিনি মর্ডার মেয়ে, চোরের নামে ভয় পান না, বরং একটু উঘস হন। উৎকর্ষ হয়ে কড়া নাড়া শোনেন, তার পর সম্পর্ণে নেমে আসেন। দরজা খুলে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন রবিন ছড়ি কি দশ্য মোহনকে দেখবেন, কিন্তু প্রতিবারই নিরাশ হন। আর একটু হলেই একটা রোমহর্ষক ব্যাপার ঘটত। ঘটল না কেন? তবে কলকাতা শহরে থেকে সুখ কি?

রাগতভাবে দরজা বন্ধ করে দিয়ে যান। ডুপুর বেলাটা তিনি এক রকম এক। শাঙ্খিলা বুড়ো মানুষ, স্থায়ী নিচে নামেতে দেওয়া হয় না। তিনি ঠাকুরদের পড়া থাকেন। তিনিও এক চোরের ধান করেন। তার নাম হরি। যিনি এক একে সব হরণ করেন। পরিশেষে প্রাণ।

সেদিন গিরিয়া আন্দুর ছিলেন, কখন কে কড়া নাড়ল টের গেলেন না। খুব আস্তে আস্তে কড়ার আওয়াজ উপরে আসছিল। যেন কেউ কড়া নিয়ে খেলা করছে। মিনিটের পরে তিনি কী একটা কাজ নেমে আসছিলেন, কড়া নাড়া তুলে চুপি চুপি পা। টিপে টিপে দরজার কাছে গেলেন, একটুখানি ফাঙ্ক করে দেখলেন একটা প্রিয়রশন যুবা, বয়স বিশ একুশ, সংকোচের সঙ্কে তাকে নমস্কার করছে।

"কাকে চান আপনি?"
"আপনি কি মিসেস ধারনবীষ?"
"আমি!"

"মলিকা দেবী পুরুষ হাত নিয়ে দাননি। আমাকে পাঠিয়েছেন।"
"হু,।আচ্ছা, আপনি ভিতরে এসে বসেন, আমি এনে বিভর।"

বলবার ঘরে ছোকরাকে বসিয়ে গিরিয়া যখন উপরে গেলেন তখন সেটা ছাড়ার ধোঁকে নয়, ফাকি ছাড়া তো। ছিল নিচেই সিড়ির সমুখে যেখানে
ছায়া জুড়ে ছাড়ি ও টুপি রাখার জায়গা। গিরিজ ভালো করে সাজিয়েন।

dেয়র এত দিনের বন্ধ সফল হয়েছে। চোর এসেছে।

মলিকার তার নাম, কলেজ পড়ে। কোনো দিন ছাতা নেয়, কোনো দিন নিতে ভুলে যায়। এই ভুলরোহন চোরের আজ্ঞার লক্ষ করেছে যে মলিকার হাতে ছাতা নেই। তাই ছাতাকান্নি হাতাবার কদাচিৎ এসেছে। অন্নকাল ওরকম ছাতা দশ টাকা কেম পাওয়া যায় না। যাব ছাতা সে আর কিনতে পাবে না, যাব নয় তার দশ টাকা লাভ।

সাজেতে সাজেতে গিরিজের বুদ্ধি বোলে, তাই সাজ। তা ছাড়া লোকটিকে দশ জনের সামনে ধরিয়ে দিয়ে হবে, তাদের খাতিতেও সাজেতে হব। গিরিজকি কী দেরি করলেন না, কে আজ হ্যাতা ইতিমধ্যে লোকটা ছাতা সম্মত স্টারকেছে।

"ইহং, ছাতার অন্যে আপনাকে পাঠায়েছে মলিকার। আপনি কি তার সহপাঠী?"

"আজে।"

"বাত্তিক আপনার দয়ার শরীর। কাল কামাই করে একখানা ছাতা নিয়ে যেতে আসে ক'জন।"

"দিনটা মেয়েলা কিনো। ফেরার সময় বুঝতে ভিজিয়ে যদি আপনি খেলে তাহলে তিনি কিছু চিন্তা হয়ে পড়েছিলেন।"

"অ! তাই বলুন।" গিরিজ একক্ষণে নিশ্চিত রূপের থেকে এ পাকা চোর বট। কিন্তু পুলিশ যদি বিবাহ না করে। দশজনে যদি বলে, ম্যান কি। তিনি খেলেন ছাতাটা চোরের হাতে দেওয়ার চেয়ে না দেওয়াইটা স্বুত্ব।

"তা ছাতা আপনি নিয়ে যেতে পারেন। ঐ তো ঐখানেই রয়েছে।
কিন্তু মিন্টায় খারাপ কিন। তাই আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্তব্য।"

"কেন? কেন?" ছেলেটি কষ্টবাসে স্থায়ী।

"ছাতাটা আপানী। মলিকার আমার তাতে স্বভাব বোনের ছবি ছায়িয়ে 
-রেখেছে। দেখেন নি?"

"কই, না! স্বভাব বোনের ছবি ঠিক আছেন? স্বভাব মুখ্যত্তের নয়?
আমার আমার কারের কটিবরাণী কিন।"

"স্বভাব বোনের ছবি চিনিনে? আমার আমার বহুলাঠী কিন।"
হেয়ালি

“ভাবিয়ে তুললেন আমাকে! পুলিশে ধরবে তার জন্যে কেয়ার করিনে, কিন্তু আমার লন থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেবে। বলবে পক্ষে বাহিনীর চর।”

“তা হলেই দেখুন কত বড় বুঝি! আপানী চরের সুটো ধরে ধরে গুলি করাও হচ্ছে তুমি। পুলিশকে একটু ভয়ভাব করবেন।”

ছেলেটি সত্যি উঠল। ইতিমধ্যে গিরিতের নজর গেছে তার পকেটের প্রতি। পরের মধ্যে আবার ভাবিক ফুটে। একে যান হয়তো বসে বসে কত-কিছু পোঁছে। হয়তো ছাতার চেয়েও মূল্যবান কিছু।


“এবার আমরা পাকিস্তানের জন্যে কোমর বেচেছি।”

“হা, তিনি হামার বছর পরে আবার এ দেশ পাকিস্তান হতে চলেন। উনি বলছিলেন মহাভারতে নাকি লেখা আছে যে বাঙালীরা পাথি আর বেহারিয়া গাধা। আর মাত্রাজগোনারা নাকি চেরপাদা, অর্থাৎ সাপ।”

“কই, তা তো কথনো আরেক বলে মনে পড়ে না?”

“ইতিহাস আপনার পুনরাবৃত্তি করে। তিনি হামার বছর পরে পাকিস্তান। সবই প্রথমের খেলা।” কিন্তু আমি বলছিলুম কি। আপনার পকেটে যদি কোনো ইশ্বরাহার থাকে তো আমাকে একটু দেখতে দেবেন? নেই। খাবার খেতে।”

“ওগুলো তবে কে? এই যে, ঠেলে বেরোচ্ছে।”

ছেলেটি তার জুন সিকনের পকেট বেঁধে দেখাল। সিগারেট। দেশলাই। বি সিকনের পকেটে ছিল মনি-ব্যাগ, চশমার খাপ, খুবাল।

গিরিতে হতাশ হলেন। না, চোর নয়। বেঁধানো বিষয় দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, “মলিককেও বুঝিরে বলবেন আমার লোক নেই।”

কিন্তু তার পরেই কি আমি কেন তাঁর সন্ধে হলো যে কি যেন ছিল, কি যেন নেই। তিনি বসবার ঘরে চুক্কে খানাতলাস করে দেখলেন একটা আলবাম উত্তরে, একটা টাইমস নিবেদ্য, একটা হাতের দাতের তাজমহল নিক্ষেপ। আরে। কিছু গেছে কি না চিত্তা করতেই তাঁর মাথা গুরুল, তিনি,
সেই ঘরেই ঘরে পড়লেন। ছেলেটার নামমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় জানেন না। পুলিশের ব্যবস্থা দিয়ে ফল করে।

মরিক। যখন বাড়ি ফিরল তিনি তাকে এক নিত্যানন্দে এক করলেন, “ছাতার জন্য কাজ করে পাঠিয়েছিলে, তার নাম টিকানা জানতে পারি?”

“কই, আমি তো কাউকে পাঠানি? কে এসেছিল?”

“চোর গো চোর। আমার সর্বব্যাপ্তি চূরি করে নিয়ে গেল তোমার নামক করে। তোমার সহযোগী বলে পরিচিত ছিল। দেখতে সুন্দর। বয়স বিশ একাদশ। রেশমের পাঞ্জাবী গায়ে। গলায় সোনার হার। চোরে চশমা। সিগরেট খাও। দাড়ি-গোফ কামানো। জুলদি রাখে।”

“চিনেছি, চিনেছি। কিন্তু সে আমার সহযোগী হতে যাবে কেন? সে তো এই পাঞ্জাবী একটা বক্তার হোঁজা। আয়! দেখি। কিন্তু কী তার নাম, কোন রাটারা বাড়ি অর্ত কবর রাখনি।”

“তবে আমন তোমার নাম।”

কর্তা এটা সব জনে বললেন, “ভালো করে যুগলেম কেন?”

“ভালো করে যোগাযোগ করে বলে? তুমি যদি তোমার জোকে বিশ্বাস না করো তবে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।”

তিনি আর এক দফা খানাতুলসাহ করলেন। টাইমীপীটা পাওয়া গেল বুড়ি শেলাকের পিছনে। হাতীর হাতের তাজমহলট। চেয়ারের তলায়। বিশ্ব আলবামটা উচিত হলে না। কর্তা বললেন, “আচে কোথাও। কাল একবার কাপড়ের উঠাই দেখতে হবে।”

গিন্নীও অনেকটা নিঃশ্বাস হলেন। হতো। জিনিস যখন মিলল তখন তৃতীয়টাও মিলবে। তা হলে চোর নয়। যাকু, বাচা গেল। কিন্তু আফসোসও হলো। ঘটনাটা ঘট ঘট ঘটল না। অত বড় একটা রহস্য জলের মত। সোনা হয়ে গেল।

সে কথা যখন ফিরল হেসে বলল, “বোধির যা আকেল। লোকটা কোনখানে গিয়ে চোরাই মাল নিয়ে যেত। জুনি? পরের তো দেখিয়েছে।”

পরের দিন তিন ঐ সময়টিতে আবার কী নাড়ার শব্দ হলো। গিরিকৃষ্ণন জানতেন যে অমন হবে, তাই আগে থেকে সেজে রয়েছিলেন।

খুবকটি ঘট। করে সমস্ত জানিয়ে বলল, “ইশ্রাহার পড়তে চেয়ে ছিলেন। এনেছি। এর মধ্যে ভিধিনিভিদ্বের গোপনীয় নির্দেশ আছে।
সেহারি পড়া হয়ে গেলেই আমি ফেরৎ নিয়ে যাব। আমি তত্ত্বজ্ঞ বাইরে যাবাঁর জ্যাছাই।

"না, না। বাইরে কেন? আপনি ভিতরেই আছেন।"

আলবামটি সকালবেলাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোথায় গেল তবে?
এই স্বর্ণালী খুবটিকে আর সন্দেহ করাও যায় না। সামাজিক একটা আলবামের জন্য এ কথন। অতটা নিচে নামবে না। রহস্য। কিন্তু রহস্যেও অনন্য আছে, যথে বেশী লালোখনা না হয়। গির্জার মেজাজ ভালোই ছিল।

"পড়তে বেশ লাগচে কিন্তু। ইচ্ছা করে সবাইকে একবার করে পড়তে।
তা আপনি তো ফেরৎ না নিয়ে নড়বেন না।"

"আমি নড়তে চাইনে, আপনি যত্নে ইচ্ছা পড়তে পারেন। কিন্তু লোহাই আপনার, কাউকে এসব পড়তে দেবেন না। দেখেছেন না, উপরে
লেখা আছে মোট সীকেট। এ হলো থাস রাশিয়ার ছাপ। কলকাতায়
মাত্র পাঁচ কলি এসেছে। আমরা এখন। এর নকল তেরিক করবার সময়
পাইনি।"

"আছে, আমি কাউকে পড়তে দেব না। কিন্তু নকল লিখে নিতে পারি?"

"তা পারেন বোধ হয়। কী জানি, আমি ঠিক জানি।"

"আমি উপর থেকে দশ মিনিটের মধ্যে আসছি। নকল করব আর
আসব। আপনি তত্ত্বে সিগারেট থেতে পারেন। আপনার নিজের না, আমাদের। কেমন, আপনি আছে?"

"ব্যক্তিত্বের ভাবে আমার বিন্দুপাত আপনি নেই, তবে কিনা পাঁচের
আপনি ধাককার তার। তা আপনি সেখন। তার না, আমার যেতে
অভাব আছে।"

গির্জা যখন ফিরে এলেন তখন চমকে উঠলেন হারানো। আলবামটা
বাধ্যচ্ছে লক্ষ করে। এ কি কথন। তথে পারে যে আলবামটা বরাবর
কথনেই ছিল। তবে এলো কী করে? অনলে কে?

"আলবামটা—"

"হী, আমি আন্তরিক। নিয়ে গেছলুম আপনাকে না বলে। কিন্তু ক্ষতি
করিনি। বরং আমারো কয়েকটি ফোটো। জুড়ে দিয়েছি।"

তিনি হী করে দেখেন, যে মজিকার মারাত্মক বিশ বাইশখানা আটা
করেছে। তবে যে ছুঁড়ি বলে সহপাঠী নয়, নাম জানিনে!
“এসব কার তোলা ? আপনার ?”
“অধমের।”

“নাম জানতে পারি ?”
“নিশ্চয়। আমার নাম হোস্যা রায়।”
“আপনি মলিকার সহায়ী তো ? ঠিক ?”
“সে আর বলতে ? এক বছর এক সমুহ পড়িছি।”
“কিন্তু ও যে বলে সহায়ী নন।”

“বোধ হয় পৌরক করতে চান না। আমাদের রাজনীতি এক নয়।”
“ওহ ! তাই বলো। তুমি বলতে পারি ?”
“ঘন্টাটে।”

“তুমি ওকে ভালোবাসে ?”

“তা তো বললি। হী ? বললেও তুল হবে। না বললেও তুল হবে। আমার এক সাদু পড়ি। আলাপ পরিচয় আছে। এই পর্যন্ত বলা যায়।”

“বুঝি। তুমি কমিট করতে চাও না। কিন্তু আমাকে গোপনে বলো; দেখি, সত্যি ওকে ভালোবাসে কি না।”

“গোপনে বলার অধিকার যদি পাইতে হবে তা বলব তা। অনে সহজ করবেন কি ? আমার তো মনে হয়, না বলাই নিরাপদ।”

“খুব সহজে পারব। যদি বলার বাধা না থাকে।”

“বাধা যা ছিল সে তো আপনি নিজেই সরিয়ে নিলেন। কিন্তু আমাকে মুখে বাধে। থাক বলব না।”

“না, তুমি বলো। আমি কিছু মনে করব না।”

“আমি আরেক জনকে ভালোবাসি। সে আপ—”

“কী !”

“আমাকে মাফ কোর, অনীত। আমি চলব।”

যেকোণ সত্যি বল বলে চলে গেল। অনীতা মুখের মতো। বলে ধাক্কলেন। একবার দাড়ালেন না। ইহুতিহার রাইল তার হাতেই। কতঃপরে চোখে পড়ল জোঝালা তার চাপাটি ফেলে গেছে।

এবার চূরি নয়। নিয়ে যাবো কিছু। দিয়ে গেছে এমন একটি কথা যা। জলে গিমিী মাঝখানেও প্রথম বয়স ফিরে আসে। মনে হয়, এখনো তুলতে আছি। নরতো ভরণের উক্তি মিথ্যা। মিথ্যা ? মিথ্যা বলে তার লাঞ্চ।
লে তো বলতে চায়নি। বলতে আসেওনি। কেঁচে খুঁজতে গিয়ে সাপ বেরিয়েছে। সাপের দোষ কি?

অনীতার বয়স সাতবাহ। ছেলেপুলে হয়নি বলে আরো কম লেখায়। কেউ কেউ তাকে মজিকার সমবয়সী বলে জম করেছেন। এ ছোকরা যে তাই করে বলে আছে তা তো স্পষ্ট। মা গো, বলে কি না, আমি আপ—

অনীতা লজ্জায় জিব কাটলেন। এ কি কখনো সত্য। কিছু সত্য নয়ই বা কেন? কথায় বলে, ভালোবাসা অন্ত। যার যাতে মজ্জে মন। ধাক, ভেবে কাজ নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। এর পরে যখন ও চশমা নিতে আসবে তখন ওকে বিনা। বাক্যের বিদায় দিতে হবে।

তা বলে চশমাটা বসবার ঘরে ফেলে রাখা যায় না। বসতি করে তুলে রাখা উচিত। পরের জিনিস। যদি হারিয়ে যায়? আর ঐ আলবামখানাও গুরুত থেকে সরাতে হবে। অনীতা উগর্জ নিয়ে বাক্সয় বস্তি করলেন।

আর অনেকক্ষণ ধরে আয়নার সামনে পাঁজিরে বরের চিন্তায় বিচ্ছেদের হলেন। বয়স বাড়ছে না কমছে? বয়স তো মৃত্তক্ষণ নয়, আর সমস্ত বিষয়ের মতো রিলেটিভ। কমছে বললে কিছুতাত্ত্ব অস্তিত্ব হয় না। বাড়ছে বললেও তাই। সাতবাহ বছর একটা কথার কথা। কেউ বুঝতেই বুঝ। কেউ সাতবাহেও যোড়শী। জেন্দোগনী তা হলে তামাশা করেনি। কেনই বা করবে? বাঁচার?

ইশ্বর তাহার পড়ে খাসনবীরের চেখ দিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যায় আর কি।

তিনি বললেন, "সরবনাঃ! আমি এই মুহূর্তে চলন শামগ্রাসারের কাছে। বকৃত্তার সময় আর নেই, কাজের সময় এসেছে।"

এই বলে তিনি আঁগুলে গোলা চুপ করলেন। "উজবেকিয়ানাঃ। কাজাকিয়ানা। তুর্কমেনিয়ানা। তাজিকিয়ানা। চার চারটে শান নিয়ে ওদের শান সঞ্চালন হচ্ছে না। চার আফগানিয়ানা, বেলুচিয়ানা, পশ্চিম পাকিস্তান। তাই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, ওদের রেড ইনিয়ান কমরেন্ডগণ, তোমরা মুসলিমদের উপে দাও, উঠে পড়ে লাগো। ইন্দেরজা বলে, ভিডিওত যাও রাখ। আমরা বলি, ভিডিওত যাও সোমালো। পাকিস্তান আগ করে হিসুমারায় দীঘি বলব।"

তিনি দায়িত্বিকাশ করলেন। কিছু সত্যি সত্যি তিনি তামাসাসারের সত্যের চলনে দেখে অনীতা বললেন, "গো কি? চা খাবে না?"
"আর চাই চারের সময় আর নেই, কাজের সময় এসেছে। রেল ইডিয়ানের সঙ্গে মোগলের নাতিরা। যোগ দিলে খানা খাইয়ে ছাড়বে। একমাত্র ভরার ইংরেজের নেতার আর মার্কিনের বায়ুবল।"

"তার মানে তুমি সাহায্য চাও না।"

"কখন বললুম ও কথা! সাহায্যের জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি।"

"আমি তো জানতুম তুমি বামস্থানী।"

"একবার বার। তা বলে তাতে ধর্ম টিকি গৈতে আমি আর্গা হচ্ছ যুদ্ধ মুক্তাকা চেরে লেব! একেই বলে স্বীকৃতি!

অনীতা দেখলেন তবে ফল নেই। বললেন, "যা ভালো মনে করে তা করো। কিন্তু বিমিটারের সাক্ষাৎ নিজের নিজের যদি কোনো গতিকে পুলিশের হাতে গড়ে তা হলে হাঁড়ি সাঁচা হবে, যেন খুজলাখাকে।"

ফোনের মুখে কথা পড়লে যা হয়। খাসনবীষ এটুকু হয়ে গেলেন।

"কই, চা কোখায়! তখন তখন জল ফুটছে তে ফুটছেই। একই রকম চা খাওয়া। নিয়ে এসো।"

"চারের সময় আছে তা হলে?"

"হুই! সাহায্যের সঙ্গে ইয়াক্ক।"

"তো তুমি অতীর্থ উভিজ্জিত হবে জানলে আমি তোমাকে ও চাই পড়তে দিতাম না। আমার তো রেল মাঝার লাগে ভাবতে যে আবার আমরা মোগল রাজত্বে বাস করব। পদবী যার খাসনবীষ সে তো আরা মুসলমান।"

"কাল থেকে আমি ওর বলে শর্ত লিখতে আরেক করব। প্রত্যক্ষ শর্ত ফি নেহাত খারাপ শোনায়?"

"আমি কিন্তু মিসেস খাসনবীষ থেকে যাব। মিসেস শর্ত যেন মিসেস পুরুষ। বীভৎস শোনায়।"

খাসনবীষ করে প্রকৃতিস্থ হলেন। আলবামান। তারে তারে তারে দুটি গোচার করেননি। রাতের এক সময় নন্দকে দেখিয়ে বললেন, "এসব কার অ্যাপিশট?"

"ওমা...." মায়িকা যেন মাটিতে মিশিয়ে গেল।

"আমার কাছে তোমার গোপন কিছু ছিল না বললে জানতুম। এখন দেখচি তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না।"

"তোমার পায়ে পাড়ি, বৌদি। তোমাকে আমি সত্যি কথাই বলেছি।"
আমি তার নাম পর্যন্ত জানি না। রাতের আটক করে বলে, এক সেকেন্দ্র নাড়াই তাকড় বইব। এক সেকেন্দ্র। বাস। তার মধ্যেই তার কোটি।
তোলা হয়ে যায়। তার পরে আমি আমার গন্ধ, এ গন্ধ পথে। কোটি।
কেমন উঠল তাও কোনো দিন ঝুঁজায়। করিনি। বাক্যালাপই নেই।
নিজের কোটি। নিজের চোখে এই প্রথম দেখছি, যোগদান, তুমি বিধান করে।

"জ্যেত্রা রায় তোমার শহিদী নার?"

"জ্যেত্রা রায় বলে কোনো ব্যাটা ছেলে আছে এই প্রথম গুলনলুম।"

"তুমি আমাকে অবাক করলে, মলিক।!"

"তুমি ও আমাকে!"

"তা হলে কি লোকটি মিষ্টার কি?"

"পাগলও হতে পারে।"

"চোর। মিষ্টার। পাগল। কোঠা ঠিক?"

"সব কটাই বোধ হয়।"

"না, ভাই, তুমি যাই বলে না কেন, ও চোর নয়। মিষ্টার হলে আস্থার হব, কেননা মিষ্টার বলে তার কোনো লাভ নেই। ইহ, পাগল হওয়া সম্ভব। এক রকম পাগল আছে তাদের বলে সেলাম পাগল। ভাই,
তাই হব।"

সমস্ত সমাধান যে এই সোজা ওতে অনৌত্থার রহস্যবোধ পীড়িত হলেও মনের ভার নেমে গেল। তিনি মলিকার কাছে মাক চাইলেন।

এর পরের দিন তিনি কাম পেতে বলে ধাকলেন কখন কাড় নড়ে, কখন পাগলটা আসে তার চশমা। নিয়ে। কিন্ত পাগলের নাম ভোলাল।। সেদিন সে এলোই না। তারপরের দিনও না। তার পরের দিন না। তাঁর দিনও না।

এমনি করে এক মাস কেটে গেল। অনৌত্থার তার প্রতিফলক করেন না, প্রতিশোধ নেয়ন। মলিকাও তার তাকে দেখতে পায় না পথে। পাগল কি তা হলে পাড়া বলল করল? তুমি জান, হয়তো পাগল গাঁকায় গেছে।

একদিন কিয় সত্যি সত্যি কড়া নড়ার আওয়াজ এলো। অবিকল সেই শব্দ। অনৌত্থার তখন প্রার্থনা ফেলে না, কিন্তু পাগল পাগল তাই তার সাংঘ করা হয়ে উঠল না। এলো চুলো, মধ্যা কাগড়েই তিনি তব ভর করে নেমে গেলেন। দরুণ খুলি দেখতেন, যা তেতেছিলেন।

"নমস্কার।"
"আর চাই চাইরের সময় আর নেই কাঁচের সময় এসেছে। রেড ইজিয়ানোর সময়ে মোগলের নাতিরা সোগ দিলে খানা খাইবে ছাড়বে। একমাত্র ভরা ইঁদুরের নোবল আর মার্কিনের বাহুবল।"

"তার মানে তুমি খাদীনাতা চাও না।"

"কবল বললুম ও কথা। খাদীনাতার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি।"

"আমি তো জানতুম তুমি বামপানী।"

"একশো বার। তার তুমি আত্মীয় চিকি গেলে অনি আওয়া হল মুনাফা ছেড়ে দেব। একবার বলে জীবন দিন।"

অনুতা দেখলেন তবে ফল নেই। বললেন, "বা ভালো মনে করো তা করল। কিন্তু ডিমিউ এর সাক্ষাৎ করলে যদি কোনো পতিকে পুলিশের হাতে পড়ে তা হলে বাড়ি নাপি হবে, যেন থেকে থাকে।"

তোলোর মুখে হেন পড়লে যা হয়। খাসনবিশ এটা হয়ে গেলেন।

"কই, চাওয়ায়। তখন থেকে অল ফুটচে তো ফুটচেই। এ কো রকম চন চাওয়ায়। নিয়ে এসো।"

"চায়ের সময় আছে তা হলে?"

"হ। আমার সময় ইয়ার্ক!"

"তা তুমি অতটা উত্তেজিত হবে জানলে আমি তোমাকে ও চাই পড়তে দিতুম না। আমার তো বেশ মঠ লাগে ভাবতে যে আবার আমরা মোগল রাজত্বে বাস করব। পড়ি যা খাসনবিশ সে তো আধা মুসলমান।"

"কাল থেকে আমি ওর বললে শর্মা লিখতে আরম্ভ করব। অবশেষ শর্মা কি নেহাত খাতিয়া শোনাই।"

"আমি কিন্তু মিহিস খাসনবিশ থেকে যাব। মিহিস শর্মা বেন মিহিস পুরুষ। বীভৎস শোনাই।"

খাসনবিশ কথা প্রকৃতিস্থ হলেন।

আলবামানাজার তার দীর্ঘ তার দুটি গোচর করেননি। রাতে এক সময় নদীকে দেখিয়ে বললেন, "এসব কার সাপক্ষত?"

"ওমা......" মঞ্জরী বেন মাটিতে মিষিয়ে গেল।

"আমার কাছে তোমার গোপন কিছু ছিল না বলেছ মানতুম। এখন দেখছি তুমি আমাকে বিখ্যাত কর না।"

"তোমার পায়ে পড়ি, বোঝী। তোমাকে আমি সত্যি কথাই বলেছি।"
আমি ওর নাম পর্যন্ত আমি। রাত্রি আঁট করে বলে, এক সেকেন্দ্র
ধারা রূপক রহিয়। এক সেকেন্দ্র। বাস। ওর মধ্যেই ওর ফোটা
তোলা হয়ে যায়। তার পরে আমি আচার পথে, ও ওর পথে। ফোটা
কেছ উঠল তাও কোনো দিন জিজ্ঞাসা করিনি। বাম্বালাহেই নেই।
নিজের ফোটা নিজের চোখে এই প্রথম দেখছি, বোধি, তুমি বিবাহ করে।

"জ্যোৎস্না রায় তোমার সহপাঠী নয়?"

"জ্যোৎস্না রায় বলে কোনো ব্যাটা ছুলে আছে এই প্রথম নূন্দুম।"

"তুমি আমাকে অস্বাভাব করলে, মন্দির।"

"তুমিও আমাকে।"

"তা হলে কি লোচটা মিথুনক?"

"পাগলও হতে পারে।"

"চোর। মিথুন। পাগল। কোষটা ঠিক?"

"সব কম্ভাই রোধ হয়।"

"না, ভাই, তুমি যাই বলো না কেন, ও চোর নয়। মিথুন হলে
আশ্চর্য হবে, কেননা মিথুন বলে তার কোনো লাভ নেই। ইঁ, পাগল হওয়া
সম্ভব। এক রকম পাগল আছে তাদের বলে সেদিন পাগল। ভাই,
ভাই হবে।"

সম্ভাব্য সমাধান যে এত সোজা ওতে অনুষ্ঠান রহস্যময় পীড়িত হলেও
মনের ভাব নেমে গেল। তিনি মন্দির কাছে যাক চাইলেন।

এর পরের দিন তিনি কান পেতে বলে পাগলেন কখন কভা নড়ে, কখন
পাগলটা আসে তার চশমাটা নিতে। কিন্তু পাগলের নাম ভোলা। সেদিন
সে এলোই না। তারপরের দিনও না। তার পরের দিন না, সেদিনও না।

এরিং করে এক মাস কেটে গেল। অনুষ্ঠান আর প্রাঁচিল করেন না,
প্রাতাশাও করেন না। মন্দিরাও আর তাকে দেখতে পাও না পাও। পাগল
কি তা হলে পাড়া বদল করল কে আনে, হয়তো পাগল এরদেই গেছে।

একদিন কিছু সত্য সত্য কভা না বাড়ির আওয়াল এলে। অবিকল সেই
শব্দ। অনুষ্ঠান তখন প্রশংসা ছিলেন না, কিন্তু পাগল পাগল পাগল তাই তাঁর
সাহি করা হয়ে উঠল না। এলে চুলে, ময়লা কাপড়েই তিনি তুমি তুমি করে
নেমে গেলেন। দরজা খুলে দেখেন, যা ভেবেছিলেন।

"নমস্কার।"
“নমস্কার। ভিতরে আসবেন না।”

“না। আমার সাহস হয় না। আমি তা হলে যাই।”

“সে কি! আপনার চশমা নেবেন না? পাড়ান, আমি এবং দিক্ষ।”

“চশমা আমি সেই দিনই পালঠেছি। ও আমি ইচ্ছে করেই কেলে গেছি অকেজো বলে।”

“তা বলে আপনার চশমা আমরা কেন রাখব? আপনি নিয়ে যা খুশি করব। আমন, ভিতর এসে এক মিনিট বসব।”

এক মিনিটের স্থলে বারো মিনিট হলে। বেশ ভালো করে সেজেজুড়ে অনেক যখন তামালেন তখন জ্যোঁতা একমাত্র সিগারেট ফুকছে। ছু' হাত গেছে চশমাটা নিল, নিয়ে মাথায় ঠেলাল।

“অকেজো বলছিলেন কেন জানতে পারি?”

“জানতে ভরসা হয় না। জানাল আমার কপালে কী আছে সেটা আপনি। কিন্তু আর কথা বাড়াব না। আমি বোধ হয় শীগগির কলকাতার বাইরে বাছি। নিকটে ফিরব না।”

“কোথায় যাওয়া হচ্ছে? রাড়ি নয় তে? 

“না, এখনে তর পাগল হইন। আপাতত এলাহাবাদ।”

“নেখানে তে—”

“না। সেখানে এ রকম পাগল আশ্চর্য পায় না, তেমন কোনো। আশ্চর্য নেই। কিন্তু সত্যিকার পাগল হলেই আমি নব চেয়ে খুশি হতুম। পাগলরাই ছাড়। তাদের কাছে বাপ যা কিছু প্রত্যাশা করেন না। তাদের দেহের উপর জলুম চলে, কিন্তু মনের উপর জোর খাটে না। ফেল যদি আমাকে নাটিকাই করে তো আজকেই রাড়ির টিকটিকে কিনতে রাজি।”

“হচ্ছি। ও কথা বলতে নেই। আমি অনন্ত কোনো ইচ্ছিত করিনি। কিন্তু বাম ওর বাণে কথা। এখন বলুন দেখি চশমা কেন অকেজা হলো?”

“কারণ চশমাটা অসুখীক্ষণ নয়। যদি কাউকে চু’ নয়ন ভরে দেখতে চাই দেখতে গাইনে। অক্ষের মতো। আকুপাকু করি।”

“এব আপনার বাণানো কথা। আচ্ছা, আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। আপনি কি এই সময়টা একটা আস্তু পান করেন?”

“আক্ষে না। আপনি তা হলে টের পেতেন। ধূমপান করি বটে, কিন্তু আপনি বোধ হয় সে অর্থে বলেন নি।”
হেয়ালি

"না, সে অর্থে নয়। তবে কি আমি বুঝব যে আপনি যা বলছেন তার নির্মলা সত্যি? জলমেশানো নয়?"

"চোথের জল মেশানো।"

"তবে বলি মজিফার এক রান কোটা তুললেন?"

"ছুয়ুম গুলে অন্তীতার এক লাখ তুলতে পারি। ক্যাশেরা এনেছি।" অনাত এককশ পরে তুমি বলতে গুল করলেন।

"আমি বুঝতে গেরেছি তুমি কী।"

"অনত পারি?"

"কথাটা ভালো নয়। কিন্তু আমি হয়তো তোমার বলবান লোকরাও। তুমি খুব কাঁটা করে বেড়াও। না।"

"তুমিও তুল বুঝলে, অনিতা।"

"তা হলে আমার অনেকে তুল বুঝেছে। কেমন?"

"আমার অনেকে? হা, তাই। কেমন, এবার হলে ধো? উটি।"

"উটে? একটা বোস। বলো আমাকে, কেন তোমার এমন বাঁধায়।"

"বধন বাকে ভালোবাসি তখন তাকে সত্যি সত্যি সত্যি ভালোবাসি। তিন সত্যি। বলতে চাইনে, কিন্তু বলতে বাধা হচ্ছে। বেই বলি অনিত গুনতে পাই কাঁটা করছি। হয়তো তাই। কিন্তু এখনো কাছে কোনো অনিত করিনি। তুমি যদি মনে করা আমার ভালোবাসাটা ভাল তবে আমি চুপ করে সহু করব। আর না।"

"কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছিনে। তুমি মজিফার সহপাতী কি না। তুমি বললে, হা। মজিফার বলল, না।"

"আমি মিথ্যা বলিনি।"

"তা হলে মজিফা মিথ্যা বলেছে।"

"তা তো আমিনে।"

"আমি এই রহস্য ভেঙে করতে চাই।"

"অনাতারে। এটা একটা রহস্যই নয়। এর চেয়ে চেয়ে বড় রহস্য রয়েছে, নীতা। মায়ের বলছ। আমি তো যাবার যুক্তি, পাঁচ মিনিট পরে আমাকে চাইলেও পাবে না। মিথ্যা বলে আমার কোনো ফির থেকে কোনো হবিষে নেই। তাই যা বলছি তা সত্যি বললে মনে রেখে।"

"ব্যাংন, তুমি কি আমাকে শান্তাতে চাও।"
“না। কি বস্তু কাদে তো আমার কাজ সার্ব্বক হবে।”
“ঝেকে হাও না কেন? বেতে বলেছ কে?”
“সে সব পারিবারিক ব্যাপার। থাক, আমি উঠি।”
“কাম কোরো, তোমাকে ক্ষুট করার অপবাদ দিয়েছি।”
“ও আমি গায়ে মাথিনে।”
“জ্যাঘা।”
“নীত।”
“আমার একটা অশুভেষ রাখে? মল্লিকাকে বিয়ে করবে?”
“বিয়ের কথা কেন। দিন মনে উন্মুক্ত হয়নি। বিয়ে করলে ভালোবাসার আমন্ত্রন থাকে না।”
“তা বললে চলবে কেন? বিয়ে না করে মাত্র বীচতে গায়ে না। আমার ভালোবাসাও সমাম বাছার। সম্ভবত চাই।”
“আমাকে দিয়ে হবে না। আমি অভ্যন্ত। চলি।”
“চলেল। আমার কথা দেখা হবে আজিনে। এই রীতি অভ্যাসন।”
অদীতা তার সোনার পিঠ ওয়াচ খুলে দিলেন। জ্যোত্যা অমনি তার সোনার হার খুলে পরিয়ে দিল।

একদিন মল্লিকা অদীতা আশ্চর্যপূর্বক সমুদ্রে শোনালেন। মল্লিকা অদীতাকে। উদ্দেশ্য, রহস্যময়। গোমর অন্ত চুক্তির একদিন কার্য নন, বিচরণ রহস্য নিরন্তরণ অন্ত প্রতিটি মূল্যমূল্য চক্ষু।

মল্লিকা বলল, “ও যে আমার কোটা চুক্তি নে প্রথু তোমার সঙ্গে ভাব করার আশায়। যখন প্রথু আমি ওকে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব না তখন সরাসরি তোমার কাছে ছাড়া চাইতে এলো। বোধি, তোমাকেই অদে ভালো লাগত, আমাকে নয়।”

“তা হলে আলবাম নিয়ে গেল কেন? নিয়ে গেল তো তোমার কোটা একে ফেরৎ দিল কেন? বেশ বোঝ। যায় ও চেয়েছিল কোটা গোলার তোমার চোখে পড়ে না, ভাই, আমি হলুম ছাড় কোলাম ভালো পড়ে, আমাকে অদে ভালো লাগার কথা নয়, কাজে নাগায়নের কথা।”

“কি যে বললে, বোধি। তোমার মতো রূপসী ও শুভতী ক্ষুণ্ণ? ও কেন আলবামধামে চারি করেছিল বলব? তোমার কোটা খুলে নিয়ে। নিয়েছেন। তুমি লস্ক করোনি।”
"হ্যা!"

"তুমি লক্ষ করোনি তা হলে। যেখানে যেখানে তোমার কোটা ছিল সেখানে সেখানে আমার কোটা বলিয়েছ। তা ছাড়া কোথাকার দিকটাতে আমার বহ কোটা এটেছ। তুমি অথবা সেই দিকটায় দেখেছ।"

অনীতা অপ্রত্যাশিত হলেন। আলবামটা বার করে সেখানে তার ফোটোগ্রাফি নেই। তা হলে ও চোর ঠিকই।

"চোর!" তিনি এর বেশী বলতে পারলেন না।

"চোর? না, চোর নয়। প্রেমিক।" মলিকা বলল।

"কিন্তু আমার সঙ্গে প্রেম করে ওর লাভ? বরং তোমার সঙ্গে বিয়ের আশা আছে।"

"তোমার বিখাসে লোকে একজনকেই ভালোবাসে ও বিয়ে করে।"

"সেইটেই তো উচিত।"

"না হওয়া উচিত তাই বুঝি হয়ে থাকে।"

"কী জানি, আমি অতি বুঝি। কিন্তু আমার মন বলে, ও তোমারই প্রেমিক। আমার নয়। সেদিন ওকে ছাড়া দিয়ে দিলেই চুকে যেত। গোটা কয়েক টাকা বাচাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত রিট গোয়াচাট। গেল।"

"কিন্তু হারটাও তো এলো।"

"কোনটা বেশী দামী? হারটা না রিট গোয়াচাট?"

"তুমি কি বেনের বেষে না বামনের? আমার মতে হারটায় দাম বেশী। ও তোমার পাণিদ্রেণ করতে পারেনি, তাই মাল্যাদান করেছে তোমাকে।"

"তোমার মরণ!"

"আমার মতে কৃষ্ণ এর মরণ বাচন যুদ্ধ সমাপ্ত।" মলিকার বলে উদাস ভাব। খাস বিলক্ষিত। চাউনিতে কুঁড়ার আভাস।

"আমাকে জমা করো, তাই মলিক। আমি তোমার প্রেমিককে চুরি করে নিনি। বিখাস করো, আমি ওর কাছে তোমার বিয়ের প্রস্তাব তুলেছিলুম।"

"ও কী বলছ, বৌদি। ও চোর, না তুমি চোর, এই ভেবে বুঝি আমার ঘৃণা হচ্ছে না? আমি ওকে বিয়ে করলে তো ও আমাকে বিয়ে করবে।"
"কেন, তুমি একে বিয়ে করবে না কেন শনি ?"

"ধাঁ। আমার যদি মনের মাঝখান পাবার অাশা থাকে ?"

"থাক পাওয়া উচিত তাই বুঝি পাওয়া যায় ?"

"তা বলে আমি তোমার প্রেমিককে বিয়ে করতে পারব না। হাই ফেলতে ভাঙ কুলো। চাও তো তোমার ছোট বোন অমিতা রয়েছে। এক বোনকে ভালোবাসবে, আরেক বোনকে বিয়ে করবে। এক ঠিক হিন্দ পাবি।"

"খাও, তোমার সাথে জন্মের মতো আড়ি।" অনোদা জীবন রাগ করলেন।

রাগ করে উঠে গেলেন।

বছরখানেক পরের কথা।

সিনিমায় নতুন বই এসেছে। ধাসনবীশ পাদু পেটে সপরিবারে বস্ত্র বদল করছেন। বইখানা যে মুসলমানের লেখা আর তারকারা যে বেশির ভাগ মুসলমান এ কথা বিখতে তুমি ভাবতে ফসল প্রভৃতি। তা সেই তোমার উৎসাহ লেখে ধাক্কা লাগে।

ইন্টারভ্যুলের সময় আবিষ্কার করা গেল পাশের বন্ধ তথ্য বিখতিত বস্ত্র রাখ ও কে একজন মহিলা। ধাসনবীশ বললেন, "আরে তুমি এখানে! তার পর..."

"আইন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। মিলতু থাকে ভটাচার্ড। মিলেলু নাটা—আই মীন, অনীতা—ধাসনবীশ। মিল মলিকা ধাসনবীশ। মিস্টার পি ধাসনবীশ। মিস্টার—"

"নির্ভর ধাসনবীশ।" অনীতা দেওয়ার বলল।

মহিলারা বসলেন ধাসনবীশের বন্ধ। আর ধাসনবীশ বললেন ভটাচার্ডের বন্ধ। খুব আড়া জমল। হো হো হাসির রোল উঠল। লিগারেটের মেলায় বাংলা ঠোলাটে হুলো। ছোট ছোট চেলেমেয়েদের কাশির আওয়াজ এলো।

"তারপর! ছবি কেমন লাগছে হে! নারিকে কেমন খুব হরৎ। অন্যরই যদি বলা। তো একার মধ্যেই আছে। আর আমাদের।!"

"আর আমাদের। শোকেই দেখছেন।!"

ভাগিদার এ সব কথা মহিলাদের কানে যায়নি। নইলে কুহকেঁকে
বাধ্য। সত্যমত্তা গৃহবিবাদ। তাঁর কাছে হিন্দু-মূসলিম সিভিল ওয়ার কিছু নয়।

ফেরবার পথে অনৌভা বললেন, “ওর নাম বললে না যে?"

“ওঃ! তাই তো। জলবর ভট্টাচার্যের ছেলে সুখ্ষ, আমার আপিসে কিছু দিন কাজ শিখত। ওরা মন কুলীন। বিয়ে করাই ওদের ব্যবসা। এখনো হবে গেলে বার বার বিয়ে করে।”

( ১৯৪৪ )
সবার উপর মারুষ সত্য

১

বৌদ্ধিক বললেন, “দেখুন তো ভাই তোমার দেশের ধারা। একটি ক্যান ধাও দুটি ভাব দাও।” বললেন লোক লোক মহারাজী প্রাণ বিসর্জন করল, বিশ্বব্যাপী দেশের জন্য নয়। এই মায়ের লোক সব জনে দেশের জন্যে বসতি তা হলে কি একটি বিলব—”

দাদা বললেন, “চূপ, চূপ, চূপ।” এই বললে তিনি জানালাগুলো বন্ধ করে ছিলেন। দিয়ে বিদ্যাতের পাখা খুললেন।

আমার গলা চেপে ধরেছিল কী একটি শক্তি। বন্ধ হয়ে আমার কেঁদে কুঠি দুর হল। না দেখে দাদা বললেন, “গরমে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। না?”

আমি বললুম, “কষ্ট হচ্ছে, কিছু গরমে নয়, অন্য কোনো কারণে।”

বৌদ্ধিক বললেন, “পুনর্তে পাই?”

আমি বললুম, “একটা গলা মনে পড়েছে। শোনাব?”

বৌদ্ধিক বললেন, “নিশ্চয়।”

দাদা তখন জানালাগুলো খুলে দিয়ে বললেন, “থাক, গলা! বাঁচা গেল।”

আমারও গলা খুলল।

২

আমি বৌদ্ধিকের কলেজে ভর্তি হই আমার সঙ্গে একই ক্লাসে ভর্তি হয়। বোধ হয়, তার ভালো নাম বিষয়-মোহন। প্রথম দিন থেকেই আমাদের বহি ভাবই। তার কারণ বেশ হয় এই যে আমরা চূর্ণনী সেকেন্দ্রিক ভিত্তিক পাশ করি অথচ আমাদের পাওনা ফার্সো ভিত্তিজন। চেয়ে বেশী।

তখন জোর অনহ্যের আসাখেল চলছিল, আমরা পড়াজন। কারিনি, পরীক্ষা দিয়েছিলেন উপরের উপরে। আমরা যে দেশের জন্য সেকেন্দ্রিক ভিত্তিজনের চুপকালী মেখেছি আমাদের এই ত্যাগে আর কেউ ধীর করেননা, কর্তব্য আমরা দুর্গন।
বিশ্ব আমাদের চুল্লারের পড়া ছিল ছুরিরকম। বোকু ছিল এক নবর্ত্তু আলোগনেশ, আমার আমি তো চিরকাল মুখচুরার। বোকু আমার কাছ থেকে কম সরে যেতে লাগল, আমিও তার অভাবে বিষম হলুদ নয়, কারণ আমাকে উচ্চ পড়া লেখে দেখে ভিত্তিহীন কালিমা কালন করতে হয়ছিল।

এক দিন আমি বোকু দেশপ্রেম ডাক তুলে প্রজ-মনেরে গেছে, তার মানে শীতকাল। নিজের জন্যে আমি লজ্জা বোধ করলুম, বোকুর জন্যে গর্ব।

এর পরে সে কলজে বাড়ি করল, আমিও তার সঙ্গে বদ্ধতার থেকে হারিয়ে কেললুম।

বিদেশে আমার আমাদের সেখানে। সেখানে তার আলোক মুখী। দেশের স্থল তখন তার চুল ছিল উষ্ণ খুশ্চি, চোখের ছিল ভাড়া চোখ, তাই পরে সে হ্রাস করে ধাপ ধরান। বয়স্কেরা আগে করে ভাঙ্গত, “বোকু বাউর” বলি নয় বাবু। পরে সোনিয়ের ভাগ সমৃদ্ধ লুলু আর করিত। ছত্তোই বছরের।

একটা টুপিও ছিল। ঠিক যেন পড়ে না। আমার বিদেশে সে পুরোনুষ্ঠ সাহেবে। সে স্থানে খেলার পোশাক পরে টেনিস খেলে যেত তখন তাকে ভারতবর্ষের কোনো রাজকুমার বলে কর হতে।

আমার তাকে হিংসা করতুম তার রাশি রাশি সাহেবে বদ্ধ দেখে। চাঁদক্কা পাইত যাই বলুন না কেন, বিধান সর্বসংগ পুজ্য পার না একালে। পার খেলোয়াড়।

আমার অধ্যায়ের উপরের বোকু বলত, “দেখ হে, আমি যে ওদের সঙ্গে এই মিশি তার কারণ কি এই যে ওদা ইংরেজ। না, ওদা মাহুষ। মাহুষের জাত শাদী, বীর সে জাতের চেয়ে বড়। ধর্ম আছে, কিন্তু সে ধর্মের চেয়ে বড়। রঙ আছে, কিন্তু সে রঙের চেয়ে বড়। একটা অবৈতনিক যখন আমার সামনে এসে হাড়ায় তখন আমার মনেই ধাক্কা না সে ইংরেজ আমি বাঙালী, সে কিঞ্চিত আমি হিন্দু। সে মাহুষ, আমি তাই। আর্থিক আমি কি তোমাদের সঙ্গে কর মিশি না।

সে কথা ঠিক। বোকু যে আমাদের উপরের করত তা নয়। ওর অপর পর ভেঙে ছিল না, আমাদের ছিল। আমারা তুলে চুল বুকতুম, বলতুম “বোকুটা বিদেশে এসে বকে গেছে, দেশব্রেক্যুম না হয়ে বিশ্বব্রেক্যুম হয়েছে।” সেখান হলে কেনিয়ে বলতুম, “কি হে ভিষেগ্রেম বিজ্ঞান, আছ কেমন?”

বোকু বলত, “হা হে, দেশব্রেক্যুম রায়। আছি ভাবো।”
বোকু ফিরল ব্যারিস্টার হয়ে, বলল পাটনায়। আমি ধাকি বাংলাদেশে, সেখা হয না। ভেবেছিলুম বোকু তেমনি সংহেব আছে, কিন্তু অবাক হলুদ বখন শনির সে আইন অমাত্য করে জেলে গেছে। এবার ওর জন্য পরে বোধ করলুম।

জেল থেকে বেরিয়ে বোকু যা পথার জমিয়ে তুলল তা প্রত্যাশিত নয়। পাটনা থেকে যায় অস্ত তায়। কলে বোকু শেষ চিত্রে নিয়েছে, নামে বোকু হলে কী হয। শুনতুম সে তেমনি দিলদারীয়া, তেমনি মিষ্টক। বিয়ে করেনি, বোঝার যা করে তা ছাড়াই ওড়ায়। তার বাড়িতে নানা জাতের নানা ধর্ষের লক্ষ শায় শোয় মাসের পর মাস কাটায়। কাউকে একবার গেলে সে ছাড়ে না। তা তিনি মহাস্তা গাছী হোন আর অন্য জিয়াহ হোন। ”আইসে হয়তো, তিনি ফেলে লাইনে।” এই ছিল অনেকত তার মুখে গেলে।

অর্থ পালিকৃতে সে ছিল বামপায়। এ কথা সে সত্যাগর্ভিত স্পষ্ট জানিয়ে দিত। তার সহকর্মীরা বেশ এলে বলত, ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যালিজম হচ্ছে ইন্ট্রয়ান ন্যাশনালিজমের চেয়ে বড়।

এমন যে বোকু তার এক অতি প্রিয় ইংরেজ বদ্ধ ছিলেন, নাম জেনিংস। তিনি লগনের এক বছরের কাগজে কাজ করতেন। বোকু তাকে বিলেব ছাড়বার আগে আমর্ন করে এসেছিল, পরেও আনেকবার এ দেশে অস্ত লিখেছিল। তিনি আসবার অবোধ পাননি। অবোধ গেলেন এই যুদ্ধের মাঝখানে।

কিন্তু সখন ভারতবর্ষ এলেন মীরামসার প্রত্যাহার নিয়ে জেনিংস এলেন বিশেষ সংবাদপত্র করে। তার পর কিন্তু বিদ্যায়ের পর এদেশে থেকে গেলেন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে। বোকু তাকে পাটনায় এনে পুরো পনেরো বিন ধরে রাখল। রাজনীতি সংস্কার তার নিজের বলবার ছিল অনেক।

পাটনা থেকে তিনি কলকাতা গেলেন, কলকাতা থেকে আরো করেক আরোগ্য। এর পরে পাটনায় ফিরলেন বোকুর কাছ থেকে বিদায় নিতে। এবার কিন্তু তার ওখানে উঠলেন না, উঠলেন এক ইংরেজের বাড়ি।

বোকু বলল, “কেন, বল তো হা?”
তিনি বললেন, “আমি কি বলতে বাধ্য হয়?”
বোকু বলল, “না, না, বাধ্য হবে কেন? কাজ নেই বলে।”
তিনি গাঁজিয়ে বললেন, “আমার দোষ নেই, কিন্তু কার দোষ তাও আমি বলব না। কিছু মনে করো না, বোঝু।”

“কিছু মনে করব না, ফিলু。”

তাদের সেখানের সমানে চলল। কিন্তু কোথায় যেন খচ খচ করছিল।

একদিন কথাবার্তায় ধরা পড়ল।

জেনিস্তু বললেন, “তোমাদের নেতারা যে খুখু ধরেছেন, ভারত থেকে চলে যাও, সত্যি যদি আমরা চলে যাই তখন কী হবে? আপানকে কুখ্যাবে কে?”

বোঝু বুঝিয়ে বলল, “আপানকে কুখ্যাব হলে সর্বপ্রথম চাই সার্জনমোচ।

নানা কারণে দেশের লোক সার্জন নিতে চায় না। যাতে তার। সার্জন নেত্র

নেতাদের দরকারী বার্তার হদ্দান্তর। ভারত থেকে চলে যাও বলতে

এইতেকুই বোঝায়। এর বেশি নয়।”

“বেশো তো, সার্জন নাও না। কিন্তু সার্জন পালন করতে পারবে? যদি

এত দোষাহি হতে। তবে চীন কেন নায়েদাহাল হলো?”

“তা হলেও একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?”

“ুলব একক্ষেপেনোমেনের সময় নেই, বোঝু। যারা সার্জন পালন করতে

আলে তাদের বিলায় দিয়ে তোমাদের নাতের মধ্যে হবে মতিন মান

আধীনতা, তার পরে শ’ হ’তিন বছর পরামর্শিন।”

বোঝু মনে মনে অলঙ্কিল। বলল, “কে জানে, হয়তো আমরা শ’ হ’তিন

বছর আধীন থেকে মনে পারি।”

“আমাদের বিনা সহায়তায়?”

“তোমাদের বিনা সহায়তায়।”

“নন্দর আমি ভেবেছিলুম তুমি একজন রিয়েলিস্ট।” তিনি রেখে

গেলেন। “চীনের তুলু চিয়াং কাইশেকের মতো সেনাপতি আছে।

তোমাদের কে আছে?”

বোঝু বলল, “গণশিক্ষিত নেহং।”

“ও সেই মহাকাশিত।” এমন স্বরে বললেন যেন কোনো এক টোলের

পশ্চিমের কথা হচ্ছে। অবকাশ স্বর।

বোঝু আর আশ্বস্তর করতে পারল না। বলে উঠল, “কই, কোনো

দিন তো আগুনি স্টালিন রণশিক্ষা করেছেন? তা সেবায় মার্শাল স্টালিন
গল্প

মার্শাল স্ট্যালিন বলে তাকে করেছে উপাসনা করছেন ধারা তারা কি একবার কুলিও জেনারেল নেহরু বলতে পারেন না?

"হা হাঁটা! জেনারেল নেহরুকুই!" জেনারেল নেহরু বললেন! "তা হলে এখানে হিন্দু পরাজিত। মাই চিত্তার বোকু, আমি কথা বলেছিলুম তৃমিতম একজন রিয়ালিস্ট।"

বোকু পাটা জিতে দিল, "মাই চিত্তার ফিল, আমি রিয়ালিস্ট করছি যে তৃমিতম একজন ইম্পোর্টারালিস্ট।"

হাতে হাত মিলিয়ে ফিলিপ বললেন, "মাক কোরো, যদি রুদ্ধ হয়ে থাকি। কিন্তু আমি বুঝতেই পারছি কী করে তোমরা আমাদের চেড়ে একটা দিনও বাচবে। সেই জন্য সন্ধেহ হয় যে তোমাদের মতলব আমাদের সঙ্গে রাখ করা।"

বোকু হাত ছাড়িয়ে দিল। তাছিলের ঘরে বলল, "গুড বাই।"

৩

কিছুদিন পরে আগস্ট মাস এল। ধরাপাকড় জুতু হলো। গ্রেঝার হলো বোকু ও। তারপরে যে সব ব্যাপার ঘটল তার বিবরণ দিয়ে কাজ নেই। মুখু বললে যথেষ্ট হবে যে আমাদের হাজারের বদ্ধ হয়ে গিয়ে জনতার হাতে নিউডলিরত হয় হলেন। এবং আরো কয়েকজন বদ্ধ আর একটু হলে সর্বসময়ে নিহত হতেন। সময় থেকে তারা এমন চট রয়েছে যে গাঁথার নাম জুনলে হিংসার গঠন পান ও কঠোরের নাম জুনলে বড়বশত্তের। তারা জেলে আছেন বললে তাঁরা নিশ্চিত অনুমানে অনুমানে তাকে একসময় তায় বলতে ছাড়া যে ঘটে মেটে ঘরে ফিরে আসাই হতো অস্বীকার।

বোকু তা ছাড়া পেয়ে বোকা বেন গেলে। করবার নেই কিছু, এমন সব বললে, "কিছু একটা করন, বোকু বাবা।"

বোকুর হলীর ভালোই ছিল, তবু কাগজে ছাড়িয়ে দিল যে অনেক রকম রোগ হয়েছে, হাওয়া। বদলের জন্যে হিমালয়ে যেতে হবে । যমমলদের চেয়ে হিমালয়ে চুপ। তাই তার অস্বীকার চুপ।

থানার অগ্নিগোল আজোজন চলছে এমন সময় তার অভিষিক্ত হলেন এক মুসলমান বদ্ধ আলি মাজান। তিনি থানার সরকারের কোন এক বিড়ালয়ের কাজ করেন, তারতম্য ঘুরে বেড়ান।
সবার উপর মানুষ সত্য

আলি বললেন অমৃত লোক বোকুর তেমনি। তিনি চার দিনের আর্ধগায় অটি দিন ধামলেন, সে দিন দিন পেছিয়ে দিতে লাগল। মনে হলো। মনে পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না, আজ্জা দিয়ে ও ধামলিপিনী করে তার আমুর পরিবর্ধন হবে।

কিন্তু ক্ষুব্ধ যন্ত্র। ঠিক এমন সময় গাছিরীর অনুশীলন করলেন। অন্য বোকুরও অনেক অর্ধে এলে। উদীয়দী আলি অমৃত তুলে বিষ্ণুরায়ে বলে ধামলেন। গাছিরীর উপরে উনি যে খুব প্রসন্ন ছিলেন তা নয়, কিন্তু গাছিরী চলে যায়, ভারতবর্ষ ধাকে, একটা কলনা করতেই ওরা চোখে অন্য আলে। বোকুর বললেন, "তবেই সোহ কর, আমরা কি তাকে ছেড়ে ধাকে পারি?"

খালাসের হক্য যখন হলো না। তখন বোকু ভেঙে পড়ল অবাধারিত মুসলমানকে। উদীয়দী কেন সচেতন করেছে যে গাছিরী ধনকেলের মিঠা, অনিলদের কেউ নয়। আর আলি তার বোকুর কেলে পাটনা থেকে প্রশংসা করলেন না। ওকে সঙ্গে সেবার জন্যে আরও কিছু দিন ধামলেন।

তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে ধুমোলাপার করলেন বোকুর চেয়ে অনেক বেশী। একটি নিগায়েট এক ঘটনা হয়তো। কিন্তু এটা সংশয় যা বললেন তাতে বোকুর পিলে চল কাল।

"পাকিস্তান। পাকিস্তান ছাড়া উপায় নেই, ইয়ার।"

"ও কথা কি করে আলে?"

"কু করে আলে? আজ যদি হিন্দু মুসলমান এক ধাক্যে বলত, গাছিরীর মুখে চাই, তা হলে তাকে বেঁধে রাখত কার এত সাধ?"

"বলে না কেন তবে?"

"কেন বলবে? পাকিস্তানে পেলে তা বলবে?"

বোকু তো। হতবাকু।

"তুমি বোঝ হয় ভাবছ মুসলমানরা এমন ঢুকিলেও দর হারে। কিন্তু কুলে দেয়া না, তোমাদের ইংরেজের ঢুকিলে দর হইকেছিলে ভারত থেকে চলে যাও। পালিটকুসের দলের এই। কী করা যায়?"

বোকু বলল, "পালিটকুসের কী বোঝ। আমরা দর হইকেছিল না দেশকে বেঁচে চেয়েছি তার উত্তর দেবে ইতিহাস।"

তর্ক বেঁধে গেল। আলি বললেন, "ইয়ে বড়ো আমাদেরকে বাত। গাছি
বরে যাবেন তবু আমাদের পাকিস্তান দিয়ে যাবেন না, এমন সে। কী করে হিন্দু মুসলমান এক হবে, কী করে ইংরেজদের ভাঙবে। মুখকে তে। মালুম হোতা তৈ কি আমাদিকে কবধি নেহি মিলেগি।

“কিন্তু পাকিস্তান নিয়ে তোমরা রাখবে কেমন করে? আমাদীর। যদি এক দিক থেকে আগে, অর রাশিয়ার। আরেক দিক থেকে?”

“হাসালে ইয়ার!” বলে হো হো। করে হেসে উঠলেন, “হিন্দু মুসলমানে যদি মেল থাকে তবে তোমাদের সিপাহী আমাদের জন্যে লড়বে, বেশন মার্কিন সিপাহী লড়তে হবে ইংরেজদের জন্য। মার্কিনরা যদি উত্তর আফ্রিকার লড়তে পারে হিন্দুর ও পারবে বেলুচিস্তানে ও আগামে।”

বোঝে বলল, “তা থিক। কিছু দেশটাকে ছ’ভাগ করলে হিন্দুদের দিলে অথাম হবে। লড়তে ওদের জোর থাকলে তে। লড়তে? তোমরা আমাদের মীল, আনা না ইয়ার।”

তখন বললেন, “তা হো গাংহাজীকে বাচাতে পারা যাবে না, আজাদীরও আজি নেই।”

এবার বোঝে পন্থভঙ্গ করল জেনিংস যা বলেছিলেন তার। “সাই দ্বিতীয় আলি, ভেবেছিলুম তুমি একজন রিয়ালিস্ট।”

আলি উতর দিলেন, “তুমি দেখছি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার লিভিংস হিন্দু ইন্ডিয়ার লিভিংস।”

বোঝে এইচ। করল সাফার মতো কেলে বলতে, “না ধরণী, বিধা হও।” কিন্তু সে একটি কথা কইল না। কথা কওয়া বস্ত করে ছিল।

বোঝে যে সময় আলমোড়া যায় তার মান করেক পরে অথিও। এবং তার কাছে দেইখানেই শোনা। হাতে বিশেষ কোনো কাজ ছিল না। আমারও ছুটি। বোঝেকে একদিন জিজ্ঞাসা করলুক, “আচ্ছা, তার, এখনো কি তুমি বিখ্যাত করে। যে মায়ণ্ড তার আত্মীয়ের চেয়ে বড়, তার ধর্মের চেয়ে?”

“বিখ্যাত করতে চাই। কিন্তু করতে দেয় কের?” বোঝে কৃষ ঘরে বলল।

“মায়ণ্ড বলে যাবের ভালোবাসেন তাদের একজন ম্যান নয়, ইন্ডিয়ান। আরেকজন ম্যান নয়, মুসলমান।” এই বলে সে মুখের পড়ল।
আমার গল্প শেষ হলে বৌদ্ধিকি বললেন, “সত্যি আমার মনে হয় স্বাধীনতা কোনো দিন মিলবে না। নইলে এত বড় মহৎস্ব মাধ্যম উপর দিয়ে যায়, আমরা যে অসহায়কে সে অসহায়।”

দাদা বললেন, “চুপ।” তিনি জানালার দিকে তাকালেন। তার টিকটিকে বড় ভয়।

আমি বললুম “বৌদ্ধিকি, কোনটা বড় ট্যাজেটি বলতে পারে? মহৎস্ব, না মানস্ত্র?”

“নিশ্চয় মহৎস্ব।”

“না, বৌদ্ধিকি। পাঁচ কোটি ইংরেজি আর দশ কোটি মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর মন মিলছে না। কোনো দিন মিলবে তার লক্ষণ দেখছিনে। ঠিক এমনি মনান্তর থেকে এসেছে এই মূল্য। বিশ বছর ধরে খোঁচাতে খোঁচাতে আগন জলে উঠল একদিন। কবি নিবেদ তাও আনন্দে। একটা নিবেদন নিশ্চিত নেই, বৌদ্ধিকি। আরেকটার পুর্বাভাস দেখছি।”

দাদা শিউরে উঠলেন। বৌদ্ধিকি বললেন, “তুমিও যেমন।”

“থাক, বৌদ্ধিকি। আপনাদের স্বাধীনতা বাদ মানব না। কিন্তু আমার বহুল স্বাধীনতা ভেঙেছে। সে এখন প্রাক্টিসে মন দিয়েছে বটে, কিন্তু তুলতে পারছে না যে মানুষ কোথাও নেই। আছে আধুনিক ইলিশমান, মুসলমান, জার্মান, জাপান, বার্মান। কোনটা বড় ট্যাজেটি? মানুষের অন্ধকার না মানুষগুলোর মৃত্যু?”

(১৯৪৪)
হ্যালন সহী

ক্লাসের ধারা ডাকসাইটে দম্ভ ছেলে, পড়া বলতে পারে না, বেজিত উপর ধাড়াই, তারা বাসে পিছনের সাধিত। একশিন তাদের রাজা স্বর্ণমোহন এসে আমার বললে, "আঁজ থেকে তুমি হলে আমাদের মশান। আমাদের সঙ্গে সবকিছু, খাতা দেখতে দেবে, প্রস্তুত করবে। কেমন, রাজা?"

আমি নবাগত, আমার ছেলেবেলার ইতিহাস থেকে নাম কাটিয়ে পুরী কোল। কুকুরকে চিনিন বললে হয়তো তুলি বলা হবে, কারণ আমার এক দুর্বল সম্পর্কের দালা। আমার সঙ্গাঠ, তারই কাছে বসে ও তারই সঙ্গে বেঁধাই। এমন যে আমি, সেই আমাকেই কিনা মশান মনোনয়ন করলেন নেই কেন্দ্র লাট স্বর্ণমোহন ছোট্রায়।

জনস্বাদ তাদের নামাস্ত্য কাজ নেই। ফুটবল খেলায় সময় ফাউল করে পা ভেঙে দেওয়া তাদের নিয়ম কর্ম। সম্ভাব্য অবস্থায় ল্যাঙ মারা ও গলির মধ্যে অবস্থান হওয়া তাদের অভয়। আমার দিঘি ফুটবল খেলার ব্যবসা ছিল না, সমৃদ্ধির থেকে বাসায় ফিরিয়ে প্রায়ই অবস্থান হতো। বাড়ি ছিল গলির ভিতরে, স্বত্রাঙ্গ ভেজে হেঁসে ছিল। আমি আর কথা কাটাকাটি না করে পিছনের সাধিত মুখ ঢাকলুম।

এই ঘটনা যে কেউ লক্ষ করবে অতটা আমি মনোনয়ন। আমি অপরিচিত স্বপ্ন ব্যাক্তি, কে-ই বা আমাকে চেনে। কিন্তু স্বপ্ন করে পরে আমাদের ইংরেজীর মাস্টার কেশব্বাবু আমাকে অপরিচিত অপমান করলেন আমি বাণাপ ছেলেদের একজন বলে। তার পর কী মনে করে আমাকে কাছে নিয়ে বললেন, "If you want to be a good boy follow my Nilu."

কেশব্বাবুর ছেলে নীলাঙ্গি পড়ত আমাদেরই ক্লাসে, বসত সামনের সাধিত। সত্যিকারের ভালো ছেলে, ফাঁটি নেকে হতো। আমি তার সঙ্গে আঁজারের চেষ্টা করিনি, সেখানে আমার সঙ্গে না। আমি লাঙ্গ্য, সে অহংকার। অন্যতম থেকে তাই বলে। তার বাড়ি যখন এত মানুষের গুণ্ডানে আমাকে অপমান করে গেলেন তখন আমিও আমার মুখরক্ষার জন্যে তার কথাগুলির অব অর্থ করলুম। আমার হুঁচু ছেলের দলটিকে মনোনয়ন।
হাসন সদ্ধী

দিনুম, “ওহে মাস্তার মশাই কি করতে বললেন তুমনি। নীলুঠোক ফলে। করতে হবে। তার মানে, নীলু যখন খেলি যাচাই তোমারও তখন সেই দিকে যাবে। কিন্তু কবরদার, নীলু যেন টেন না পায়।”

সে দিন থেকে আমাদের মত হলো, নীলুঠোক ফলে। করে। আমার
তোটার উপর নীলুঠোক ফলে। তখন উচ্ছাস করতে, ফলে। মাই নীলু।

তখন ঠাহর হরিনি এর পরিস্থিতা কি হতে পারে। এক দিন আমাদের
দলের দীর্ঘকাল এলে আমার কানে কানে বললে, “আমি, ও কোথায় যায়?”

“কোথায়?”

“কাউকে বলিনন। সময়ের ধারে একটা ছোট দোকান। বাড়ি আছে, চক্রবৃত্তের দিকে। সেখানে রোজ বিকেল বেলা নীলু গিয়ে কাছের সঙ্গে
আড়া দেয়, অনবি?”

“কাছের সঙ্গে?”

“মেয়েদের সঙ্গে।”

ডিভেটিভ বাই পড়েও আমি এখন রোষাকৃত হইনি। সেখান আমার
সুচি করলে দিনুরার লোককে তোলে বললে, আহ। নীলু কেমন ভালো।
ফলে দেখলেন তো আপনারা। ফলে মাই নীলু।

মেয়েদের উল্লেখ ধরে আমি আমার মুখ্যাতিকে কথাসাধা সাথু সম্প্রদায়ের
মত। করে বললুম, “আমরা বাই চেলে বলে বিশ্ব হচ্ছে নই।
আমাদের অন্ধকার শাবারী বিবেকানন্দ, আমরা কি করলে। মেয়েদের সঙ্গে
মিশতে পারি।”

বাই বললে, “মেয়ে পুরা থাক, ওলের কাছে বেঁচেই আমার বুক ধুরপুক
করে। একটু মেয়ে বেঁচে নিচে নামল আমি সিলুম ভেল। পোড়। নীলুর,
যাই বল, সাহস আছে।”

আমি সেদিন আমার করলুম যে আমরা বুঝেই সমান ভঙ্গ। সেদিন
আমি তৈরি হইনি বাই। আগলে আমরা নীলুর অন্ধকার করতে গেলে বাই।
দিনুরার লোকের চোখে ধুলো। দিয়ে আমরা হই ভঙ্গ সম্প্রদায় নীলুর পিঠে
নিলুম। বুক ধুরপুক করলে বেঁচে চুঁচেনেই, বিশ্ব মেয়েদের জোর নয়, তাদের
অভিভাবকদের ভয়ে। মুখে বোলাচাল দিলিলুম, “নীলুঠোক কে বিজে দিতে
হবে।” কিন্তু অমন্তরা আবেদন যা মনে মনে বলছিলুম। “এই ধরা পড়ি
তখন?” তখন অবশ্য ভেল। পোড়।
গল্প

বাড়িটার নাম 'উমিয়ুমবর'। ছোট গোতলা বাড়ি। ফিকে নীল রং। সমুদ্রের হাওয়া ছিল সমুদ্রের ধনন। বাড়িটা সার্বভৌমনাম।

আমরা ওর পাশে বিচ্ছিন্ন কুঠিতে বালু খুঁজতে আরম্ভ করে দিলুম ওটি করেক অচেনা শিওর সঙ্গে ভাব করে। নজর রাখলুম নীলুর উপর। নীলু বখন গোতালয় পেচা তখন হাসির হরা। উঠল তাকে দেখে, না তার গোপাল দেখি, না কী দেখেত তা বোঝা গেল না। নীলুও সে হাসিয়ে বোঝ দিলে। আমাদের কানে আসতে লাগল, হার হার। হো হো। হি হি।

নীলুকে যে এমন বাঁধ তা কে জানত। মেয়েদের সঙ্গে সমানে চাল দেয়। কখনো হাসে, কখনো গায়, কখনো খুননাটি করে। আমরা অত্যন্ত গেলুম ওরা গুকে ফ্রূটুম বলে ভাবলে। নামের কী ছিনি। ফ্রুটুম! নীলুর কিন্তু তাতেই আনন্দ। সে পেঁচার মতো আওয়াজ করলে, পুরুষ হরে হরে হরে...৷

দীঘি বললে, "থেকে থেকে আওয়াজ করলে বলে অমন শোণাচ্ছে।"

আমি বললুম, "বুলেডি, বাবার লোভেই ছোড়া। রোজ্জ এবারে আসে।"

নীলু যে একজন ভাগ্যবান পুরুষ এ বিষয়ে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল না। না জানি কী ভালোমন্দ ধার, আমরা তো পাইনে। এতগুলো মেয়ে মিলে রেখে থেকে থাকতে যাতে। হয়তো চপ কাটলেট কিম আমলেট। কী বলে শুকে। পুড়িত। হয়তো চকেটেট টর্ক লজ্জ থেকে দেয়, আইসকোম লেয়েনত সীরাগ।

আমরা ইত্যাদি করলুম নীলুর বাবাকে জানাতে হবে সে কুসংসর্গে মিষ্টিছে।

আমাদের দলের টাইগারের উপর সে ভাব পড়ল। ওর মতো ঠাট্টি কাটা বেহায়। খুব কম দেখা যায়। মাথাবর্ত্তের গায়ে পড়ে ঝড় বাধাল, বিশ্বে পালাগালে দেয়। ওর মুখে কিছু আটকায় না। গুরু লাঘু ধ্বংস নেই।

টাইগার একদিন মাস্টার মশায়ের পা মাধ্যমে দিয়ে ঘটা কর পায়ের খুলো নিলে। তারপর বললে, "এবার থেকে নীলুরও পায়ের খুলা নেবো। প্রাপ। সে আমাদের চেয়ে অনেক উচুতে।"

"কেন হে?"

"সে গাছের ভালে বিচরণ করে, নাম তার ফ্রূটুম। একটি নয়, তুটি নয়, অনেকগুলি পেঁচায় তার সহচরিণী।"

মাস্টার যোগ হতবাক। তারপরে টাইগারের কানটা নিজের মুখের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "ভালো। করে বোঝ নিলে জানবে যে নীলু যার একটি
রুগ্ণ মেয়েকে একটিওয়ানি অনন্ত দিতে। মেয়েটির বন্ধা, বীচে কিনা সম্প্রে। সহচারিত যাদের বলছ ডাকেরও ওই কর্তব্য। সহচরও আছে। সব আর ঘরের চেলে, ভুল ঘরের মেয়ে। তোমাদের মতো ইতর নয়।”

এর পরে আমি নীলুর সঙ্গে যেতে আলাপ করি। সে একটি বন্ধা বোঝাকে একটিওয়ানি অনন্ত দিতে যায়, ব্যবহার সঙ্গে, লোক হাসায়। এতে আমি তার মহবুবের পরিচয় পেলুম। তাকে খুলে বললুম সম্ভব, যাক চাইলে। নিজের মুল চেলে সামনের সারিতে বসতে লাগলুম তার পাশে। ইতিমধ্যে নেই পেয়েছিল আমার বিষ্টার পরিচয়। মাস্তার মশায় আমার খাবা। দেখে তাকে নাকি বলছিলেন যে ছোকরার টাইল আছে।

অবশেষে সেই অনিবার্য দিনটি এলো। সেদিন নীলু আমাকে তার অনুসরণ করতে বললে উদ্ভিদকরের মোকালায়। সেখানে একাধিক ইতীহাস চেয়ার ভাঙ্গা। তাতে ঠিক দিয়ে বসেছিল বলো চোখের আমাদেরই বয়সের একটি বিশ্ব রূপে মেয়ে। নীলু বললে, “এ আমার হাসন সবী।” মেয়েটি একটি হাসল।

“সব আমি এর ভুঁতুম।”

“তোমার নাম কি বুঝু।” প্রথম আলাপেই প্রথম করল মেয়েটি। আমি বলতে যাচ্ছি আমার নাম, কিন্তু চোখ টিপল নীলু। তখন আমি উপর করলুম, “হা, ভাই, আমার নাম বুঝু।” সে যখন আমাকে ভুঁতুম বলছে আমিও কেন তাকে ভুঁতুম বলব না? স্বাহালুম, “ভুঁতুম বুঝ ঠাকুরার বুঁলিনী পড়তে ভালোবাসে।”

“ভালোবাসি। সব চেয়ে ভালো লাগে কিছুমালার কাহিনী। আমি যেন কিরিমনাল। আর তোমরা যেন অনুর বর্ণ। তোমরা যেন চোখ এক পুরী বানালে মর্যাদা পাড়ের। আর আমি তাকে সাজালুম যত রাজ্যের মণি মাণিক্যে দিয়ে। তবু কিনের যেন অভাব। তাই তোমাদের বললুম, যাঁক তোমরা, নিয়ে এসে। সেই সৌনার পাথি আর সেই মুক্তি ঝস্যার জল।”

মেয়েটির আসল নাম চাপ। এক কালে ওর গায়ের রং চাপার মতো ছিল, এখন শুকিয়ে কালো হয়ে আসছে। মুখে এক একার মাদকতা, বা মদরতা। নেশা লাগে ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ ধাকদাক। সেদিন তাকে খুব হড়মাড়তা নয়, কিন্তু তম্ম্য হয়ে কথা বলে তখন মনের সৌন্দর্য এখন অস্ত্র সৌন্দর্য হয়।

সেদিন ওদের ঘুমান থেকে যখন ফিরলুম তখন চোখে আমার জল।

নীলু লাঞ্চ করল। বললে, “কাচাহিস নাকি ?”
"কাশ্ব না তো কি? হাসব? আমি কি তোর মতো গাছাণ?
"
"আমি যে হাসি তা গাছাণ বলে নয়। হাসি ওকে হাসাতে।"
"ওকে হাসাতে চাইলেও আমি হাসাতে পারব না। এ কি হাসির কথা যে একটি ছবির ফুল দিন দিন টিকিয়ে যাচ্ছে! হায় ভগবান, কেন আমাদের এত অক্ষর করে সংগ্রহ করলে! কেন, কেন, ওগো৷ একটিবার বল দাও কেন আমরা পারব না ওকে মুক্তা ঝরার জল দিয়ে ফুটাতে।"

নীলু ঘুষু বললে, "মানচি তোর স্টাইল আছে।"

ধনু বেলনের আমি একথা হাতাকিছে তখন তেমন ছিলুম না। তখন ছিলুম উজঙ্গাসপারাই ও অরসিক। তোমরা যে সেগুলি ফিলুম আর ও মুখো হলুম না। নীলু ঝালে চোখের জল মুক্তি। বলিলু, "যেদিন পারব ওকে মুক্তা ঝরার জল এবে দিয়ে মেজে যাব। তার আগে নয়।"

নীলু হাসিয়ে হাসিয়ে বললে, "বুঝেছি। প্রথম দর্শনেই গ্রেম। স্বীয় ধর্শনের আর্থিক হতে। বিষয়ের সাধা থাকলে।"

আমি তাকে তাড়া করে যাই। ভাবি, নীলুটা এমন নীরেট।

পূরীতি আরো। কিছু কাল থাকলে হয়তো। অবাল বেলুম, কিন্তু যে করণেই হোক আমাকে আবার নাম লেখাতে হলো। আমার চেলেবেলার ইস্তেল। পূরী থেকে বিদায় নিলুম অকালে।

এখান চার বছর পরে পটা কল্লের উত্তর ঘর ধারে বেড়ালো এমন সময় নীলুর সঙ্গে মুখোমুখি। উন্নয়ন সে পটা ইরিনীয়ারিং ছুলে পড়ে, গোভরিয়ার হয়ে বেয়েছে। তার বাবা হঠাৎ মারা যান, তাই কল্লে পড়বার সাথ থাকলেও সাথে ছিল না।

নীলু বললে, "তোর চেহারার তো বিশেষ পরিবর্তন দেখছি। তোর ভাবটি কি তেমনি আছে? কথায় কথায় কাম।"

"তোর শরীরটি তো। বেশ বোঁটার মতো হয়েছে। ভাবটি কি তেমনি আছে? কথায় কথায় হাসি!"

এর থেকে হাসন সিমীর প্রসঙ্গ। নীলু বললে, "বেঝে আছে। তার চেহারে বড় কথা, ভালো আছে। বিষয়ের কথাবার্তা চলেছে।"

"বলিস কি! এত দূর!" আমি আশ্চর্য হলুম। "আমি তবাছি এ অসম্ভব সত্য হলো। কি করব? কে তাকে এনে বিলে মুক্তা ঝরার জল?
ছুই, নীলু? না আর কেউ?"
নীলু আমাকে তার হোটেলে ধরে নিয়ে গেল। খেতে দিলে পাটনায় অমুতি আঁট পালি অংশটি ঠেকায়। যাক, চাটু আঁট লম্বা খেতে দেয়নি, এই দেয়। ও নাকি নিজে তাই খেতে খেতে চেহারা ফিরিয়েছে। পাশেই কোন এক মহাবীরগড়ের আধ্বারের ভাজি খুলে চেলে, নাতার কাটে গম্ভীর।

সে কিছুতেই বাইকার করলে না যে তার সবই সেরে উঠেছে তার অনন্য বসায়ন। বললে, "হু বছরের উপর আমি পাটনায়, ঠাপা দেখেছে। ছুটির সময় দেখা হয় অন্য কয়েক দিনের জন্ত। কাজেই আমার কৃতিব কোনোটার! আমিনে আর কেউ আছে কিনা ওখানে।"

পাটনায় নীলুর পড়া শেষ হয়ে গেল আমার আগে, যাবার আগে সে আমাকে খবর দিয়ে গেল যে ঠাপা বিবাহ হয়েছে কলকাতার এক ভাকুরের সঙ্গে। বললে, "ও! কী ভাবনা ছিল ওর জন্ত আমার। ভাকুর ওরা বড়ে গ্রামে। ও বাচবে বয়সকাল। চির কাল বাচবে ও। ভাকুর ঠিক বাচবে ওকে। ঠাপকে যোগ হয় বলিনি যে ভাকুরটি প্রশ্ন ও প্রশংস। হী, দোজ্জব।"

আমি বললাম, "নীলু, মুক্তি বারান্দার জল ভাকুরের ভাষায় মেলে না। মানুষের যে ঢাবায় নে ভাকুর নয়। আমি নিচুতি হত্তুম, যদি তোদের সঙ্গে ওর বিয়ে হতো। হাসিচিনো যে। তোদের না হয় অর্থ নেই, কিন্তু ভালোবাসা তো আছে। টুই কিনে অযোগ থনি?"

"শব্দে, নীলু আমার ঢু’হাত ধরে আমার ঢু’চাকে ঢোকার রেখে বললে, "তুই বিবাহ, টুই কবি। কিন্তু বিদ্যমান নস। কখনো ভালোবাসা ছিল না নেনে। যদি কোনো মিন বাসিন তা হলে দেখবি তুর্কম ভালোবাসা আছে। সখার সঙ্গে সখার। প্রিয়দর্শনের সঙ্গে প্রিয়দর্শন। ঠাপা সঙ্গে আমার ভালোবাসা। বিদ্যায় পর্যায়ের নয়, কোনো মিন ছিল না, তুই তুই বুঝেছি নি।"

"বুঝেছি।" আমি যেন কত বড় একটি অবিচার করলাম। "তোরা ছিল এক হিসাবে ভাইবোন। কেমন, ভিক্ষ হচ্ছিনি কি।"

"না, ভিক্ষ নাল, বেঁটিক। ভাইবোনের ভালোবাসা অন্য ছিলেন। ঠাপায় আমি বোন বলে ভাবতে পারিনে। ও আমার সবই, সহস, সহেলী। এই যেমন তোর সঙ্গে আমার সবই তোমরা ওর সঙ্গেও। তুই কি আমার ভাই? ভাইয়ের কাছে কি সব কথা বলা যায়? তুই আমার নন্দ, তাই তোর কাছে আমার মুকোবার কিছু নেই। তোমরা ঠাপার কাছে।"
“কালিয়ারা তো গৃহিণীকেই সবই বলে গেছেন। তা হলে টাপা কেন তোর গৃহিণী হতে পারে না, বল আমাকে!” আমি চেপে ধরলুম।

“গৃহিণী হয়তো সবই হতে পারে, কিন্তু সবই হতে পারে না গৃহিণী। কেউ যদি চোর করে আমাদের বিয়ে দেয় তা। হলেও আমরা আমার তামাকীন হব না। যদি হয় তা হলে আমাদের মুখের হাসি থেকে মিলিয়ে যাবে।”

বছর পাঁচ ছয় পরে আমি বিয়ের থেকে ফিরেছি, উঠেছি কলকাতায় এক বিখ্যাত হোটেলে। ওরা আমার নাম খবরের কাগজে ছাপিয়েছে। ফলে অনেকেই যেতে করে আসছেন আমাকে সেখানে। বেহায়া এক রাশ কার্টন নিয়ে এলে। তাদের একখানার পিঠে টাপা ছিল “নৌকালিনিতাঁ মনু”। মাটিন এগুলো কোম্পানী।” পায়ে চিনতে না পারি সেই জন্যে কালি দিয়ে লেখা ছিল “নৌকা”।

নৌকা! আমার বাণ্ড বদু নৌকা! সেই নৌকা কলকাতায়, মাটিন কোম্পানীতে। নৌকাকেই অভ্যর্তনা করলুম সকলের আগে।

খাটো শাঁট খাটো প্যাট পরা এক লোহ মানব আমার সঙ্গে হাগুলেখ করল না পাপা করল। আমি শিউরে উঠে বললুম, “আঃ ছেড়ে দে, ভাই। লাগে।”

“হঃ! বাংলা মনে আছে। আমি পথে করে দেখেছিলুম, বাংলা বেরিয়ে আসে, না ইংরেজি।”

জনলুম চাকরিতে বেশ উন্নতি করেছ, মাইনে পাছে ইন্ডিয়ানরের সমান। বললে, “সময়ে এক দিন পাইনে। এই যে তোকে দেখতে এসেছি এ অনেক কাটে। চাপার ওখানে তোর নিম্নু, আমি তোকে ভ্রাতুষ্পদ করে নিয়ে যাব সাধ্যাতীত পরে। তোর মধ্যে কি আছে, না, না, অথবা এখন আছে, ও কথা জন্ম না। ক্যান্সেল ইট। টাপা একবারের অধিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তোকে দেখতে। ওঃ, কত কাল পরে। তোপঁকি তেমনি আছিস। তোর মন্ত্রনটিও কি তেমনি আছে?“

আমি জানতে চাইলুম টাপা কেমন আছে, বিয়ে হওয়ের হয়েছে কিনা, চেলেমেয়ে কি, নৌকা কি বিয়ে হয়েছে, ইতাদি। উত্তর পরিলম, নৌকা কোঁচ চাপার সঙ্গে অত মাথায়মাথি পছন্দ করেন না, তাই চাপার সঙ্গে নৌকার কথা দেখা হয়। ছলিয়ে আমার ভাস্কার সাহেবেরও সেই মনোভাব, তিনি নৌকাকে এখন দেন না। এসব বাণ্ডাবিয়ে সঙ্গে তাদের বক্তা অবিকল তেমনি রয়েছে। নৌকা একটি ছেলে, চাপার সঙ্গান হয়।
হাসন সবুজ  

নীলু এক নিম্নাঞ্চলে বস্থায় দিয়ে এক দৌড়ে প্রশ্ন করলে। সময় নেই নেই নেই। সময় পর কথা রাখলে। এর নিজের মোটের করে আমাকে পৌঁছান ছিলে বিষয়ের বোঝাটে। বক্তর সেন আমাকে সাধারণ সন্ত্রাস করে তাই হিরুক কাছে নিয়ে গেলেন। তাই হিরুকের কাছে ছিলেন আমরা কয়েকটি তাঙ্গী। শুনলুম তাকে এসেই মিশ। কাউ ও বাড়ির, কাউ পাশের বাড়ির। বাড়ি মানে ক্লাড। আমার কিংবা নজর ছিল না আর কারো প্রিটি। আমার মূল্যের সবটা কুড়েছিল চিপা। আমাদের হাসন সবুজ। আমাদের ফিরে আসুন। আমাদের হাসন সবুজ বাহাদুর।

চাপার গায়ের রং আমার চাপাচুলের মতো হয়েছে, ভরষ্ট বেঁধে, স্থায় গড়ন। কেবল তার চোখ হুঠিতে বর্ণ কালের ক্লাড। স্থায় কালের নিরাপত।

“তার পর, বৃষ্টি তোমাকে বৃষ্টি বলে ভালোকে কমা। করবে তো? তুমি বলব না আপনি বলব?” সে হাসল। কী তরঙ্গ হাসি। সে যখন যা বলে, যা করে, ভরষ্ট হয়ে বলে, ভরষ্ট হয়ে করে।

“বৃষ্টি বলতে পারে, বরণ বলতে পারে, যা বলতে তোমার সাধ খায়, যা বললে তুমি রূপকথার স্বাগ পাও।” আমি আঘাত দিলুম। “না, আপনি কেন? আপনি কেবল হলুম? সেই প্রথমে থেকেই তো তুমি।”

“তুমি তো এত দেশ দেখেছ, এত রাজ্য বেড়ালে, তিনি রূপকথার রাজ্যগুলোর মতো। করুন তোমার রাজকুটা কোথায়?” সে তেমনি হাসল।

“রাজকুটা এখনো ছিমিয়ে। সেখার কারটি খুঁজে পাইনি।”

“কিন্তু রূপকর কারটি খোঁজ তো পেয়েছ?”

“তার পেয়েছি, কিন্তু রূপকর কারটি ছোঠালে তা সে আশ্চর্য না। সে আশ্চর্য না তাকে নিয়ে আমি কী করব! আমার অনেক কাজ আছে, হাসন। আমি একজন ফিরি।”

এমনি কত কথাবাঁটি। সব সাংস্কৃতিক ভাষায়। সে বুঝল যে আমি তার নন্দের কাউকে, তার প্রতিবেশীদের কাউকে বিয়ে করব। একটু কম্পস হলো। তার আশার ছিল তাদের একজনকে বিয়ে করে আমি তার সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক পাওয়া। তা হলে দীক্ষাশোনা স্বগ হবে। কিন্তু আমি নীলুর উত্তম দিলুম। বিয়ের পরে সব মেয়েই সমান। কেউ কারো আমাকে জানানো দেবে না সবার সঙ্গে মিশতে, নিজের বোন হলেও না, বোদি হলেও না।
ভিনার টেবিলে আমি ছিলুম তার তান দিকে, ঘোরে ঘোরে কথা কলাহিলুষ্মঃ
সাহকেতিকে। ভিনারের পর অহংকার মেয়েদের দিকে মনোযোগ দিতে হলো।
হাসন তাতে খুশুর খুশি হলো। না, নীলুকে নিয়ে বসল তাত খেলতে।
আমার কানে এলো, “রুদ্ধু লেখছি এক নথির কাট। বিয়ে করবে না একজনকে, তবু সকলের সঙ্গে রক্ষ কর। চাই।”

ভাক্সের সাহেবের লক্ষ্য সব সময় নীলুর উপর, আমাকে তিনি প্রতিষ্ঠা
বলে গণ্য করেননি। নীলু বেচারা সমৃদ্ধি উসখুশি করছিল, তার লক্ষ্য
একটা কুচ ঘড়ির উপরে। দেরি করলে তার খোঁরাগ করবে। লোহ মানবো
তার বোঝে ভর করে। আমার এমন হাসি পান্নিতের ভাবতে। আমি তাকে
রহস্য করে কলাম, “আমে তার কপালে ঝাঁঝাঁ। আছে।”

বিদায়েবলে চাপা বলে, “আবার যখন কলাকাতা। আবারের সেখান করবে
তো। রুদ্ধু, আবার এখান দেখা হয়।” কী জানি কেন আমার তোমার সঙ্গে
হলো। নীলু বললে, “ঠাঁ, তোকে বেঁধে আসি। ইচ্ছা ছিল এক মিন
আমার ওখানে ভাবতে, কিন্তু কালকেই আমাকে মকন্তাবে বেরোতে হচ্ছে।
আসছে বার কলাকাতা এলে আমার ওখানেই উঠিস।”

তারপর নানা কারণে ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেনি। প্রায় সাত বছর পরে
ছুটি সিদ্ধে মিথিলামে বিশ্বাম করছি, একদিন ঠিক ঢুপুর বেলা একখানা মোটর
এসে আমার দরজায় ধামল। লাফ দিয়ে নামল একটা কুকুর, তা বেঁধে ছুটে
এলো। আমার থুই ছেলে। উত্তেজিত হয়ে বললে, “বাবা, দেখতে চল কাঁদের
গোলার আমে কুকুর।”

বেরিয়ে দেখি সাহেবী পোশাক পর। এক ভালোক ও কারকোট গায়ে
দেওয়া শাঁতি পর। এক মহিলা। আর, এ সব আমাদের নীলু সঙ্গে ওর মী
রহন্তভালী। আমার হৃদন্ত ছিলেন, তাকে ইতিমধ্যে কুকুরের ও
মোটরের খবর দেওয়া হয়েছিলেন। মহিলার খবর দেওয়া হয়নি। আমার তাকে
তনে তিনি বাইরে এনেন ও ধাবকার নিয়ন্ত্র জানালেন। ধাবকা গেল নীলুরী
আসানসোল থেকে এসেছে জামি কিনতে, একটি পরে আসানসোল ফিরে
যাবে, ধাবকার হাঁ না। যদি ধাবকার দেরি না ধাবকার দেখে যাবে।

আমি বললুম, “আমারা একটার সময় টিফিন খাই, এখনেও এক মেলে
বাকি। চল, নীলু, তোকে একথানা মনের মতো। জমি দেখাই।”
হাসন সদ্বী

নীলু রাজি হলে। তার বৃদ্ধ আমার জ্যেষ্ঠ সঙ্গে রায়াদারের গেলেন। জীবনের দ্রুপ। হাওয়া দিছেল। আমার পায়ে হেঁটে কতক দূর গেলুম। মৌসুম এবং কুকুর রইল ছেলেদের হেফাজতে। জিজ্ঞাসা করলুম, “নীলু, ঠাপা কেমন আছে?”

নীলু উত্তর দিলে “সে অনেক কথা। আরকে দিন বলব।”

“আরকে দিন মানে তো আরে সাত আট বছর। তার চেয়ে তুই যেটুকু পারিস বল।”

“আচ্ছা, তবে সারাংশটুকু বলি।”

বিয়ের আগ কয়েক দিন পরেই তার বাড়ি তাকে বলেন অপারেশন করতে হবে। কিছুকে অপারেশন, ঠাপা অত শুক বোঝে না। মত না দিলে যদি প্রোগ্রামসহ হয় সে কথা বেরে মত দেয়। অপারেশনের পরে টের পায় চির জীবনের মতো বন্ধা হয়েছে। তার মনে দারুণ আহার লাগে।

নীলুকে বলে, আর বেঁধে থাকে কী হবে! কী হবে প্রোগ্রাম রেখে, যদি প্রোগ্রাম দিতে না পারি! নীলু বলে, কত মেয়ে বন্ধা হবে নেসালিক কারণে। মনে করো, তুমিও তাদের একজন। তোমার বাড়ির চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে, তারা তোমাকে মা বলে। তুমি তাদের মানুষ করে তোল, প্রচুর বাংলা রস পাবে।

কিন্তু কিছুদিন পরে আরো হুলোক তার চেলেমেয়ের অমঙ্গল সরালেন।

বাড়িতে রইল তার ভাই বোন, ঠাপার নন্দ দেওয়া। তাদের নিয়ে ঠাপার সময় কাটিত মন না, কিন্তু তাদের সঙ্গে তার হংস ঘরে কেন! বাড়ির সঙ্গ পাওয়া তার, তার পাশার কষ্ট তিনি সহিতে পারেন না, আর পাশারও তার অসাধারণ। সে নীলুকে চিঠি লেখে, কোন করে, সাথে। কিন্তু নীলুরও কি উপায় আছে! তারা যে ঘরে বাইরে হাকিম, এখানে জ্যাবালিহি, ওখানে কৈফিয়ত।

নীলু পরামর্শ দিলে, ঠাপা, তুমি একটা কোনা কাজ বেঁচে নাও। কাজ করো, কাজ করে যাও। পৃথিবীতে আমার কুর্ণ ভারতে আসিনি, এবং তার মাটি খুঁড়াতে, বাড়ি গড়তে, রাতে বানাতে, শহর বসাতে, ভোগেরক্রম উৎপাদন করতে, শিখা বিদ্যার করতে, বাণিজ্য বর্ধন করতে, আনন্দ দিতে ও পেতে। ঠাপা, তুমি যে কোনা একটা কাজ বেঁচে নাও, তা হলেই বিচবে।

সে এক এক করে অনেক রকম কাজে হাত দিলে, কিন্তু দিতে না দিতে-
গল্প

ঝুটে নিলে। বললে, আমার পুরী কবে নির্ধারণ করবে, তাই বল? অন্য বলে, কবে আনবে মুক্তা সোনার জল, সোনার বরণ পাবি? আমি এ বাড়িতে বাচব না, অন্য। আমাকে আমার নিজের বাড়ি দাও। কত লোকের বাড়ি তৈরি করে, সহীর বাড়ি তৈরি করতে পারে। না?

বাতাস এর কোন উত্তর নেই। ইচ্ছা করলেই নীলু পারে হাসনকে তার নিজের বাড়ি দিতে। অবশ্য মুক্তা ঝারার জল কিংবা সোনার বরণ পাবি দেওয়া তার সাথে নয়। শনাক্ত এর অসাধ্য। কিন্তু বাড়ি! মনের মতো বাড়ি দিতে পারবে না সবীকার! নীলু ভাবে। কিন্তু উপরে থাঙ্গা পায় না। মনের মতো একথানা বাড়ি মানে কত কালের সংখ্য। ত্রীঃ বক্ষিত করে সহীরকে দেবে তার সংখ্য। তা কি হয়! রস্তা ক’মন করবে! সমাজ ক’মন করবে। নীলু পিছিয়ে যায়। কথা দিতে পারে না। টাপা একথারে অস্থির। যে মাহাব লক্ষ লক্ষ টাকার বাড়ি তৈরি করছে যে মাহাব পাচ সাত হাজার টাকার বাড়ি তৈরি করতে পারত না। তার কি টাকার অভাব! আর দেওয়ার তো শুধু।

টাকারের টাকার অভাব নেই, টাপা চাইলেই সাত হাজার টাকার চেক পায। কিন্তু চাইবে ক’মন করে! টাকার কি অর্থ বরণ, বুড়ু ভূত্বম! তিনি তাকে দিত। করে বিয়ে করেছেন, যত করে বাঁচিয়ে রেখেছেন, পারার পক্ষে আবেশে। করেন না, কিন্তু উপর কাছে কি সহীর মতো দাবি করা চলে। না, তার সঙ্গে তেমন সম্পর্কই নয়। কোন আদালে চাইবে।

নীলু কিছু করলে না, পরিবারে টাপার আবার শর্ত হতে লাগল এবং সে কথা অনেক নীলুর মনে হলে। তখন তে দেওয়ারে মধুপুর বিষয়ে অঞ্চলে জামি বর্ণিতে শুরু করে দিলে রৌদ্রকে না জানিয়ে! বাড়িও তৈরি হলো। বেনামীতে মধুপুরে। খরচ যাপন তাঁ এলো। বোনাতে থেকে। কিন্তু গুরু উঠল, বেড়ালের গলায় ঘষে। পরাবে কে? ভাস্করের সম্বন্ধে কে যে মধুপুরে না গেলে টাপার শরীর সারবে না? কে তাকে বিবাহ করাবে যে সেখানে টাপার অপন বাড়ি আছে! টাপার আত্মীয়ের একে একে তাকে পড়ল। তাদের জ্যোতি দেওয়া তাকে অনেকে তাকে দেওয়া হচ্ছে। শেষ কালে একটামনোমালিন ঘটল। টাপা চলে।

গুল্প মধুপুর। বহু খানেক শুরু করে সেন আবার সালী করলেন।

টাপা নেক কথা জুনে ছাঞ্চিত হলো। না, বরে অবিনন্দন জানালে। নীলু
হাসন সথী

তো চট্টায় যাও না, বোকা যেহে, নিজের আর্থ বোঝে না। আর হতভাগা ভালোবাসা, কেবল শরীরটি বোঝে। মায়ের মন বলে কোনো পদার্থ নেই। কিন্তু নীলুর চোখ কপালে উঠল যখন ঠাপা লিখে, আমি একা ধায়ে মরে যাও। অর্কন, বর্ণ, তোমারা খুদে এখানে যাও। আবার আমার হাসব, আমারা গল করব, গান করব, রাধাব আর যাও। তোমারা আরে মুক্তা বংশার জুলে, অর্কন আজকে জীবন। তোমারা আরে সোনার বর্ণ পাড়ি, সোনালী রঙের শূক, অর্কন সাপ। অর্কন বর্ণ, তোমারা কেব আসবে?

এক বার নয়, ছুঁকার নয়, বার বার আসতে লাগল চিঠি। নীলু যার চূড়া করে থাকতে পারলে না, গেল মধুপুর। সেখানে সবুজ তুলিয়ে যাও ঠাপা। ফুলের মতো। ওকে বাচিয়ে রাখার কিছু চিঠি পাঠাও এককাল পাঠা। সে সময় সময় বোঝানো অর্কন। কিন্তু সময় থেকে মানুষ ছিল সে বয়সে তো। আর নেই। এখন সময় মানে টাকা, টাকা মানে স্বাধ্যায়ের উপায়। নীলু ওকে অনেক কিছু দিতে পারবে, কিন্তু সময় দেবে কী করে? নিজের স্বাস্থ্যে সময় দিতে পারে না, বোঝা কী তাই। মানে নয় যোতা, একই কথা। পরের স্বাস্থ্যে সময় দেবে? বাপ রে! সমাজ কুসুম করে উঠবে নাটু? সমাজের কথা ধূলি ধোয়া ধাক, ঘরের সোনালী কি রকম। রাখবে?

নীলু অনেক ঘর পাবে যে ঘরে স্বাস্থ্য নিয়োগ করলে। বই কি দিয়ে গেলো। প্রামোক্সন, কিন্তু কেন হাসবে কেন মানে ডিস্টেশনের কথা হলো। মার্বেল পাশে আমির যে বিচ্ছিন্ন দেওয়া গেল।

তা সবেও সবুজ বলে, ওতে আমার থাকবে না। আমি চাই বাস্তব বাস্তবী। বাস্তবীদের সকলের বিয়ে হয়ে গেছে। কেউ আমার চিঠির জবাব পর্যালোচনা দেয় না। এমন কি, বিশিষ্ট, যার সিঁষ্ট সিঁষ্ট মুখে গেছে সেও আমার কাছে আসবে না। বিশিষ্ট এককাল বাস্তব যে আমাকে বোঝাতে সাহায্য করেছ। আর সবাই বাস্তব। মুক্ত, তোমার কাছে আমি চির ক্ষী। এখন জ্ঞানাধরের যে শোক হবে না। আমার যে বেশ তোমার মতে বদ্ধ পাই। তোমাকেই বদ্ধ রূপে পাই।

“তারপর?” আমি এককাল পরে কথা বললুম।

“তারপর?” নীলু শেষে গলায় বললে, “আমি তার অমৃতীয়দের,
অহোনয় বিবর করলুম, টাকা দিয়ে চাইলুম, কিন্তু কেউ কেন রাজি হবে তার কাছে থাকতে? তাদের গ্রামের দাম আছে, তারা সংসারী মানুষ, তাদের উপর নির্ভর করেছে যদি অল্পহাত প্রাপ্তি। তারা বললে, 'খাও ওকে কেনে। তান্ত্রিকরিয়ামে পাঠিয়ে। ভাওয়ালো কি মননপালাতে। অম্মাতগণে খাবারপুরে। আমারাও সাহায্য করব।' বোঝে না বে মখুপুরে ওর নিজের বাড়ি, ওর 'মারাপুরী,' ওখান থেকে ও কোথাও যায় তো বর্ষে।'

"তারপর, ও কি এখনে সেইখানে আছে, না বর্ষে?"

"তারপর, আমি সময় খুলে বললুম, আমার সহস্রণীকে। বললুম, ও যদি মরে যায় তো। আমার ভিতরটা তা করে যাবে, খুনো নারকেলের মতো। তুমি কি তেমন আশার নিয়ে তুষি হতে পারে, তো? যদি না হও তো আমাকে কাম করে, আমাকে অমৃতস্রী দাও যার মাঝে ওর ওখানে হাজিরা দিয়ে আসবার, অবশ্য উঠব আমি ডাক-বাংলোর। তুমিও যেতে পারে আমার সঙ্গে। রত্না যখন দেখলে যে আমার ভিতরের মাছবটাই মরতে বলেছে তখন অমৃতর দিল। কিন্তু 'আমার সঙ্গে যেতে রাজি হলে না। এই ভাবে দু'হাজার কাটল। সখী আবার সজীব হলো, তার রঙ ফিরল, হাসি ফুটল। মনে হলো তার হব না ধাককেলও দু'হাজারের হবে। কিন্তু ওটা আমার মনের ভুল। ভিতরে ভিতরে ও অক্ষেপে বাজিল ঠিকই। সর্বাঙ্গের অভাবে নয়, গ্রেমের অভাবে। 'আমি তার কী করতে পারি!"

"থাক, আমি সামনা আনলুম, "বে বাবার সে গেছে, তার কথা ভেবে মন ধারাপ করিয়ে। তুই তোর যথাসাধ্য করেছি। সংসারে এই বা ক'জন করে! তুই আদর্শ বন্ধু।"

"কিন্তু ও বেচে আছে। হায়া, বেঁচে আছে। ভালো। আছে। হুঃ আছে। ও পেয়ে গেছে মুক্তা ছায়ার জল, সৌনার হুক পাখি।"

"হায়া! এ অস্ত্রর সত্ত্ব হলো কী করে! করলে কে!"

"ওরই মতো এক মম্মার চারিগুলো। মখুপুরেই ওরে আলাপ। ওরা এখন এক সঙ্গে ধাকে। আমি কিছু বলেনি। দেখে দেখিয়ে তাদেরে ভালেন। অভিনব বটে না নীতি বটে? মায়া বন্ধ না সমাজ বন্ধ? শক্র, তুই তা কবি ও সাহিত্যিক। তোর কি মনে হয়?"

উচ্ছাস আমার কঠো রোধ করেছিল। কোনো মত বলতে পারলুম, "ওরা নিমিত্ত হোক!"
হাসন সহী  

কলকাতার নীলুর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল এই সেদিন। রবীন্দ্র জ্যোতির্বিদ্যা উপলব্ধে অনুমিত এক আসনে। রঞ্জি ছিলেন সঙ্গে। কুশল-বিনিময়ের পর শব্দ একাংশে টেনে নিয়ে মুখামুখি, “সখীর খবর কি?”

“ভালো আছে। তোমার জীবন পরিপূর্ণ হয়েছে। ওরা এখন তোমার চারটি ছেলেমেয়ের যা বাপ।”

আমি চমকে উঠলুম। “বলিস কী! হলো কী করে!”

নীলু হেসে বললে, “হয়নি। রুগ্ণ দেখে আশ্রয় দিয়েছে। হাসন তাদের অপন সম্পানের মতে। ভালোবাসে মানুষ করছে।”

“ধরন কোথায় কে?”

“বে কোথায় সেই কোথায়।”

“রন্ধন জানে?”

“আনে। তারও তো মায়ের প্রাণ। এত দিনে তার প্রাণি যুবে গেছে। আমাকে আর ঘরের বাইরে সংগ্রাম করতে হয় না।”

আমি তার হাতে হাতে রেখে বললুম, “নীলু, তোকে মনি ফেল। করতে আনন্দ হব হতুম। চাপাই সঙ্গে দেখা হলে বলিস, যে বাচায় সেই বাচে।”

(১৯৪৫)
জুড়ো দিল্লু

মসজিদের বুড়ি আলমোড়া গিয়ে দেখি সেখানেও মাস্তকের মুখে হাসি নেই। তারা বললঃ করবে, „ভিসেহর মানে এখানেও অকাল পড়বে।“ তখন নিরাশ হলুম।

নিরাশ হয়েছি, এই কথাটা ভাঙা হিন্দীতে সমঝিয়ে বিচ্ছিন্ন আমার ব্যাপারকে, সেখানে হয়নি যে তার সঙ্গে কুমাওনী ভাষায় আলাপ করেছেন যিনি তিনি। বাড়োলী। তার পৌঁছাক পরিচ্ছেদ কুমাওনীরের মতো। যোধপুর বিচেনের উপর গলা-বন্ধ কোট, মাঝার দেশী টুপি। কলাপে চম্বনের ফেঁটা। লম্ব চওড়া অসমালোচনা চেহারা। বয়স পঞ্চাশের উঁচু, গৌণদাধি কামান।

ভ্রমপুকোর আমার দিকে ফিরে পরিচার বাংলায় বললেন, „নিরাকারের কথা: যদি তুলেন তো। অন্য যে কাশীর—বাবা ভ্রম বলে—সেখানেও মাস্তক খেতে পাই না। ভারতের এমন অঞ্চল নেই যেখানে আমি বাও নিই, কিন্তু কোথাও দেখিনি যে মাস্তক গেট ভেনে খেতে পাচ্ছে।”

শাহজাহাঁ কত দুর বুঝলেন অন্য নে, তিনিও মাথা নেড়ে সার বলেন: আমি কাশীর যাবার কথা ইতিপূর্বে ভাবছিলুম, কিন্তু এর পরে সে ভাবনা ত্যাগ করলুম। আমার বিমৃদ্ধ দশা লক্ষ করে ব্যাপার বললেন হিন্দীতে, „মশলকৌর সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই? অপ পলিটিকল লিফার থে। অব জুড়ো দিল্লু।”

জনলু ভ্রমপুকোর এখন এখানকার “নন্দা দেবীর রেস্টোরাণ্ট”র মালিক। তখন আমার মনে পড়ল যে ইনিই তিনি সখার কথা স্থানীয় বাঙালীদের মুখে জন্মেছি। আলিপুর বোমার মামলায় নাকি ছিলেন ফেরার আসামী।

“ও, আপনি!” আমি নমস্কার করলুম। মশলকৌর মশলকৌর। তিনি বললেন, “নমস্কার।” তারপরে আমরা তুমিতেই কাজ সেরে এক স্কুলে গা তুললুম।

মশলকৌর যখন জানালেন যে তার রেস্টোরাণ্ট খুব কাছেই তখন আমি জানালুম যে আমার হাতে আর কোনো কাজ নেই। চললুম তার সঙ্গে। রেস্টোরাণ্টের উপর তলায় তার ক্যাট। বারান্দা থেকে হিমালয় দেখতে।
বায়। হিমালয়ের কোরে কাঁপে। প্রাকৃতিক দুঃখ ভয়ে হলুম দুঃখ। কখন এক সময় কাশ্মীরের প্রথম উঠল।

"যা বলছিলুম। কাশ্মীর গেলে যে আপনি কোন মায়ের স্বাক্ষর দেখে স্বাক্ষর তা নয়। আমি তো সাব। ভারতের কোনো কার্যকারিতা পাইনি। যে দেখে যে নেই তা আমি খুঁজলেও নেই, আপনি খুঁজলেও নেই। তেমন স্বাক্ষর যদি দেখতে চান তো ছুটি নিয়ে ভারতের বাইরে যান। এই অভিষেক দেশে—" বলতে বলতে তার হুই চোখ ছালছিলেন উঠল।

তাকে দেখে মনে হয় না যে কখনো ভারতের বাইরে গেছেন। আমাদের বাস দিলে। তাই এখন করলুম, "ভারতের বাইরে কোন কোন দেশে গেছেন?"

"ইংল্যান্ড, উইটব্রাউলডে, পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্বোত্তম।"

এসব দেখে আমারও ভালো লেগেছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, "ক'বছর ছিলেন?"

এর উত্তরে তিনি ক'রা জানি ক'রা ভাবলেন, তার পর বললেন, "রাম ত্য বছর নির্ধারিত ছিলেন।"

"চো-দ বছর!" আমি আশ্চর্য হলুম। কথাবার্তায়, চালচলনে, গোপালক- পরিচ্ছদে তার অভাষামুখ নেই।

আমার বিখ্যাত হচ্ছে না লক্ষ করে তিনি বিলিতি ধরে না হাঁকা করে উঠলেন। তারপর করাশীতে যাক চাইলেন, "পারুন!" তার পর জার্মান ভাষায় গান ধরলেন, "Herz mein herz sei nicht bekloommen..."

হৃদয়, আমার বলেন, ব্যাখ্যা কাঁক্ষে বোঝা না... তার কথার কারণে আমার নয়মণ্ডলে সংক্রান্তি হলো। আমি চেপে ধরলুম, "বলুন না, কী আপনার ব্যাখ্যা। যদি গোপালক না হয়।"

এর উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তার সবটা মনে নেই, মনে ধাবলেও লেখার সময় আসেনি। একাংশ লিখছি।

আর ভাবছি তিনি এখন কোথায়।

তখন বদন্তীর যুগ। বরস কাঁচ। দেশের মাটির দিকে চেয়ে আমার মনে ভাব আগত, মাটি কি সত্যি মাটি? না চিত্তরবি মায়ের মৃদুপ্রতিমা? আমরা প্রতিমা পুজো করি বলে ওরা যে আমাদের অবজ্ঞা করে, ওরা কি জানে।
বে এই জন্য এই হাওরা সবই এক একটি প্রতিষ্ঠা? ধার প্রতিষ্ঠা তিনি ভারতমাতার।

একালের ছেলেরা ওনা হাওরে, কিন্তু নেকালে আমরা সত্যি বিশ্বাস করতুম যে ভারতমাতার বলে বসতি কেউ আছেন, যেমন আগরাত্তা বলে কেউ আছেন। সেই ভারতমাতাকেই বলনা করে বলতুম, যে হিসেবে, দশগ্রহণ-ধারিণী কমলা কমলদলবিহারিণী বাণী বিভাবিভাবিনী। মনে মনে বলতুম, যা, তুমি যদি শক্তিময়ী তবে তোমার শক্তি কেন হৃদয় রয়েছে! যা, তোমার শক্তি পরিচয় দাও। মহিষমর্দন করো। সিংহবাহিনী, সিংহী যে বড় বাড়াবাড়ি করছে, যা। তোকে শাস্তা করো।

হাসছেন। কিন্তু তখন আমরা তুলেখ হাওরতুম না। আমরা প্রত্যেকেই ছিলুম অমিষে দীর্ঘিত। ভিতরের ভিতরে মহা হত্তুম। ভিতরের আগন্তু বাইরেও বলত। হাসছেন, আমরা কিন্তু আকাশের বিশ্বাস করতুম যে মা একদিন আকাশের অর্থে গায়েন। আমরা রচনা করব জাগ্রত দেবতা দশগ্রহণ ধারণ করে দশ হতে সংগ্রাম করছেন। আজ কলকাতায়, কাল পাঠায়, পরদেখিতে তিনি যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় করছেন। দেশব কলকাতার পরে একটি শহর অবশিষ্ট নেই। দেশ বাধীন।

ধীরে ধীরে আজ হলো, ওব সত্য যুগে সত্য, কবি যুগে নয়। এ যুগে মা তুমি আপন শক্তি আমাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। আমরাই তুমি এক একটি হাত, আমরাই ধরব এক একটি প্রহর। আগব আমরাই, আমরাই যুদ্ধ।

তখন আমরা অন্যের তুলেখ মন দিলুম, অন্যদিন শিক্ষালুম। কেমন করে বোধ তৈরি করতে হব। কেমন করে বাক্য তৈরি করতে হব, শেষে গেল এসব। ভেবেছিলুম কিন্তু কের পাবে না, জানতুম না যে দেয়ালের কান আছে। বলের লোক ধরা পড়ল, আমিও পড়তুম, কিন্তু বাক্য ছিল ওদের দোকান, তবে তবে চোরাই মনের কার্য। আছিজি গোসাইরের কাছ থেকে তিনি মাল আমাদিন করতেন। সেই সময়ে আছিজি গোসাইরের সঙ্গে তার ভাব ছিল। তারা আমাকে লুকিয়ে চলান দিল ইংলিঙ্গে। তখনকার দিনে পাসগোটের হাওরাম ছিল না। ইংলিঙ্গে আমাকে আশ্রয় দিল। সেছার নির্বাসিত হয়ে রক্ষা পেলুম ধীরপাত্র হত। ইংরেজ আমাকে উতার করল ইংরেজের রোথ থেকে।
এই ঘটনার পর আমার ব্রিটিশ বিষয়ে আপনি অস্ত্রহিত হলে। বিলেতে বাস করে লেখলুম ওরা রাক্ষস নয়, পতন নয়, পশ্চাত নয়, আমাদেরই মতো মাহাব। বিলেতে দেশটাত মাটির। সে মাটিতে মাটি নয়, মৃত্যু যায়। তখন আমার। মা ব্রিটিশার মনে মনে বন্ধনে করলুম। বললুম, মা, তুমি আমার দের। তোমার শক্তি বহু নয়, বিকীর্ণ। তোমার অভিব্যক্তি কত উপনিবেশে, কত অধিন দেশ, কত বন্দর, কত নৌকাটি, কত সুদৃঢ়াহাজ, কত কামান। আমার কত বড় সাহিত্য, কী মহান ধর্ম, কী উত্তর বিজ্ঞান, কী উদার গণতন্ত্র। মা, তুমি তোমারই গৌরবের অংশে ভারতকে মুক্তি দাও।

আমার উত্তর নাম বললেছিলুম। সেই নামে টাকা যেত বাড়ি থেকে বিলেতে। টাকার অভাব ছিল না। লোন মাটি কলেশনের অংশ পড়ানো করতুম আমার সভাসদ হাজিরা ডিতুম। আমার ভাবে তার বাধীনতা ফিরে পায় তাই লক্ষ করা ছিল আমার প্রথম কাজ। আইরিশের হোম রুল আন্দোলনের কর্তা ও কর্মদের সঙ্গে আলাপ আলাচনা করে দিনের পর দিন কাটত। আইরিশদের মধ্যে তখন আরে। একটা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। যার নাম শিন ফেন। এই রূপ আন্দোলনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের যোগ ছিল। সেই সুতরে অনেক বার আয়রলও গেছে। বক্তৃতা আমাকে প্রান্তরে করত ডাবলিনে আইন পড়তে। কিন্তু লোনের আকর্ষণ দুর্বর। নানাদেশের আজ্ঞাগুলিতে লোন তখন ভরা। কেউ রাজশাহী, কেউ চট্টগ্রাম, কেউ তুর্কির, কেউ গোলাপ। তাদের আজ্ঞা বলত এক একটা রেস্টোরান্টে। আমি সব রেস্টোরান্টে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশতুম। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারতুম না তাদের কর্মনীতি। আমার তার বুঝতে না ভারতীয় রাজনীতি। কাজেই আইরিশদের সঙ্গেই আমার বলত ভালো। অচ্ছ মিশতে মন যেত বাধীন অভিজ্ঞতার সঙ্গে। হাফার হোক রুশরা চীনার তুর্কির সাহীন। গোলাপ অবশ্য তা নয়, সেটা ব্যতিক্রম।

ভারতীয় মহলে আমার অবাধ গতি বিধি। ভারতীয়দের একাধিক দল, নরম গরম দুই দলের সঙ্গে আমার সামাজিকতা ছিল, কিন্তু গভীর সম্বন্ধ ছিল কঠিনতার সঙ্গে। ওর ওখানে কেউ একে দাবি পড়ত আমাকে। একবার দেখি দক্ষিণ আফ্রিকার এক ব্যারিস্টার এসেছেন। গাঢ় তার নাম। চমকে উঠলেন যে। হীন আপনাদেরই মহামাত্রা গাঢ়। তখন তিনি মহামাত্রা ছিলেন না, ছিলেন নিতান্তই মিস্টার। তখন আমরা কেউ ঘরেও তাবিনি যে এই
বিষয়ে গোবেকচুরি একদিন ভারতের মহানেত্রা হয়ে প্রকাশ বিবেচনা ঘোষণা করেন। তবে তার কথার ব্যাপারে জন আমাদের মনে ধাক্কা লেগেছিল। পরে আমরা সে ধাক্কা কাটিয়ে উঠি কফির পেলালায় চুমক দিয়ে।

গুয়াহাটি জন তে হাঁ কো কথাবার্তা? আচ্ছা, বলছি। আমার স্পষ্ট মরণ আছে, যদিও ১৯০৮ কি ১৯০৯ সালের কথা। সাবারকার সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হাঁ, আপনাদেরই বীর সাবারকার। আচ্ছা! না? তাই সেই জন্য তিনি একদিন হিন্দু মহাসভার কর্ষণ হবেন। কই, তেমন কোনো হিংস্র্য নিতে তখনকার দিনে দেবিনি। যা হোক, যা বলছিলুম।

সাবারকার হাড়ালেন গাছিকে, "মনে করে মন একটা সাগ তোমার দিকে ফেল তুলে তেড়ে আগছে। তোমার পালাবার পথ নেই, পিছনে গ্রামের খান। তোমার হাতে একগাছা ছদ্ধি আছে, তা দিয়ে ইচ্ছা করলে আমাকে করা যায়। তখন তুমি কী করবে? মারবে, না মারবে?"

গাছিকে এক মৃত্তিকা হাবলেন না, তৎক্ষণাং উত্তর দিলেন, "ছড়িখানা আমি ফেলে দেব, পাছে আমার লোভ জাগে তাকে মারতে।"

অবাক হচ্ছেন। অবাক হবারই কথা। এমন কথা আমি জমে কখনো তোমার নি, তাই পরিবর্তন বছর পরে আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে—"I would drop the stick lest I should feel tempted to kill it."

সেদিন সেখানে আমরা যে কয়লার উপস্থিত ছিলুম সকলের খাস উড়ে গেল। ছড়ি ফেলে দিলে সাগ কি আমাদের ছাড়বে! মনের হয়ে গিলেব।

সাবারকার বললেন, "গাছিকে, তুমি আমার ধর্ষণ হতে পাও।, কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হতে অক্ষম।" সে কথা আমাদের সকলের মনের কথা।

গাছিকে বিচ্ছিন্ন পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে গিলেন, আমরাও তুলে সেলুম তাকে। রাজনৈতিককেতে অহিংসার কোনো মানে হয় না, ওটা নিষ্ঠুর পাগলামি। তাই আমরা তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক করি নি। আমাদের তরকের বিষয় ছিল সাদাধারণ এই যে, দ্বারকা কি বোগতার প্রামাণ দিলে পাগলা যাবে, না অন্যের মাঝে ছিনিয়ে নিতে হবে? অন্যের মাঝে ছিনিয়ে বেঁধতে হবে তবে অন্য কোথায় পার? আমি গোল্লাম অন্তরিক্ষকের কী উপায়?

আমাদের মধ্যে জন কয়েক ছিলেন, তারা বলতেন, আর্থিক সেক্ষেত্রে মুক্ত একদিন বাধবেই, তখন অন্য জোগাবে আর্থিক, অন্তরিক্ষকে সেই সেখানে।
এত বড় কথা ভাবতে আমার তা করত। তাছাড়া আমি ছিলুম সত্যি সত্যি ইংরেজিভক্ত। না, রাজহংস নয়, ইংরেজিভক্ত। যুদ্ধে জার্মানীর চোর ছিলা যখন অন্যের উপর ছিল তখন খারাপ ছিল অনেকের তখন ধারণা ছিল অনেকের আচরণ। সে উপর যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে যোগ দেওয়া।

যুদ্ধ যখন বাহুলিক বাহল তখন আমাদের সেই ক্রমমাত্র যুদ্ধে পাওয়া গেল না, তারা তত্ত্বতে বালন। আমরা গিয়ে কর্জানের আলাদাম, আমরা গড়ে স্বরূপ, সৈয়দের আমাদের নেওয়া হোক। আমরা নিজেদের পক্ষপাত আর্টিলারির উপর। অনেক দিনের সাথে গোলমাল হতে। তাদের কল্পন। কিন্তু তারা কেন তুলবে! কর্জানে বললেন, তোমাদের চেহারা স্বাধীন নয়, অথবা রাজনীতি স্বাধীন নয়।

তখন যে যার নিজের কাজে মন দিল। আমি কোনো কাজেই মন দিতে পারলুম না। এত বড় সুযোগ জীবনে হারাতে আসে না। এমন সুযোগও ব্যর্থ গেল। এ জীবন রেখে লাভ! মনের অন্য শরীরে সংক্রামিত হলো। তাকার বলল, স্বিফ্টজার্কালে না গেলে সারবে না। অনিচ্ছায়ে ইংল্যাণ্ডে থেকে বিদায় নিলুম। স্বিফ্টজার্কালে নিয়ে দেখি ছোট একটা দেশ, সেখানে কেন্দ্র দায়িত্ব, কেন্দ্র সমৃদ্ধ। পর্যন্ত মানুষ বখ করেছে, তার শিঠ শহর বসিয়েছে। সেখানে যত রকম আরাম পাবে, যত রকম খেলা, যত রকম আমোদ। স্বিফ্টজার্কালে আমার ইংল্যাণ্ডের চেয়েও ভালো লাগল। সেখানেও নানা দেশের রাজনৈতিক পরামর্শ।

স্বিফ্টজার্কালে থাকতে থাকতে থাকতে পেলুম রাশিয়ার জন্য সিংহাসন আটক করেছেন, সেদিনের যা ঘটেছে তার নাম নাফি বিপ্লব। উল্লাসে অধীন হলুম। ইচ্ছা করল সে দেশে উঠে যেতে, কিন্তু উড়ব কি করে? তারা তারা তারা। দেশে আসে যেতে। পেলুম শরণার্থীর সবাই উদ্বেগিত। বিপ্লব যদি এক দেশে ঘটল তবে অন্য দেশেও ঘটবে। অস্ত্রভার্তে, আর্থনীতিতে, তুরস্ক। আমি মনে মনে জুড়ে বিলম্ব, ভাবতেও। সেই ও কথা ভাবা অনন্য শরীর সেবা যাওয়া। আমি আমার লুঙ্গানের বন্ধুদের ভেতে ভোজ দিলুম। কিন্তু কে জানত সেই বছরই সেই কথাদেহই আর এক দফা বিপ্লব ঘটবে। কেন ঘটল কিন্তুই ঠাই হলো না। আমার রূপ বন্ধুদের বিভাগ। কল্পন। তারা তো রেগে টাঙ্গ। আমার উপর নয়, বোনশেষিকদের উপর।
বললেন, ওরা ভাকাট, ওরা চোর, ওদের ওটা বিপ্লবই নয়, ওটা বর্গার হাস্যাম।

কিছু আমার সন্ধে সব হয় না, উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল। আমার এক মার্কসীর আলাপী ছিলেন, তিনি আমাকে ধীরে ধীরে বোঝালেন মাঝারের ইতিহাসটা শ্রীনিবাসের ভরা। ওর একটা বইয়ের অধ্যায় এক দিন আরম্ভ হয়েছিল ফরাসি বিপ্লব, রুজ্জের্সিয়া আবিষ্কারে। এরদিনে শেষ হলো। কেননা তাদের পতন, বুর্জের্সিয়ার মৃত্যু। এখন থেকে শুরু হলো ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। সব দেশেই এই হবে। এ কথা জন আমার মনে প্রথম আগল, আগলের সঙ্গে জয়রত্নের সঙ্গে একজন বছর ধরে যুক্ত হয়। তাদের প্রাণদ্বয়ের, তাদের নির্বাগনের, তাদের কারাভোগের এই কি পুর্তনায়! হ'লাত মাস রাজত্ব করতে না করতে রাজ্যকাল গেল ফুরিয়ে। শেষ হয়ে গেল তাদের মৃত্যু, সেই লক্ষ লক্ষ শহীদের পুনর্জীবন। এর উত্তরে মার্কস-পাস্ত্রী বললেন, ইতিহাস তাদের মৃত্যু। লেখিন তা নিয়মিতজ্ঞ হয়।

ইতিহাস পড়িনি, এই বদি হয় ইতিহাসের ব্যাখ্যা তবে ইতিহাস পড়ে শুধু নেই। ভারতের মনে মনে ভেঙে বললুম, না, আমায় যে তোমাকে প্রতিদিন বসতো করে আসি, তোমার অন্তর ফালিকাঠে বুলাচি, জীবন্তের বর্ণিত কাছাকাছি পচ্ছি, না কি এই হয়ে। এই কি তোমার মায়াবিচার যে আমার হ'ল মাস রাজত্ব করেই সিখাইয়ান থেকে নামব, আর সেই সিখাইয়ানের উদ্দেশ্যে প্রথম শ্রেণী। তা হলো আমার কেন এখন করে বুকের রক্ত পাত করছি।

এর পরে কিছু আমার ভগবানে বিখ্যাত চলে গেল, ইত্যাদি ভারতের মনে। স্বত্বে বদি মায়াবিচার না থাকে তবে ভগবানও থাকেন না। দেশজনাও না। রাশিয়া থেকে আসো শরণার্থ এসে দুটোল, এবার বোলেশিকের অভ্যাসের থেকে। তাদের মুখে শ্রীনিবাসের কথা ঝাঁপে ঝাঁপতে আমার ধারণ। তাদের যে ইতিহাসটা শ্রীনিবাসের ভরা। তাই বদি হলো তবে রুজ্জের্সিয়ার চির দিন রাজত্ব করতে পারে না। হ'লাত মাস পরে হোক, হ'লা শতাব্দী পরে হোক, এক দিন না এক দিন তাদের পুনর্জীবন হলো হেহে। তাগ করেলেও যে পরিণাম, ত্যাগ না করলেও সেই একই। ত্যাগ তবে করব কেন? করব ত্যাগের জন্যই।

বুকটা দেখে গেল। তার আগে আমার বুকের ব্যাখ্যা ছিল না, তখন
থেকে হলো। বৈরুতের অবসানের জন্তে দারা গ্রাম দিয়েছে, তাদেরই পরিবারের লোক দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে গ্রাম নিয়ে। এরা এখন নিঃস্ব। দেশ থেকে কেউ এদের টাকা পাঠাবে না, এবং বিশেষ দামনিকতা। একবিং ভারতেও কি এই রকম হবে, এই ভাবে দেশাঞ্চলের ছবে আমার আমার অস্ত্র? এই কি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ? আপনের ধারা?

এর পরে আচার্যের বিপ্লব ঘটল ও সে বিপ্লব ফিকল হলো। বিপ্লব তা হলে সব দেশে সফল হয় না। অধিক অস্ত্র হলো। হৃদয় যুদ্ধ শেষ হয়ে বাওঁয়ার একটা চুম্বনের বোঝা নেমে গেছে। আমি ইঁক চেড়ে বাচলাম। প্যারিসে গিয়ে হাজির হলুম ও বাসা করলুম পীড়ন কন্ধকারের দেখতে। ভেন্টাইটে যেমন সস্তা দামাদি হয় সেদিন অধিক ছিলুম সেভানে। অচার্যের সাপ্তাহিক দেখে আমার চোখে জল এলো। সাধারণ অন্ধকারদের বিপ্লব যথি সফল হতো। তা হলে কি ভেন্টাইটে তাদের এ সব হতো। মনে হলো, মখ্যবিজ্ঞানের মাঝা দূর্বল, অতি সহজেই তারা অপমান মাখা পেতে নেয়। ইতিহাস তাই তাদের ঘাড়ে ভেন্টাইটে চাপিয়ে দেয়।

ফল হলো। এই যে আমার অস্ত্রের প্রতি আমার অন্ধকার জায়ল। আমার নিজের অস্ত্রের মার্কস্টার্স হয়ে উঠলো। না, কমিউনিস্ট না। এমনি সাধারণ অর্থে মার্কসিজ্যাটের ক্ষেত্রে নয়, মতবাদে। হিন্দু ছুঁড়ে ব্রাহ্মণ-সমাজে নাম না লিখতে হয় না নিরাকারবাদী হয়। আমি তেমনি কমিউনিস্ট না হয়েও মার্কসিজ্যাটের। আমার জীবনে এক বাত্তি ঘটল ঘুঁটে গেল। প্রতিভাগাত্মক আধি, সর্বভাগমাঝে বাঙ্গালীর ভারতের প্রতি। “বন্ধে মাতরম” এর উপবাট জরায়ু করলো। অতঃপর বছর দেশ ঘুরি কিহর রাশিয়ার যাবার ছাড়া পাইনে। হতবাটো আরা দিন পরে পেতুম। কিন্তু দেশে ফেরার জন্যে গ্রাম ব্যাকুল হয়েছিল। মন্ত্র ভূল করলুম দেশে ফিরে। অমার ধারণা ছিল দেশ একেবারে বদলে গেছে এবং সে পরিবর্তন দেশবার মতো। অনেক ভিত্তি করে দেশে ফেরার অসম্ভব গাই। অতএ পাই যে আর আমার বিকেল মামলা চালানো হবে না। আমার সহকর্মীরা মার্জনা পেয়ে আন্দোলন থেকে ফিরেছিলেন। অতএব আমাকে মার্জনা করা কীট্ট হলো না।

দেশলুম কোন অনর্থোগ অধনোলন চলছে, তার নেতা হয়েছে গাছো। গাছোর মতো অন্তত লোককে ধারা নেতা করতে পারে তারা সব পারে। দেশের মতিগতি আমাকে হতাশ করল। রাজনীতিকে জীবনর্তে প্রয়োগ
বেঁধে আমি তো ধরে নিলুম দেশ তিন হাজার বছর পেছিয়ে যাবার উদ্যোগ করছে। একে তো সেপটা ধারপরাই গরম, তার উপর খদ্র পরবর কর্মমায়ে জনে মেহাজ গেল বিলকুল বিগড়ে। তার পরে যখন কানে এলো যে মদ খাওয়া পাও তখন আমি পাসপোর্টের জন্যে দরজাধান্ত করলুম। ইউরোপে ফিরে যাবার পাসপোর্ট। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ভক্তরা রটিয়েছিল যে আমি আঠারোজনে গিয়ে শুধুবিয়ে। সিদ্ধে সেই ও বাংলাদেশের ছেলেদের ও বিদ্যা শেখাতে চাই। হবা সরকারী মহলে আভ্যন্ত্র সংস্কার করে। তার ফলে আমার পাসপোর্ট পাওয়া তো হলোই না, তার বদলে হলো মাত্রাজের সেলার জেলে বিনা বিদ্যা অবস্থান। মদ খাওয়া যখন কানে লেখনি তখন কী আর করি। ঘটর ঘটর করে চরকা হাতকাতে পড় করে নিলুম। মাজমাস্ত ছাড়তে হলো মাত্রাজীদের বাসার সামনে অসহ্যকর করে। সকলেই শীঘ্র করল যে অসহ্যকর বুট। কিন্তু গরমে মারা যাচ্ছিলুম। গবর্মেন্ট কে লেখালেখি করে বন্ধি হলুম এই আলমোড়ায়। মানে আলমোড়া জেলে। ছাড়া পেলুম তিন বছর পরে।

ছাড়ার আশা ছিল না। অথচ ইউরোপের অকাঙ্ক্ষা তীব্র। চললুম বেঁধে, সেখানে একটা পেট্রোলিয়ম ঘুরে বললুম। বিনা খরচে মদ খাবার কর্ম। আহাজ ভিড়েছিল আমি যাই ইউরোপীয় যাত্রীদের সামনে ভাব করতে, তাদের ধরে এনে মদ খাওয়াতে, মদের গেলাসের উপর গলা জুড়তে। ইউরোপের ভাঙ ধর সেই ভাবে আমার কানে আগত, আর নেরা মদও অসাত আমার সেলারে। ববে আমার বেশ সহ করেছিল, মাকে মাকে সেখান থেকে জলশিক্ষা সাদিল্লে বেড়িয়ে আসতুম, কল্যাণে বড় বড় আহাগ ধরতুম। ইউরোপের বাগ পেটিয়ুম সেসব আহাজ। বয়স ধাকলে আবার পালাতুম তার কোনো একটা আহাজ, কিন্তু এত বয়সে আর অ্যাডভেঞ্চার সাজে না।

ধরা পড়লে জেলে।

বতে ধাকতে কংগ্রেসের সাই ঘনিষ্টা হয়েছিল। কংগ্রেসে চুকে নেশাযুক্ত তার নেতারা কেউ দিগম জীবন নন, গাঙ্কাইকে তোরা মাখ করেন অহ কারণে। সে কারণটি এই যে গাঙ্কাই এককার লোক যিনি সিপিলি ডিসেও পিঝে কাবে বলে আমানে। সেই সিপিলি ডিসেও পিঝের দিন ঘনিষ্টে এলো। অধিনি আব্দুর চরক। কেটে খদ্দর পরে মদের শেষ খাব নিয়ে তালগাছ শেল্লুরগাছ কাটবার জন্যে তৈরি হলুম। আমার মার্ক্সিয় বস্ত্রবাহী আমাকে
নিচুত করতে পারল না, আমি গলা ছেড়ে হাকলুম, “বল মাত্ররদু!” “আজা হো আকবর!” “মহাআম গাছীকী হয়!”

ধােক, আর বাড়াঝ না। কয়েক বছর পরে ভাঙা মন নিয়ে জেল থেকে বেরোবার আগে ভালো করে মার্কস, লেনিন পড়েছিলাম, পড়ে গাঞ্জীজির ব্যর্থতার হেতু উপলক্ষ করেছিলাম। ইচ্ছা ছিল নতুন উহামে কাজে লেগে যাব, কিন্তু বুকের ব্যামোর জন্তে বাধ্য হয়ে বদরের মায়া কাটাতে হলো। আগমোড়ার স্বিধে এই যে এখানে চুপচাপ ধাকা যায়। অক্ষরা হিল স্টেশনের মতো তৈ চে নেই। আর হিল স্টেশনে ধাকার কারণ গরম আমার একবারে সহ হয় না। ইউরেশ আমাকে মাটি করেছে। তাই দিন রাত ভাবি, কবে আবার ছাড়াব পাব। সবার নিয়ে করেওছি কয়েক বার। কিন্তু বুক না থামলে আশা নেই।

আপনার কি মনে হয় দুধ খুব পীরিগির ধামবে? না, আমারও সে ভরসা নেই।

সেনিন মলিকজী আমাকে না খাইয়ে ছাড়লেন না, কাজেই আমিও তাকে অন্তরোধ আনালুম একবার আমাদের সঙ্গে থেকে। তিনি রাজি হলেন। কিন্তু তিনিন পরে আমার বাহ্য খনন তাকে চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ করলেন। তখন জবাব এলে। তার ভাগনের কলম থেকে। মলিকজী নেই, নীবীতাল গেছেন, কবে ফিরবেন বলে বাইশি। আমরা মুর্ক হলুম।

এ কথা তুমি আমার আগমোড়ার বদু লাহিদী বললেন, “কেরেছেন! মলিকজী আসবেন আপনার হোটেলে থেকে। আপনার হোটেলের বারুটি বে মুসলিমানে এখানে কে না রাখে।"

আমি আহত হয়ে বললুম, “কিন্তু মলিক যে ইউরেশে চোদ বছর ছিলেন।”

”হা, কিন্তু সে মলিক আর নেই। এর নাম মলিকজী, এর কত বড় চন্দনের ফোটা, আপনি বোধ হয় লক্ষ করেননি যে বড় বড় চুলের সঙ্গে এক গোঁড়া টিকিতে আছে।"

”কিন্তু তিনি যে মার্কসীয় ভষ্যবাদে বিশ্বাসবান।"

”বোধ হয় সেইহেই বন্ধ ভালো বোড়ন। টাকা চেনেন।”

কিন্তু একৃতক তিনি নীবিতাল গেছেন। আমি অক্স হতে জেনেছিলুম।
লাহিড়ী আমাকে তামাশা করলেন, “তা হলে আপনার নিজস্ব এড়ানোর কথাই তিনি নৈনিত্যাল গেছেন। আপনি তাকে কি রেখেছেন না।”

লাহিড়ী আমাকে চুলখ বললেন যে মজিকজি ব্যবসায়ীর মাথায়, কিছুটা মেঝে মেঝে এই ঘোরতর নিজস্ব শহরের পথের জমে ভালো।

মাস খানেক পরে উদয়শঙ্করের স্কুল থেকে আসছিল, পথে মজিকজির সঙ্গে সাক্ষাৎ। নিষ্ক্রিয় রক্ষা করতে পারেনি বলে কম্পাঙ্গর্ষণ করলেন।

লক্ষমন সেদিন তার পরে ইউরোপীয় গোপাল। হালকা গলা রেখে স্ট্যান্ড ফেলুট ছাড়। ক্যাপালে চম্পরের চিহ্ন ছিল না।

জিজ্ঞাসা করলেন, “ভালো কথা, আপনার বাবুর কেমন রাগে?”

“কেমন রাগে তা আমন্ত্রণ না পরাই করে দেখবেন। কবে আসতে পারবেন বলনু।”

“তার কি আজ সময় আছে, ভাই। আমাকে যে কাল নৈনিত্যাল করে যেতে হবে। সেখানে নতুন একটা রেস্তোরান খুলছিল যা না। নাম রাখছি রেস্তোর। আমারনাসিওনাল (Restaurant Internationale)।”

“এই নাকি?” আমি চমৎকর হলুম। “তা হলে কি আপনি এখানকার পাট তুলে দিচ্ছেন?”

“না। এখানের ভাল নিজে আমার ভাগনে।”

“কিন্তু হঠাৎ নৈনিত্যাল!”

“ঠিক হঠাৎ নয়। তারফিল্ম অনেক দিন থেকে। পাসপোর্টের জন্য এখন থেকে তহবিল না করলে নয়। আর তহবিল করার মোক্সম পদ্ধতি হলো। উদরের অভ্যন্তর দিয়ে।”

আমি হাসলুম। তিনি গভীরভাবে বললেন, “বুঝি আমার পতন হলো। কিন্তু পতন কি এই প্রথম? একবার যে মজিকজি সেজে আলমোড়ায় বসেছিলুম সেই বা কাম কী! আসল কথা, আমার কিছু পুরস্কার চাই। কিন্তু এই উদরে যাবে। আর তো বাবা নেই যে বাড়ি থেকে টিয়া পাঠাবেন।”

শেষের উক্তিটিতে করণ রস ছিল। আমি সমবেদনায় আঁখির হলুম।

বললুম, “কিন্তু দেশ যে আপনার কাছে অনেক প্রত্যাশা করে, মজিক।”

“—জি না। ছর্বু মজিক ।” তিনি আমার কোটের বাটন্যোত্তলে আঁধুল করিয়ে একটু অত্যন্ত ঘরে বললেন, “দেশ থেকে তৈরি হবে তখন আমার আসব। যদি বেঁচে থাকি।”
তাঁর পর তিনি জানতে চাইলেন তুলনকে তালিম দিলে সে কি ‘বফ রোটি’ ‘রাগু ছ মুর্তা’ ইত্যাদি বানাতে পারবে? আমি পরিহাল করলুম, “রোস্ট বীফ বানাবে চেষ্টা করে নে কি? আপনি?”

তিনি অগ্রহিত হবার পাত্ত নন। বললেন, “ও না খেলে আমার ভাকত ফিরবে না। কিন্তু রোস্ট বীফ নয়। বফ রোটি। আমার ওখানকার মেঘ হাঁপা হবে করাসী ভাষায়। বুঝির হিড়িকে আজকাল কত রাজ্যের লোক আসছে, তাদের সঙ্গ পাওয়া আমার চাই চাই। আগাতেন ওই আমার ইউরোপ, আমার সঞ্চারনী। রায়, তোমাকেও আসতে হবে একদিন। বৌমাকে আমার ধন্যবাদ দিয়ো, ভাই। তিনিও রায় আসেন তো সত্ত্বে খুশি হব।”

(১৯৪৫)
বারের ঘরের পিসা কেনের ঘরের মাসী

আর কেউ নয়, আমিন। আমাকেই একবার ঘটকালি করতে হয়েছিল মকরকেতুর কৌশলকে। কিন্তু প্রজাপতির নির্বাচন ছিল অগ্রসর। সেই ইতিহাস গুলোকে ইতুলা দিয়েছি।

কাঞ্জলির সঙ্গে প্রথম সেখা এক বিভূমাত্রিতে। দূর সম্পর্কের বিদ্রুপ, দূর দেশে ধাঁকে, অর্থিক ব্যবস্থাটিও সহজ। কাঞ্জে তার আগে সেখা হয়ে গেছে। সেখা যখন হলো তখন আমার বয়স শুরুর অভাবে, দিদির মৃত্যু বারের তোর। কে জানতে যে পরবর্তী জীবনে দিদির মৃত্যু আমার চেয়ে ঠাকুর বছর কমবে ও চুম্বিয়ার লোকের সামনে সে আমাকে দাদা বলে ভাবতে।

বিচিত্র জীবন। ইংলিশ যেদিন হুড়ি তার একদিন আগে ঠাঁচা একজন আমাকে বললেন, “ওহে, তুমি তো চললে, তোমার ছোটবোনের দেখাশোনা করবে কে?”

“আমার ছোটবোন!” হতভাগ হলুম। “আমার ছোটবোন কে বিলেব এলো।”

“সে কি! মিলেন বললী কি তোমার ছোটবোন নয়?!”

“মিলেন বললী! কোন মিলেন বললী?”

“কেন, রোমা! দিদির রোমা?”

তখন আমার মনে গড়লুখি কাঞ্জলির খণ্ডেরসুলের পদ্বতি বললী ছিল মডে কিন্তু কাঞ্জলির তো বিলেব আসার কথা ছিল না। খালে আমি জানতুম।

ঠিকানাটা জোগাড় করে সেই দিনই লগনের এক মেহেরের হস্তেই দিদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলুম। সেই মহাবর “কাঞ্জলি” অনিহ সে তার মুখে আলো দিয়ে ইশারায় বললে, “চুপ। চুপ।” সে বাড়িতে আরে। জনকরের বাঙালী ভর্তী ছিলোনো। এবং ছিলো ইংরেজ তফসীর। কাঞ্জলি ফিস ফিস করে বললে, “এই যে অংশ, এসো। তোমার কথাই হচ্ছে। এোদের বলচিলুম এখানে আমার এক দাদা আছেন, তিনি আই সি এস।” তার পরে সবাইকে শুনিয়ে শনিয়ে বললে, “May I introduce my elder brother……"
বরের ঘনের পিলী কনের ঘনের মাসী

কিছু বিলেতের কথা পারে। দেশের কথা চলছিল, দেশের কথাই চলছে। তাহের পাল্লে ছিল কজলমির ভাই টোগেল, অ্যারেক দলে মিলিঃ আমি। কজলমি এসে আমাদের এক এক জনের হাতে এক একটা নাড়ু ধরিয়ে দেয়। তখন আমরা “আর একটা, আর একটা” বলে এক সঙ্গে আবেদন জানাই। এই একটু আগে ঘরা মহাশূন্ত ছিল তারাই হয়ে ধাড়াল মহামিত। সকলেরই আরাধ্য কাজলমি। সে যেন শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মৃতি। আর আমরা যেন পেঁসা মুর।

বিয়েবাড়ির সেই মহা আমার অনেক দিন মনে ছিল। প্রায়ই মনে পড়ত কজলমির, তার মোহিনী মৃতি। যখন তখন যাকে তাকে কখন কখন বলতুম, “আমার কেমন কজলমি আছে, কী মৃত্যু সেখেতে, কী রকম হাইয়েছিল আমাকে।” এটাই পোনাতে তুলতুম না যে কজলমির বাণী মন বড় সরকারী চাকুরে। আর যেই কজলমি কিনা আমার আপন মামীমার পিসুতুো ভাইয়ের মেয়ে।

আমি খুব আশা করেছিলুম যে, অত বড় একটা ঐতিহ্যাসিক ঘটনা কজলমির স্বর্গ থাকবে। কিন্তু বার বার চিঠি লিখেও তার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে মনটা দম গেল। তারপরে তার কথা এক রকম তুলেই গেছেছিল। অক্ষমাত্র আমার নামে একজন চকোলেট এসে পৌঁছেল, তার গায়ে লেখা ছিল, “এই তোমার চিঠির জবাব! মেহনীলা কাজলমি।”

খুব খুশি হইনি, কারণ আমি চায়েছিলিম খবর, দিদি পাঠালে খাবার। মনের খোরাকের বলে মুখের খোরাক। খাবার অভ্যস্ত তুচ্ছ নয়, বিশেষত চকোলেট। কিন্তু আমার বারো তেরো বছর বয়সেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে একদিন চিঠি ওর চেয়ে আরো তুষ্টিকর। যাহোক চকোলেটখানা আমি তুলে রাখলুম, খেলুলু না, থেকে দিলবু না। অনেক দিন গবেষ্ট অক্ষত ছিল ওটো।

তার পরে চিঠি লিখিনি। হয়তো ঠাওরাতে, চেলোরা কী শাঙ্গা। কবে একটা নাড়ু হাইয়েছিলুম, সেই থেকে আরো কিছু খাবার ফলিতে এসব চিঠি। এই তা। সেদিন একটা চকোলেট আদায় করলে। তবু—

কে জানে হয়তো এরা ঠাওরাতে যে বাপ মা গলবিয়ে, কোথায় পাবে থেকে, স্বরে একটা কেকটেক গাঠিয়ে।
কী লচ্ছা! আমি চকোলেটধানা বাংলা থেকে বরে করে পাড়ার ছেলেদের খেলায় ও বাই।
নে ঘটনায় তুলে গেছলুম।

তার পরে বখন আমার বয়স খোলা। সেদের—উচ্ছ, সেদের আঠারো—তখন কলেজের ছুটিতে পুরী গিয়ে দেখি, কাজলদিদি। বেঁচারির পোড়া কপাল।
বিদায় করিন পরেই বিধবা। কী চেহারা ছিল, কী হয়েছে। চোখে জল আলে। বার বার করে কেঁদে ফেললে, যেই বললুম, “কাজলদিদি, কবর বিদেশ করলে, ধরে দিলে না কেন।” তা দেখে আমি আমার চোখের জল ধরে রাখতে পারলুম না।

কিছুদিন আগে আমারে মাতৃবিয়োগ হয়েছিল। সহাস্বীকারী কাজল ছিলুম আমি। কাজলদিকে সে কথা বলায় সে তার ব্যবস্থায় সর ভরা চেলে দিলে। “চুপে মুখোমুখি, গভীর দৃষ্ট দৃষ্টি, নরমে জল বরে অনিবার।”

আমি ওকে রবীন্দ্রনাথের “নবেতন”, “খেয়া”, “গীতাঞ্জলি” গড়ে শোনালুম।
কতোক সাংবাদিক গেলে জানিন, কিন্তু আমার ধর্মবাদ দিয়ে বললে, “আমি, ভুমি আমাকে বুঝালে।”

এর পরে আমাদের চিঠি লেখায়রিয়া চলেছিল চুড়ায় মাস। পুরী থেকে ও আরে দক্ষিনে বায় তীর্থ করতে। আমি ওর টিকানা। হারিয়ে ফেলি কি ওই আমার চিঠি খোঁজার। যে কারণেই হোক চিঠি লেখায়রিয়া আপনি বস্ত
হয়ে যায়।

বছর দুই পরে কলকাতায় কাজলদির সঙ্গে এক ঘটনার জন্য দেখা।
চোরের ওখানেই প্রথম স্মৃতি লাভ করলুম। আমার কাজলদিমা মামাতো
ভাইয়ের ছেলে রাখাল চৌধুরী। অত্যন্ত ছুটে লোক, এক মূর্তি চুপ করে
বলে থাকার পাত্ত নন। চোরের উপর পায়চারি করতে করতে কাজলদির
তখন আইসকোম খালিয়ে, আমার কাজলদিকে আপনি বলিয়েছিলেন। শুলিলুম
দিদির টিউটর। তীর্থরমণের পর দিদির পতা পড়তন্ত্র মন গেছে, প্রাইভে
ম্যাট্রিক দিবে। কলকাতায় তার বাবা, মিটার সরকার, সম্প্রতি বদলি হয়ে
এসেছেন। দিদি এখন বাসের বাড়ি থাকে। ধর্মবাদের সঙ্গে সম্মত নেই।
কাঠা বিনেরই বা সম্মত।

পুঁজুর্লক করলুম দিদির মুখখানি শরীরের আকাশ। কাজলদি। মেয়ে
নাহাইছে বিষ শালা মেয়ে। দিদি যেন একটা স্থিতি পেয়েছে। তার ফলে
বন্ধুর ঘরের পিয়ী কনের ঘরের মাসী

তার চেহারাও কভিক ফিরেছে যে, আমাকে বললে, "পড়া পানায় তুমি আমার চেয়ে তিন বছর এগিয়ে গেছে। অতএব তুমি আমার দাদা।"

তখন ঠাকুর হয়নি যে সেই স্বাভাবিক কাজলিদিকে আমাকে দাদা বলে ভাবতে। আবার যখন কলকাতায় দেখা হয় মাস ছয়ের কাছে তখন দাদা। ভাব, এতে চমক লাগল। সেবারেও আমার সময় ছিল না। সেবারে কিছু রাখালালকে দেখিনি।

তারপরে মিটার সরকার শিল্প বদলি হয়ে যান, কাজলিদিকে ম্যাট্রি পান করে। অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছিলুম, তার উত্তরে নে লিখেছিল, "যেন তোমাদের যোগ্য হতে পারি।"

আড়াই বছর পরে পাটনায় খবর পেলুম নতুন পোস্টমাস্টারের জেনারেলের নাম সরকার এবং তার ছেলের নাম টোপো বাপের চেয়েও ছেলের নামস্তাক বেশী, ও নাকি মোহনবাশানের খেলত। টোপো একদিন আমারের কলেজে এলে, তুর্কি হলো আমার নিচের ক্লাসে। আমাকে দেখে চিনতে পারলেন না, কিন্তু আমার নাম তুমি বললে, "হ্যা, মনে পড়েছে, ও নামে আমার এক দাদা ছিলেন বটে।" আমি ততই বলি, "আমি যখন ছোট, সে ততই বলে, "তা হলে আপনি অন্য লোক।" বুঝতে সময় লাগল যে, টোপোর মানহানি হয় যদি কোন বলে সে যেসব বড় হয়ের নিচের ক্লাসে পড়ে। অগত্যা আমাকেই দাদা সাজতে হলো। তখন টোপো আমাকে বাড়ি নিয়ে গেল।

কুই আশপাশের কাজলিদিকের মা মিসেস সরকারও রান দিলেন যে আমি টোপোর চেয়ে তো দুই কাজলের চেয়েও বড় বড়। এবং আমার মতো অবিশ্বাসীকে বিখ্যাত করানোর জন্য কাজল ও টোপো ছ'জনেই ছ'খানা। ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে একনিষ্ঠ হলেন। তাতে বয়সের ঘরে যাচ্ছিল তার যদি সভ্য হয় তবে "সেই সৌভাগ্যে কাজলিদিকের অনেক লিখি চিঠির স্মারক তুটে।"

এবং সবচেয়ে আশ্চর্য কাজলিদিকে আমার বললে, "তুমি আমার চিঠি খুঁজে দেখে বলে আমার কেমন হয়ে একটা ধারণা জানায় যে আমি বড়। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি ওটা আমার তুল। ও তুল আমার বাড়ীতে টুকে বিয়োর চিঠি দিয়েছিলে তুমিই, অন্নালাম।"

এর পরে আমিও ওকে সরাসরি কাজল বলে ভাবতে ভর করি। তা পুনে ও এত খুশি হয় যে ঠিক ছোট বোনের মতো আমাকে বস্ত করে খাওয়ায়।
হস্টেলের রাস্তায় আমার অর্জি ধরেছিল, আমি তো বর্তে গেলুম। বললুম 
“শুধু দানা কেন ঠাকুরদাদা হতেও রাজি আছি, যদি হপায় একবেলা তোমাকে হাতে খেতে পাই।”

শনিবার বিকেলে ওদের ওখানে আমার বাংলা নিমন্ম। ফিরতে রাত হয় বলে রাতের খাওয়াটাও সেরে আসি। কমশ রবিবার বিকেলেও অনাহত উপস্থিত হই, এবং হস্টেল থেকে বিতাড়িত হবার ভয়ে সচরাচর আপেই কবি।
কাজলদিই আমাকে স্টোভে রেঁধে খাওয়াত। সীথবা বলে ও খপাক রেঁধে খেত। কিন্তু ওর নিরামিষের তালিকায় মাছ-মাংস ছিল। ভাজারের চুক্ত 
তাতে আমারই হবিদে। আমিও সায় দিয়ে বলতুম, “শরীরমান্ত খলু ধর্মাসাধনমগুল।”

কিন্তু মাছ-মাংস খেলে হবে কী, শনিবার বিরত যা গড়া সে পড়ত তার ফলে তার শরীর ধকিয়ে কাঁধ হয়েছিল। এমন কি রাতেতে রাখতেও বইয়ের পাঠ। 
গলাট। আমাকে জিজ্ঞাসা করত যত সব কেতাবী প্রসার। যা খাওয়াতে 
তার স্বাদ আদায় করে নিত আমাকে সমন্তক বকিয়ে।

“আচ্ছা, কাজল,” আমি মাঝে মাঝে রাগ করতুম, “তুমি যে ঐ অত্রীত খেলে ওতে কি তোমার পড়াতানা চালিয়ে যাবার মতো সামান্য হবে।”

“বিধবা মাহেরের,” সে জবাব দেয়, “ওর বেশী খেতে নেই।”

এ নিয়ে গৃহীত আমাদের ঝগড়া বাধত। আমি বলতুম, “তুমি কি ফিরের বিধবা! বিরের একমানও যায়নি—”

“আমি তবে কী?” 

“কুমারী।”

সে মনে মনে খুশি হয়, কিন্তু বাইরে বিরাগের ভান করত। “ওয়াই বিয়ে হলো, সব হলো, কুমারী। হি! কী যে বল, দাদা।”

একবিং আমি তাকে গোলাক্ষস্বামে বললুম, “ধাবা বলেছ যখন, তখন 
দাদার কথা গুনতে হবে।”

“কী কথা?”

“তুমি যে দিন দিন অমন করে ধকিয়ে যাচ্ছ এ আমার চোখে লয়। আমি আয় আসব না, যদি এর প্রতিবিধান না করে।”

“প্রতিবিধান।” সে একটু চিন্তিত হয়ে বলল, “তবে কি তুমি চাও আমি
বরের ঘরের পিরিক কলের ঘরের মাসী

পড়াজন্য বসে করে দিই? দিলে কি নিয়ে ধাকব? বিধবা মাত্রের একটা অবলম্বন ধাকা চাই তো?

“আবার বিধবা! বিধবা নয়, কুমারী।”

“বেশ, বিধবা নয়, কুমারী। কিন্তু কুমারীরই বা করবার কি আছে!”

“কেন, বিদেী?”

“বিদে দেবে কে? তুমি?”

“কেন, তোমার মা-বাবা?”

“মা বলেন, পড়ছে পড়ুক, খিড় বিয়ে আমি কিছুতেই দেব না। বিভাগাটির মুখে আগুন। আর বাবা বলেন, দিতে পারি, যদি বিন। পলে আই সি এস, কি, আই এম এস পাত্র পাই।”

আমি হেসে বললুম, “আর টোগো?”

“টোগো বলে, আমি ম্যাচ বলতে বুঝি ফুটবল ম্যাচ। আর কোনো ম্যাচ বুঝিনে। নিজেও কবর না, তোমাকেও বিয়ে করতে বলব না। তাইবানে যেমন আছি তেমনি ধাক্ব চিরকাল।”

“কথাটা ঠিক। ম্যাচ বলতে যা বোঝায় আমিও তার বিপক্ষ। কিন্তু তালোকে বিয়ে করায় আপত্তি কি?”

দিদি তা জুনে হেসে আকুল। আমি যেন কি একটা বেঁধাপ কথা বলছি।

সেদিন দিদি আমার হাতে একতারা কাগজ খুঁজে দিয়ে বললেন, “খবরদার কাউকে দেখিনহে না। পড়া হয়ে গেলে লুকিয়ে কেরৎ দিয়ে। লখিতাকট্ট, আমার মূখ হাসিয়ে না।”

হস্টেলে ফিরে আলো জেলে পড়তে বসি। পাঠ্যপুস্তকের ফাকে অপাষ্ঠ চিঠি। পরের চিঠি পড়তে একটুও ভালো লাগে না, মনে হয় পাপ করছি। একবার চোখ বুলিয়ে গিয়ে বুঝতে পারলুম গুলি প্রেমপত্র। রাখালায় লিখেছেন কাজলদিকে! খুশি হলুম। কারণ রাখালায় এম এতে ফাঁসু ক্লাস পেয়ে প্রেক্ষাসাদ হয়েছেন। উপায় থাকলে বিলেট যেতেন, অন্যকেরি কি কেটেছের জিনি নিয়ে ফিরতেন। তার মতো পাত্র বিনা পলে পাওয়া দুর্লভ ভাবে।

পরের শনিবার কাজলদিকে বললুম, “ভাবছ কি? চোখ ডুবে বুঝে পড়। এমন পাত্র হতেছাড়া করতে নেই। আর এ তো অর্ধ পাত্র নয়, প্রেমিক।”

14
কাজলদি আমার গলে এক ঠোঁটা মেয়ে বললে, "ছুটু।"
তার পরে আমার দুঃখের পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লুম বিড়িকি দিয়ে রাস্তায়। কাছেই ছেলেলাইন, লাইন গেছিলেন বন। সেদিন আমাদের কথাবার্তা কি ফুরুয়। সে আমাকে সমতল চুলে বললে গোড়া থেকে।
সেই যে আইনীকী খাওয়ানো। তার করেক্কাম পরে রাখালদা বিয়ের প্রস্তাব করে। প্রস্তাবটা সেই কর্তোগিরিন কানে গেল অমনি তারা তেলে-বেলেন অলে উঠলেন। কর্তা বললেন, "যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। বামন হয়ে ঠাল্লে হাত।" গিরি বললেন, "আমি তৃষ্ণায় দিয়ে কাগজাপ পুকুরেছিল গো। ছেলের মতো ভালোবেছিলসম। হায় হায়! কী অস্তিত্ত্বে তাই করলে।" রাখালদার আসা বারণ হয়ে গেল। কাজলদিকে পড়াতে এক বাহাদুরের বুড়া বহাল হলেন।
কিছু চিঠি লেখা বস্তু হলো না। পিল্লে রাখালদা একবার হাওয়া-বদলের জন্যে গেছিলেন, হোটেলে উঠেছিলেন। কথাটা পেশ করা হয় পাচজন ভর্তোলেরকের মনকুট। কর্তা তাদের অর্গমান করে তাড়িতে বিদিলেন। গিরি তাদের কাছে মাথা চেয়ে পাঠালেন, নইলে অনেক ঘুর গড়ট। তার পর থেকে রাখালদার চিঠি লেখায় ইতি। কাজলদি বার বার দিখে উত্তর পান। শেষ বার লিখেছিল পাঁচ। বদলদির কথা দিয়ে।
কাজলদির জীবন ভাবনা রাখালদা হয়েছে। আমার কাউকে বিয়ে করে শেষ তুলবেন। হয়তো একবারে বিয়ের কথাবার্তা বেশ কিছুদূরে এগিয়েছে। কিন্তু ভেবে তো কোনো কুলকিনারে নেই। যা হবায় তা হবেই। কাজলদি তার কী করতে পারে। ধুলো অনেক মন ধারণ করার চেয়ে চর্চা ঘটা লেখার গড়া করা। ভালো, তাতে মনটাকে তুলিয়ে রাখা যায়। তবে হ্যা, শরীরটাকে ভোলানো শক্ত। এমন তীব্র মাথা ধরে হয় ম্যাসুগিরিন খেলে হয় ইমামেশ।
চু একজন বুধের সঙ্গে আইনের কথা করে কাজলদিকে একবার বললুম, "বেন, আইন ভোমাকে রাখা দিচ্ছে না। ধরেও বাধা নেই। ইচ্ছা করলে, তুমি নিজেই নিজের বিয়ে দিতে পারো। লজ্জা করে তো আমার বলো, আমিই ভোমার বিয়ে দেব। থাকে কই পাচ্ছ কেন? অনেক করে তুমি কাজলদি বিচে বলো তো আমি চেষ্টা করি।"
"তার মানে।" সে চমকে উঠল। "কাউর সঙ্গে চেষ্টা করবে?"
বরের ঘরের পিলি কনের ঘরের মালিক

"ধার সঙ্গে তোমার গ্রেম তো সঙ্গে। রাখালদাদ উপর আমারও তো
একটি দাবি আছে। আমি যদি অহবান করি তো তিনি আর, কাজলকে বিয়ে
করবেন না। 'আমার দাদা তিনি, আমার কথা রাখবেন।'

কাজলকি কেমন এক ইচ্ছামতীর মতো হেসে বলল, "আছে, তা। হলে তুমি
তাকে চিঠি লেখ। কী জবাব দেন নেহে।"

আমি অনেক খেতেছি একখানা ভারী চমৎকার চিঠি খাড়া করলাম।
দিকেরে সবকিছু ফিলুম না। যদি আমার উৎসাহের মাধ্যমে ঠাঁচ।
চিঠি তো তোলে, আমি আমার ধূম ধূম করে বস্ত রকম প্লান্ত উঠিতে ধাকলুম,
কোথায় বিজেটা হবে, হিংসা মতে ন। তিন আইন অর্থসার। বিদিয় যা
বাবার চেয়ে ধূলা। দেওয়া যায় কী করে, শেখাকাঁদি যদি ওরা তাকে নিলজন নয়
করেন তো কী উপায়।

যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াগড়ির ধূম নেই। দেখা গেল ছিড়ি
সম্পূর্ণ উত্তাম। বলে, "আমি ধামকে অত তূলে কী হবে! চিঠির কী
জবাব আছে দেখ। হয়তো তিনি অন্তত এনুপেচ্ছ।" মুখকি হাসে।

অবেশেন রাখালদাদ উত্তর দিয়। তিনি সিখিলেন, তিনি আমার মতো
সাহিত্যিক বা সাহিত্যের ছাড় নন। অন্য চমৎকার চিঠির উত্তরটা যদি
চমৎকার না হবে আমি যেন তাকে কর্ম কর। তার যা বলবার আছে তিনি
তা মুখে মুখে বলতে চান। আমি কি তার সঙ্গে কলকাতায় দেখা করতে
পারি? ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে তিনি পাটনা আসতে ক্রুড়ত।

অগভী আমারকেই কলকাতা যেতে হলো। রাখালদা আমাকে তাঁর
যের অভিধি করলেন। ছুই ভাইয়ের মনের কথা বলাবলি হলো।

"আমিও আমি তুমি তোমার কাজলদির ছুঁখে ছুঁখ। তুমি তাঁর ছুঁখ
দুর করতে চাও। সাড়ু, সাড়ু। কিন্তু তোমার সিদ্ধির ছুঁখ যাকে ভাবছ,
সেটা একটা প্রশস্ত স্বী। তিনি নিজেই সেটাকে পুষ্টে রাখতে চান যে।
তুমি করতে কী। আর আমিই যা তার কী করতে পারি!" নিষ্ণুর রাখালদা ক—

"বিবাহ হচ্ছে না। আমার কথা। তবে শোনো বল। কাজল এখনো
তার সেই আমারকেই ধ্যান করছে। পাছে না বলে রোধ করে যাই পড়ছে।
না, তাঁর আনন্দকাল। নেই। সে আমার জন্য পড়ে না। এমন কি পাল
করার জন্যও পড়ে না। সে পড়ে সেই আত্মীয়ের জন্য। এ বেলা
নিজেকে নিজের হাতে চাবকানো। শরীর তো তেজে থাকবেই। আর ঐ মিয়াসগিরিন হচ্ছে কাটা ঘাড়ে মনের ছিটে। জ্বেত উদ্যুদীনা বাড়ে। বুকের, ভাই, তোমার কাজগুলি হচ্ছে যাকে বলে masochist অর্থাৎ মর্দকার।"

আমি মনেবিকল্পনের বিশেষ কিছু জানতিনা, তবে মোকামাট এই বুকতে যে, কতক লোক আচ্ছে তারা যায় খেতে ভালোবাসে। তাদের মন পেতে হলে মার লাগাতে হয়। আমার দিদি যে তাদের একজন একথা কর্কে। আমার মনে উঁচু হয়নি, তাই রাখালদাদার উপর চেত গেলুম। কোথায় এক তুলো গলুন্ড একেলে টোলের বিষাদগঞ্জ। এই পুত্রি পোড়োর সঙ্গে তর্ক করে ফল করী।

আমি কোস করে উত্তে বললুম, "রাখালদা, আপনি সোজা বলে দিন যে শুকে বিয়ে করবেন না, ওর চেয়ে ভালো মেয়ের সম্ভাবনা পেয়েছেন। মিথ্যে বেচারীকে অপবাদ দিনছেন। আর এ কি বড় সামাজিক অপবাদ! একথা গুলো কোন মেয়ের না লঙ্ঘায় গলায় দড়ি দেবে!"

রাখালদা অল্পহাস্য করলেন। বললেন, "বাইশ বছরে তুমি সবজাত হতে পারেো, কিন্তু ব্রিয়াক্ষটিমূৎ-বুকের ভাবে এখনো তোমার অপটিত। এটা অপবাদই নয়, বরং সুখ্যাতি। আলোতে তোমার কাজগুলি গলায় দড়ি দেবেন না, গলায় অ চাল বিয়ে ধারীর কোটার পায়ে গড় হচ্ছে প্রাণাম করবেন। বললেন, এত প্রহারেও যদি মায়া না। পাই তবে, যে আমার পাত্রো, মায়ারা আমায় আরো আরো। মিয়াসগিরিন দিয়ে ফলা সারা।"

আমি আর ওদে প্রক্ষ ছিলুম না। উত্তে চাইলুম। রাখালদা বললেন, "ও কী! তুমি এই দুর থেকে এলে, অমনি ফিরে যাবে! না, আজ তোমার যাওয়া হতে পারে না। তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি। এই যে চিঠিগুলো এগুলো বসে বসে পড়ে। আমি ততক্ষণ যুগে আলি।"

কাজগুলির চিঠ এক রাশ। উচ্চতরি প্রাণনিরস্বজন। কোনোখানেই তার মুখুর্পুর্ব সাতির নামোগ্য নেই। বেশ কুমারী মেয়ের চিঠি। তারা যা কিছু ভয়, যা কিছু ভাবনা তার মা বাবার জন্য। তীরা যে রাজি হবেন না। এটা সত্যশ। তাদের অবাধ হওয়া তার অগ্রনী। তার কেমনো ধরে দীরে তাদের মত বলালো। মেয়ের কে দেখে তাদের মন গলবে। একজন তীরা তার বিয়ের প্রাণাম যায় দেবেন। ততদিন অপেক্ষা করা তার কর্ণব্য এবং রাখালদা যদি তাকে ভালোবাসেন তে রাখালদারও।
কিছু রাখালদা কি তবুমি অণেক। করবেন! কি জানি। পূর্বের বন্ধ চিত্ত চক্ষু।

শিলাংের সেই অবমাননার পরে সেবার চিত্ত লেখা হয়েছে তাতেও কাজলদি তাকে আশা রাখতে বলেছে, অণেক করতে বলেছে। পিতামহের হয়ে মার্জনা ভিক্ষা করেছে। বলেছে অপমানের আঘাত শতধর্ণ বেঁধেছে শিবের চেয়ে সতীর গায়ে। সতীর মতে সে হয়তে দেহত্যাগই করবে, কিন্তু তিলে তিলে। তবে যদি তাঁদের চৈতন্য হয়।

রাজে রাখালদাকে বললুম, “কই, এর মধ্যে শর নামীর কথা কই ? এর যে শান্তি ছিল তার উল্লেখ পর্যন্ত নেই।”

“তুমি হেলেলমান্ধুষ!” তিনি আমাকেই দোষ দিলেন। “চিত্ত কী করে পড়তে হয় তাও শেখিন। আর কাজল এত কঠো। মেয়ে নয় যে, সোনা ভাবায় বলবে! এসো তোমাকে দেখাই!”

চুরিকানা চিত্ত তিনি এমন হুরে এমন অর্থপূর্বভাবে পার করে শোনালেন যে, আমার মনে হতে লাগল যার চিত্ত সেই বলতে পারে এর মধ্যে কি আছে না আছে। রাখালদার কথাই মেনে নিলুম।

তখন তিনি আমাকে তাঁদের চুর্যনের সমন্ত আহরণী কোনালেন। তিনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, এখনো চান, বিধিকে বিচারতে। তিনি যদি না বিয়ে করেন, কেউ যদি না বিয়ে করে, তবে দিদি বিচারে না। দিদির জন্য আমার মন না মাধবায়া তাঁর তত্ত্বাধিক। কিন্তু তিনিও কিছু করতে পারলেন না, আমিও পারব না। কারণ দিদি বিচারে চায় না।

“সে কী, রাখালদা! এ জগতে কে না চায় বিচারে! সামাজে ধুলিকাপাটুষ্ট, সেও বলে, মনিতে চাহি না আমি ভুদর ভুতনা—

“এটা তোমার কবিতা। তোমার দেওয়া অনেক শিক্ষা বাকি আছে। ধূলিকাপূর্ণ কী বলে আমি, কিন্তু মানুষ না বলে তাঁর কোনো যে সত্যি কোনো যে মিথ্যা মুনিরাও বুঝতে পারেন না। কবরা তো কমি।”

তারপর জুড়লেন, “তোমার কাজলদি কোন অকাতরে মিথ্যা বলে তা ছি তুমি জানে।”

ফিরে এলুম। কাজলদি সব জুর। অনেক বলত, কেমন, হলা তো!?”

তারপরে এক সময় মন ভুল। “আমি তুমি অনত একশো রুকিয়েছি যে ওর ঐ সমস্ত ভুল। পূর্বতনীর ফোটোর কথা ছিরিনিট বাড়ানোর,
এক দিনটি চোখ বুজে থাকা, হচ্ছাড় চোদ্দ করে আছিলের কপালে ঠেকানো—
এর সঙ্গে বর্তমান ঘামের গ্রিটি অচেরার অগামার্য কোনো? মৃত পদ্মী
ধরে উনিশ এক্তাবে না এক্তাবে অবাকাপন করতেন। আমি কিছু মনে
করতুম না।"

লেখা ঠিক। আমি একমাত্র হলুদ।

tারপর বিদি ফিক করে হাসল। "মৃত পদ্মী না থাকে, জীবিত বোধি
আছেন। আমি কি কোনো নিন কিছু মনে করেছি?"

tামি গল্পেং, "মিথ্যা কথা।"

"মিথ্যা কথা। আছে, আমি না হয় মিথ্যাবাদী, অঙ্গের বলকান্ত।
গেলেওরা তিনগুলো গোড়া কোরে।"

"থি। এ কি কথনা সত্যি হতে পারে।"

tে তানে! উনি যদি নিজের থেকে না বলতেন আমি কেমন করে
জানতুম। উনিশ তো বলেছিলেন এখনি, কাজল, আমাকে বাচাও,
আমাকে উত্তার করো, আমি যে তুমি বলেছি, তুমি যে তুমি চাই,
কমলি নেই হোকতি।...বুকতে পালিয়ে, না আরে ভেঙে বলতে হবে।"

t রাম। আমি কানে আঙুল দিলুম। কেন্দ্র খুজতে গিয়ে সাপ
বেলো।

"একটা মাছুষ তুচ্ছ মরছে দেখলে কার না ইচ্ছে বায় জলে ঝাপ দিতে।
আমি ঠাকুরের দুকে বললুম, ঠাকুর, আমি ঝাপ দিতে চললুম। তোকে যদি
বীচাতে পারি তো বাচব। বনতো মরব। যে ঠাকুর, বল দাও আমাকে, বল
দাও ঘুরকে।...বিয়ে আমারের হয়নি, তা তুমি জানো। কেন হয়নি, তাও
আনে। কিন্তু গ্রামগঞ্জে তাকে বীচাতে চেষ্টা করেছি, উপদেশ দিয়ে নয়, প্রেম
বিয়ে। আমার ক্ষেত্র ভাল এই যে, তিনবার বাচানো না, আমি ও রমলুম।"

tের পরে আমি আবার রাখালদাকে চিটি লিখি। তিনি যখন বিয়ে করতে
আনে। রাজ্য আর ইনিও ইত্যাদি, তখন পরমাণুকে অগ্রিয়ে ঘরে দুবে মরার
কোনা মানে হয় না। বিয়ের পরে আপনি একটা বোঝাপড়া হবে, হুমকে
ফ্রান্কে বীচানে। সাবালিক ও সাবালিকার বিশ্বে ওলনের হত্যক্ষেপ
পরিচিত। পোস্টমাটার জেনারেল যদি না সমবেক তে তাকে সমবানের
জন্য উকিল নিযুক্ত করা যাবে।

কিছু রাখালদা কেমন করে তের গেলেন যে, কাজলদি আমাকে তার
বন্ধুর ঘরের পিসী কনের ঘরের মালী

বন্ধুর ঘরের পিসী কনের ঘরের মালী

বন্ধুর ঘরের পিসী কনের ঘরের মালী। আমি উল্লেখ করিনি, সেটুকু অথবা আমার ছিল। কিন্তু কবিত্ত কলাতে গিয়ে পরম্পরাকে অভিযুক্ত ধরে ধরে ভুবে পড়ে। ইত্যাদি লিখেছিলাম। পরম্পরাকে বাচানোর উদ্দেশ্য করেছিলাম। তার থেকে যা অনুমান করবার তা অনুমান করতে তার এক মূর্ত্তি লাগেনি। অবাব এলো, চাচা, আপনার বাচা। কেউ কাওকে বাচাতে যাবে কেন? যে দার নিজেকে বাচাক। যদি কোনো আবাসক নেই। যেই না করলেও মায়ের বেশ চলে যায়, বেশ চলে যাচ্ছে।

চিঠিপত্র কাজলদিকে দিলুম। তারই উদ্দেশ্যে লেখা। সে একটা উল্লেখ খবর করে আমাকে দিলে। আমি নিজ হাতে নকল করে পাঠালুম। তাতে ছিল, তা হলে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন কেন? বিয়ে কি আমার কথাতে করবেন না? যদি চিঠিকুমার থাকে। সিদ্ধ করে থাকেন তো সেই স্বয়ংবর দিয়ে সহবা করবেন। হরিনামের গুণে গহন বনে শুই তর মুক্ত্রে। কাজলদিক আমার দুর্বলে যাবে না, যদি শোনে আপনি চিঠিকুমার থাকবে।

এবার যে জাব এলো তা আমার জুটে নয়, কাজলদির মনে। আমি ভাবি হবে। পরের চিঠি পড়া আমার বারণ। চিঠিপত্র দিলুম, তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। চিঠিপত্রকে বুকে ঢেপে ধরেন যে চোখের অক্ষরাল আমি মিঠ মাতল।

এবার আমি তারই লেখা খবর। আমার লেখা যথেষ্ট ভাবে বাক্যকে পাঠালুম, পড়ে বেলেখুম না কি ছিল তাতে। অবাব এলো তারই নামে, আমার কেয়ারে। এরপর যথেষ্ট ঠিকানা লেখা ও ধরে বক্স করাও কাজলদি আমার হাত থেকে খুঁজে নিন। আমার কাজ হলো চাপাশ্বিন ও ভাব-প্রত্যেকের কাজ বাঁচায়ে দেওয়া। কাজ ছিল। কাজলদির মা ভাবকের সঙ্গে বন্ধোবস্ত করেছিলেন—মেয়ের নামের চিঠি তিনিই হস্তক্ষেপ করতেন। আর মেয়ে কাউকে চিঠি লিখায় চাপাশ্বিনকে বল ছিল তাকে একবার দেখিয়ে নিতে।

পোস্টমাল্টার জেনারেলের চোখে ধুলা। দিলুম, কিন্তু পোস্টমিনিস্টেল জেনারেলের হাতে ধরে পড়ে গেলুম। তখন আমাকেও সর্বনা করা হলো। রামলালদার মতো। সমাজতন্ত্র নিয়ে নয়, সেটা আজকাল উঠে গেছে। কিন্তু সেই মনোভাব দিয়ে। আপনার পরিপাক করে হস্তেলের ছেলে হস্তেলে ফিরলুম। আর ও-মুখে হইনি।
তারপরে পাটনা ছাড়ি। কাজলদিদির সঙ্গে শেষ দেখা হলো না বলে মনে আঁখে ছিল, কিন্তু আনন্দও ছিল এই কারণ শেষের ভাল প্রণয় জোড়া দিয়েছি। কলকাতায় ঘাড় পড়ে শেষ করীর ছুঁতিন দিন থাকি। দিনির সেই কথাটা ধুরিয়ে ফিরিয়ে দিল। তিনি ও-কথা হেলে উঠিয়ে দেন। “হে হে। নিজে ভাজেন নয় কি। তাই করল। করে অন্যপ্রসাদ পায় যে আমিও ভার্জিন নই। শেষ মেয়েলি করল। তোমায় চেলমাঝখয় শেখে যোগা ধরিয়ে দিয়েছে। আমাদের মেনেবিজ্ঞেন এককম কেল শত শত আছে। একটা ধীরসিদ লিখলে হয়।”

কিছুদিন পরে আমি বিলেত চলে যাই। বলা বাহুল্য, কাজলদিদির ভুলে যাই। চুব্বর তাদের কোনো খবর ধরে যাই। অবশেষে যেদিন ইংরাজ ছাড়ব তার একদিন অর্ধে হঠাৎ ওনলুম আমার ছোটবোন লগনে।

সেই মেয়ে হ্যাটেল থেকে কাজলদিকে নিয়ে যাই দোকানে একটা উপহার কিনে দিতে। পথে জিজ্ঞাসা করি, “মিসেস চৌধুরী হতে গালে না, মিসেসকে বল্লী বরে গেলে।” কার দোকানে বলে ভে।

“দোষ কায়ে। নয়। আমার নিয়তি। আমাদের নিয়তি।...কমলির একটা ছেলে হয়েছে। অবিকল ওর মতো দেখতে। কমলি কেন ছাড়বে ।”

আমি ভ্যানান্ড শক্তি গ্লুম। বিখ্যাত করলু না, বললু তা হলে সব চুকিয়ে দিয়ে বিলেত পালিয়ে এলে ।?”

“না। চুকিয়ে দেবে কেন ।...এই দেখে, বিনরাত বুকে বুকে রেখেছি।” যা দেখালে তা একটা লকেট। তাতে ছিল একটমাত্র ইংরেজী হরফ। “R”। রাকাশদাদার নামের আজ-আফর।

তখন আমার দেখাল হয়নি, হলো বহ কাল পরে, কাজলদির আসল নাম যে রয়। ততদিনে কাজলদি থরে।

(১৯৪৫)
অঙ্গারতমক্ষ

এমাননীয় মহোদয় দেবার আমাদের শহরে স্বাগমন করেন ওঁর গুপ্তমুখা তুকে একটি প্রতিভাবোধ দেন। আমাদিত্য সকলেই পুরুষ, হৃদারাজ আমার রাজ্যপুরুষ।

এ ধরনের পার্টিকে বলে স্ট্যাগ পার্টি। মাঝে মাঝে স্ট্যাগ পার্টিতে যেতে ফেলা লাগে। মহিলারা অনুরুপ ধাক্কার প্রাণ খুলে হাসি মুখকরা করা যায়। অনেকের আসামের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের যে মরু সহচর যে মরু সহচর মরু মধ্যে আনেন এ বিশ্ব এত দিন সহচর ছিল। তিনি নিলেন কক্টেল বিভাগের ভার।

খানা টেবলে বসে পিনার চুম্বক দিতে দিতে সাফল্যের প্রশংস উঠল। জীবনের সাফল্য। আমাদের ভাবার সাহেবের মেজর দাস বললেন, ‘আমাদের পর্ন্য বাগচীর secret of success কি, জাননে?’ বাগচী যে আজ এক তর উপলব্ধি করেছেন তার সীকেট আর কিছু নয়, একটি কথা।”

নেই কথাটি কি কথা তা তিনি একটি একটি করে বললেন। বাগচীর নাম আমরা জনেহিলশুন, যিনি জীবনে এই প্রথম জনেহিল সী। মাত্র ভাব, বাগচীর যে ভাগ্যবান পুরুষ ভাগ্যবানদের মধ্যেও বিবেচনা। চোষের যে পুরুষ সমস্ত উপলব্ধি লাভ। কিন্তু কই, উদ্দীপনা লোকের তো অভাব নেই, তবু কেন বাগচীর মতো লোক এত কথা দেখা যায়।

আমরা খাওয়া চোরা শোনায় মন দিল। কে জানে হয়তো। আমরাও এক একজন বাগচী হয়ে নরম সার্বম্য করব, যদি জেনে রাখি বাগচী হওয়ার সীকেট।

বাগচীর গলা যখন শেষ হলো তখন সাফল্যের নেশা আমাদের মাধ্যমে চর্চা হয়। অবশেষে নিয়ম সাফল্যের নেশা নয়, অল এক নেশা। নেশার যে যে একজন গুপ্তমুখ কল করে বলে বললেন, “সত্য দুর মেতে হবে না। এই তো আমাদের সম্ভাবেই বিবাহ করেছেন সাফল্যের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের সহায়তা অতিথি। বাংলাদেশে বাগচী জয় যখন তখন, কিন্তু ইনি হলেন সংশয়।” বাগচী। রেখে দিন আপনার বাগচী।”

তখন আমরা সকলে চেনে ধর্মনু, “সার, আপনার সাফল্যের সীকেট কি? আজ আমাদের শোনাতেই হবে।”

ঝুলোড়া তা তো মৃদু মধ্যরাত হস্তলাম। তাঁর পাড়ির উপর দিয়ে তরল
হাসির চেহারা খেলে গেল। বাড়িটি ফাঁসী ধরনের ছাটা, যদিও তার সব কটি চুল শাদা। মাননীয়ের বয়স খাটের উপর। কিন্তু প্রস্তুতির পরিপাটি তুটি বুঝতে দেয় না।

সেদিন আমাদের পীড়াপূর্ণের শেষের মুখোশ খুলে পড়ল। তিনি আমাদের সঙ্গে সমান হয়ে বললেন, "হা হা। আমার তো secret of success নয়, আমার হচ্ছে secret of unsuccess। সে কি আপনাদের শুনতে ভালো লাগবে?"

আমরা বিষ্ণুত হলুম। বিশাল করলুম না। ভাবলুম ইনি কেবল সাফল্যের প্রতীমুক্ত নন, বিনয়েরও অত্যন্ত।

গুল্ম আমার কান কানে বললেন, "মিথ্যে নয়। কয়েকটি কোম্পানি ফেল মেরেছে তাঁর ম্যানেজমেন্ট।"

সারকিট হাউসের ভাইনিং কম থেকে আমরা সকলে ফাইন কম একে জমিয়ে বসলুম। কফি খেতে খেতে মানুষকে খোসাবাদ করতে খবরলুক তার সিকেটেটকু জানতে। তিনি কি সহজে বলতে চান!

তখন গুল্ম প্রশ্ন করলেন, "সারকে কি এক পেপালা রাশিয়ান কফি দিতে পারি?"

রাশিয়ান চা কাকে বলে জানতুম, কিন্তু রাশিয়ান কফির কথা এই প্রশ্ন অন্যতম। মাননীয় বললেন, "রাশিয়ান কফি! সে আমার কবে আমাদের হল।?"

"না, সে কফি কিছু নয়। রাশিয়ানরা কফির সঙ্গে একটি কোম্পানি বাড়ি মিশিয়ে ধায় কিনা। বেশী নয়, এক কোম্পানি। এই যে।" মাননীয় আমার মুখোশ এটি বললেন, "ব্যস।"

তাতেই ফল হলো। রাশিয়ান কফি গেল তার উদরে, আর অন্য দেখিয়ে এলো তার ব্যার্ডার কাহিনী।

আমরা তাকে ধীরে ধীরে ধিরে বললুম।

আমার বড় মেয়ের মুখে কফির এ জুটি লাইন কত্তবার জননী—

"বছরদিন মনে ছিল আমার। ধন নয়, মান নয় কিছু ভালোবাসা।"

হায়! আমার সে মেয়ে ছাড় নেই, কোনো মেয়েই নেই, কোনো ছেলেই।"
নেই, কেউ নেই। মানে, আছে সবাই, কিন্তু আমার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। ধন আছে মান আছে, নেই কেবল কিছু ভালোবাসা। এ বয়সে আর আশা করতে পারিনে। ক'টা দিন, আর কেন আশা!

কী করে যে কী হলো, কী থেকে কী হয়ে ঢাড়াল, সে অনেক কথা। আপনাদের ভালো লাগবে না, লাগার কথা নয়। আপনারা জানতে চেয়েছেন এমন কোনো গোপনীয় কৌশল যার সাহায্যে আমি আজ ধনকূলের। আর আমি কিনা বাজে বক্ষি। বলছি, ধন নয় মান নয় কিছু ভালোবাসা। ক'টা দিন, আর কেন আশা!

কিছু দয়া করে শেখেন যদি তো আপনাদের সময় নষ্ট হবে না। যদি হয়ও তবু এমন কিছু পাবেন যা আপনাদের মনে দাঁড়াবে।

আমার জীবনের সব চেয়ে গর্বের দিন কোনটা বলব। যেদিন আমার ব্যাপ্ত ব্যাঙ্গাল দশ লাখ অতিরিক্ত করল সেদিন নয়। যেদিন আমি নাইট উপাধি পেলুম সেদিন নয়। যেদিন আমি বাবর সঙ্গে সফর থেকে ফিরি, সাত বছর বয়সে। সেদিনকার দৃঢ় আমার আজো মনে আছে, আজ পঞ্চাশ বছর পরে। ইতিমধ্যে কত ঘটনা ঘটল, কত দুঃখনা, কত অঘটন। কিন্তু আমার সাত বছর বয়সের সেই ঘটনাটি যেমন আলজল করছে তেমন আর কোনোটা নয়। আর সব কাপড়া হয়ে আসছে।

সহ্যাবলে ফরিদুম গোকুর গাড়িতে। আর অমনি পাড়ার ছেলেমেয়েদের দল আমাকে বুন করে নিয়ে গেল খেলার জায়গায়। নিয়ে গিয়ে টাচারের আলোয় আমার চারিদিকে চুরি ঘুরে নাচতে লাগল। সে বয়সে আমার জানা ছিল না রাসলীলা কাজ বলে। ঠিক রাসলীলা না হলেও সেও ছিল সেই রকম। ওরা যে আমাকে এত ভালোবাসত তা কখনো কবনা। করিন। প্রত্যেকে বলে, আমার ভালু। প্রত্যেকে আমাকে কাছে টাইন। আমি যে এতগুলি ছেলেমেয়ের একাঁটি ও একামাল, এ কথা সেই প্রথম জ্ঞান। সেই শেষ।

কিন্তু তখন থেকে আমার জীবনের সাথ, আমি সকলের গ্রিস্তাত্ত্ব হব। আমি অজ্ঞাতশক্ত। আমার কোনো শক্ত নেই। আমি নই কারো শক্ত। কিন্তু এমনি আমার কুল, ভাবি এক, হয়ে ওঠে আরেক।

ইতিভাব তত্ত্ব হয়ে খেলবুম সেখানে ছেলেতে ছেলেতে প্রতিবোধিত। প্রতিবোধিতা হলেই শক্তির সূক্ষ্মতা হয়। আমি অজ্ঞাতশক্ত তাই প্রতি-
বোগিতার মধ্যে গেলুম না। যে মেদিন তাকে সেদিন তার কাছে বসি। একদিন আমাদের কাছের লাটি বয় মুরুলি মুখুন্দের কাছে বসেছি। এমন আমার বরাত সেদিন মাস্টার মশাই এমন একটা প্রের করলেন যার উত্তর কেউ পারলে না দিতে। ফাস্ট বয় থেকে লাটি বয় পর্যন্ত সবাইকে পাড় করিয়ে রাখা হলো। মাস্টার মশাই “ইউ ইউ” করে অবশেষে আমার দিকে চেয়ে বললেন, “ইউ।” আমার উচিত ছিল চূপ করে থাকা। কিন্তু বিহারের ছিলেন তুমি সরষ্টী। বলে ফিলুম উত্তর। মাস্টার বললেন, “নারায়ণ। আজ থেকে তুমি সারাদিন পোড়ো। যাও ফাস্ট নীতে যাও। এক এক করে প্রত্যেকের কাছ মলতে মলতে যাও।”

এখনো মনে পড়ে সে দৃশ্য। বেচারা মুরুলি তার কাছ ছুটি বাড়িঘরে দিয়ে চোখ বুকে। তার মুখে মুখচি হাসি। সে কিছু মনে করে নি। কিন্তু করেকরা ছেলে এমন কটমট করে তাকাল যে আমি তাদের কাছে হাত দিতে ভয় খেলেন। যাকে বলে রোকবায়িত লোচন। ফাস্ট বয় বেচারার মাথা হেড। সে তো কেনেই ফেলন। কত ছেলেকে কাঁধে, কত ছেলেকে রাগিয়ে সেদিন আমি প্রথম আসলে বসলুম। ওরা যে একদিন শোধ তুলতে এ কথা ভেবে আমার শরীর কষ্টিকিত হতে লাগল। পরের দিন সত্যি জর এলাও।

ইস্কুলে অশ্নু যেতে হলো। আবার, কিন্তু বিলা ভাঙ্গি কর। বদ্ধ হলো। পড়ালয় খারাপ ছিলুম না, অপর বছরের শেষে পর্যন্ত ছিলুম ক সম্পদ হতুম। সেও আমার হর্ম। চেয়ে। পড়ালয়ের চেয়ে খেলাধুলায় উৎসাহ ছিল বেশী। ফুটবল ক্রিকেট টেনিস তিনটেই ছিল আমার প্রিয়। সাতার আর পাছে ওঠাতে। আমার নিত্য কর্ম। এর উপর ছিল চাঁদের আলোক পাড়ার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলো। এবং আরা তার রকম বাবরামি। এ কথা আমি আগনাদের কাছে কবুল করয়ে বলুন যে মেয়েরা কেউ আমাকে খুঁজতে এলে পাচ মিনিটের আগে ফিরত না। তারপরে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বলত, ভাবু চাহ। আর আমি যখন চাহ হবে মেয়েদের খোজে যেতুম তখন। পাঁচ মিনিট লাগত কোনা একজনকে খুঁজে বার করতে। কিন্তু তাকে ছেড়ে দিয়ে বলতুম, এই যা, পালিয়ে গেল। আমাই চাহ হতুম আবার।

কিন্তু খেলাধুলার ক্ষেত্রেও খেলাধুলু দারুণ প্রতিযোগিতা। বার বার মারামারি করে অবসান এলো। আমি যে অজ্ঞাতশক্তি, আমার তো শক্তিতা করা সাজ্জে না। টেনিস খেলতে গিয়ে বা চোখে লাগল বল। যিনি বলল
চুংড়ে মারলেন তিনি আজন্তন না যে বল আমার চোখে লাগবে। আবার, তিনি আমার শরু। সেই থেকে টেনিস খেলায় বৈরাগ্য ভায়। ফুটবল খেলতে গিয়ে বহুবার জিগবাজি খাই। ফুটবল মনে করে আমাকেই কত ছেলে কিক করে যায়। ফুটবলে বিতৃষা এলো। ক্রিকেট চালিয়েছিলুম অনেক কাল। বুঝি বললেও স্থবোগ পেলে ব্যাট ধরি। আর ধরতে না ধরতেই আউট হই।

পড়ানামায় মন নেই, খেলাযুলুয়ার শখ নেই। আমি তবে করি কী! করি হরিনাথ সংকীর্তন। পাড়ায় কীর্তনের দল ছিল। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পরম ধার্মিক বনে গেলুম। ছেলেবেলা থেকেই আমার মধ্যে ধর্মভাব ছিল কিছু বেশী। বাড়ির সকলে তা জানতেন। ভাই আমার নগর কীর্তনে বাড়ি দেননি। একে রাগে নগরকীর্তন করে ফিরতুম, বাবা বকতেন না। কয়েক বছর এই করিয়ে কাটাল। পরিক্রমা ফেল করতুম না, ওই অষ্টম নবম হতুম। কিয়ে মাস্টার মশাইদেরও আপাতত কারণ ঘটত না।

আমি আজাতশ্রু। আমার একটিও শরু নেই। কীর্তন হচ্ছে এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিযোগিতা থাকলেও অপ্রায় নেই। আমি প্রতিযোগিতা হচ্ছে বোলের সঙ্গে বোলের। কে কত ভালো বাজায়। কিংবা গায়নের মুখ গায়নের। কে কত ভালো গায়। আমি ছিলুম নাচিয়ে। বাছ তুলে নাচতুম আর আবেশে চলে পড়তুম। আমার প্রতিযোগিতারাও তাই করত। কবক। তাতে আমার কী! একাদে তো সকলের ভাগেই সমান।

বেশ চলছিল। কিন্তু বিপদে পড়লুম যেমন বাবা বললেন, "তোর বোধ হয় কলেজে পড়া হবে না। সংসারের খরচ চালাতে পারিচ্ছি, তোর পড়ার খরচ চালার কী করে? যদি একটা রুপিটি টিতি জোটাতে পারতিস—"

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। রূপি পায় কাঁচাই! যারা প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় হয়। আমি নগণা হাঁট। আমি কেন রূপি পাব! তা হলে কি বাবা বলতে চান যে আমাকেও আম। হল থেকে ঝলায়িশের পড়া পড়তে হবে? তা হলেই হয়েছে আমার অজাতশ্রুত। যখন আমাকে বিশেষ বদ্ধ। বেচারার মুখের একটি কেড়ে নেব, আর দে অন্তর থেকে ক্ষমা করবে। আর মনোরঞ্জন আমার ভাইয়ের মতো। সে কি আর আমার ভাইয়ের মতো থাকবে, যদি তার অল্পনি কেড়ে বাই।
উপলব্ধ নিতে গেলুম হেন মাটির মশায়ের কাছে। তিনি বললেন, 
"কলেজে পড়ার আর কো উপায় আছে, আমিনী। টিউশন করতে গেলে 
দেখবে, সে কেকসেও কুরস প্রতিযোগিতা। হী, একটি ক্রেত আছে যেখানে 
প্রতিযোগিতা নেই। ঘরোয়াই হতে রাজি আছে?"

মাটির মশায়ের এ প্রেক্ষের উত্তরে আমি বলেছিলুম, "গ্রাম গেলেও না।" 
তার পরে তালো ছেলের মতো স্কুলার্সিগের জন্য পড়ি। সামাজিক একটা 
রুপিত পাই। তাতে আমার কলেজের পড়া কারক্ষেষ চলে হ'বছর। তার 
পরে মোটা গোছের রুপিত পাই। কলেজের পড়া করতে গেলের। কিন্তু 
যাদের সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতা তারা আমার সঙ্গে কথা কথা না। কথা কথা 
তো আমার সাক্ষ্যের সিকেট জেনে নিতে। এ এক প্রকার প্রচুর শক্তি। 
মাফ করবেন, আপনাদের কারো প্রতি কটাক্ষ করছিলো। আপনারা আমার 
প্রতিযোগী নন, হুর্ণার শর্করা নন। আপনাদের কেও হুল অন্য আঁতের।

আইনটা পাশ করেছিলো এমনি হাতের পাশ হিসাবে। কিন্তু বাবা 
বললেন, উকীল হতে হবে। তার চেয়ে কপাল হওয়া চেয়ে ভালো। কশাই 
তো মাঝের গলা কাটে না, পাঁচ বিখ্যাত গলা কাটে না, বিপরে নাবালকলের 
গলা কাটে না। কী করি! একটা কিছু তো করতে হবে। যাই করি না। 
কেন পরের মুখের গ্রাম কচে খাওয়ার কথা ওঠে। এমন কোন জীবিকা 
আছে যাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শোষণ নেই। যথার্থ কেন তো সমাজের 
নিচের দিকে। মিত্রের বা মেঘের কাজ, চাষীর বা মুখোর কাজ সেব। 
আমার অভ্যন্তরে বলে পরিচিত বটে, কিন্তু আমাদের মত। পরধাকার 
বা নরধাকার কি আর আছে। 

আর একটু রাশিয়ান কথ। ধম্বায়, মিস্টার শুরু। এক কোটা। 
এক কোটা। থাক, থাক, হয়েছে, হয়েছে। থাক ইউ।

ইতিমধ্যে বাবা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। এক রকম জোর করেই 
দিয়েছিলেন। না বলে, তার ধারণা, আমি বাবা সমাজে বিয়ে করতুম। 
এর কারণ আমার বাড়ির ধর্মের আমাকে বাড়ির সমাজের গতি আকৃতি 
করছিল। রবিবারে রবিবারে লক্ষণমীরে গিয়ে চোখ বোঝা। আমার 
অভ্যাস হয়ে পালিয়েছিল। চোখ বুজ আমি নিরাকার ব্যবহার ধ্যান করতুম 
কে কোনো সাক্ষীকার এ সঙ্কেতে আজ নােব থাকাই সমীচীন, কারণ 
এখানে নিরাকারবাদীও রয়েছেন।
নে না হয়ক, আমার শেষ মশাইরের ছিল কয়লার ধনি। বাবাকে
বললুম, বাবাকে বলবেক করতে হয় তবে আইনের ব্যবসা কেন?
তিনি কথা
হলেন, কাজ তার মতে আইনের ব্যবসাতে ফেল করার সম্ভাবনা। কেন,
কয়লার ব্যবসাতে বেশি। এবং কপালে ধাকলে রাসবিহারী ঘোষ হওয়া
সোজা, রামচুলাল সরকার হওয়া শক্ত। ওদিকে শহরক্ষাতে কিছু হলেন না।
তিনি চেয়েছিলেন আমি এক লক্ষে হাইকোর্টের জন্য হলে অভিজাত সমাজে
উল্লেখ হই।

শ্রেষ্ঠ মশাই বললেন, “ব্যবসা মানেই প্রতিষ্ঠাগীতা আর প্রতিষ্ঠাগীতা
মানেই শক্ত।” ইত্যাদির সঙ্গে ভারতের শক্ত। কেন? এইচেই।
এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের যুদ্ধ বাধে কেন? এইচেই। অতএব
মনটাকে ইম্পার্টের মতো কতিন করতে হবে। ব্যবসা হলো যুদ্ধ। যুদ্ধে
শ্রীমতীর স্মরণ নেই। দুর্বল করলে কি মরণ। দরকার হলে নিজের
শেষের গলা কাটতে হবে। অবশ আঘাতকে অর্থ নয়। কাউন্সিল
কমিটি। তাতে যদি জিতলে তো ঠাকুর। হারলে তো কুকুর। কেমন
বিভে কেন?

উত্তর দিল্লুম, “আমাদের আশীর্বাদে জিতব।”

এক রকম বিদায়। মূলতে আরফ করলুম। মুক্তি ও আমিন হলেন
শ্রেষ্ঠ মশাই। আমাদের আশীর্বাদে গোড়া থেকেই লাভ দেখালুম।
কবরো ধার মারাত চেট করিনি। কারা সঙ্গে সাপ্তাহিত করিনি। অন্য
করতে কুটিত হইনি। অগামনে কাতর হইনি, অবিচারে হতাশ হইনি।
বেঁধিতে দেখালে দিয়া। বললে, বাঙালির করিয়েছি, বৃদ্ধি দিয়েছি। কিন্তু
কাম কোথা বা লোকের শেষরা হইনি। ইম্পার্টের মতো কতিন হওয়াই
আমার সাহস। কিন্তু ইম্পার্টের তত্তালোর থাকে ভোলানের খাপে।
আমার ব্যবসায় মধুর্যের মতো মোহালেন। সে আমার কোম্পানীতে
কাজ নিয়েছে সে আমার কোম্পানী ছাড়েনি, বংশব্যাপী না। আমি নিজে
ছাড়িয়ে দিয়েছি, ছাড়িয়ে দিয়ে দিয়ে বাড়ি হয়েছি। যেন তেন উক্তির উপরে
আশ্রিত পাওন না আমার পালন কর। আমার লীটি নয়। এই আমার
সাফল্যের সীকেট।

কিন্তু আমার বংশতার সীকেটোই এই। মহাযুদ্ধের সময়—সেবারকার
মহাযুদ্ধ—আমার মতো। অনেকেই আঙ্গ এলে কলাগাছ হয়। হঠাৎ
বড়লোক হলে যা হয়, অনেকেই সে টাকা দশ রকম কারবারে খাটিয়ে যুদ্ধের পরে লালবাজি জালেন। আমি কিন্তু হঁচিয়ার থাকি। ফলে বাবার সম্পর্কে, ভাইয়ের সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা চেয়েছিলেন ও টাকা আমার কাছ থেকে হাওড়া নিয়ে কারবার ফেলে রাতারাতি বড়মাঝুব হতে। আমি ও টাকা যেনের ধনের মতে। আগলাই। কাউকে এক পয়সা দিনে। অবশ্য না খেতে পেয়ে মরছে দেখলে যুদ্ধ হতে দিনি, চিকিৎসার অংশ পড়ানোর জন্য দরাজ হতে দিনি। কিন্তু বারুদানীর জন্য বিবিসার অংশে রাতারাতি লাল হবার জন্য এক করণকাল দিনে।

পিঠুরুল্লের সম্পর্কে বিচ্ছেদের পরে সেই একই কারণে খুদকুলের সম্পর্কে বিচ্ছেদ। কেবল তাই হলে রঙ্খ ছিল, মামলা বেধে গেল কোনিয়ারি নিয়ে। খুদর মশাই সেকারের রাজপুত মোহা, আমাইকেও বাঙ্গালী মানতে পরিস্ফুট নন। কিন্তু আমি যে আইন পড়ে তুলে যাত্রা, বরং ঘরে বসে আমার পড়েছি, এ তিনি জানতেন না। আমার মামলা। আমি নিজেই তাঁর করি।
লোয়ার কোটে, হাইকোটে, ছুই কোটিই আমার জিং। উকীল ব্যারিস্টাররা বললেন, “আপনি হাইকোটে প্রাক্সিস করলে আমাদের ভাত মারবেন দেখছি।” আমি বললুম, থাক আর শক্তিকে করে কী হবে?

খুদর মশাই এর পরে যে চাল চাললেন তা সাংবাদিক। আমার চেলোটার মাথা থেকেন। তাকে বোঝালেন, কয়লা অতি ময়লা জিনিস। যারা ময়লার কারবার করে তারা চেলোটা। বাপকে বলু তাঁর নামে মোটরকারের একজন নিতে। চেলে আমাকে তাই ভাঙালে। আমি তাকে বকে দিলুম। বললুম, বেঁচে থাকলে একদিন মোটরকার মহাশয়কের করব। একজন নিয়ে একাদিকের সবিধে করে দেব কেন? পরে কি ওরা আমাকে মোটরের কারখানা খুলতে দেবে? চেলেটা। অবাধ্য।
আমার কাছে চেয়ে বসল এক লাখ টাকা। আমি বললুম, এক পয়সাও না। তখন সে আমার বাড়ি থেকে আপনি বেরিয়ে গেল। তার মামলা রাখলে, বাপ বাবা করে দিয়েছে। বাজারে আমার নাম খারাপ হয়ে গেল। পরে শ্রুণ্ণলুম ও নাকি প্রাইভেট টিউশন করে আইন পড়েছে, পেট্রিক সম্পত্তিকে ওর যা আপনি তা একদিন আইনের সাহায্যে আলাদা করবে। আমি কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলুম পড়ার খরচ চলাকে। ফেরৎ এলো।
কিছুদিন পরে দেখি মেজ চেলোটাও বিগড়েছে। বলে, নাড়। আমার
রাম, আমি তার লক্ষ্য। দাৰা বদি বনবাসে গেল তে। আমি কেন বুঝিবাসে ধাক্কা।" চলে গেল একদিন আমাকে দাগা দিয়ে। অনলুম হেঁড়াই ছেলে পড়িয়ে বেড়াচ্ছে। থাক্কে মামলায়ের জ্যাচার। আবার কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলুম। ওয়াগল এলো।

এর পর বড় মেয়ের পালা। বড় ভালোবাসতুম ঠাকুর। কলেজে দিয়েছিলুম যাতে সত্যিকারের হৃদয়কথা হয়, তার পর ভালো দেখে বিয়ে দিতুম। কিন্তু ওর মামারা ওকে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে বিয়ে দিলে। আমি দেখতে গেলুম না। ওর মাদে ছিলেন এর মধ্যে। ওর মাকে বললুম, "আমার মেয়ে, আমি লক্ষ্য করব, এই তো নিয়ম। এ তোমরা করলে কী! এর পরে আমি যদি তো বকিয়ে করি?"

ওর মা বললেন, "মেয়ের বয়স তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। উনিশ বছরের ধাতী। মেয়ে এক বেম বাড়িতেই দেখা যায়। হিঁহুর বাড়ি কেউ কোনো দিন দেখতেছেন? তুমি যে ওর বিয়ে দেবে না। তিনির আগে এ যথা ও নিজেই বলছি একদিন মনের দুঃখ। কী করি, মেয়ের দুঃখে দেখতে পারি, দোমর মেয়ে, কোনো দিন কর উগ্রতা হয় কে আমার। আজকাল তো এরই নারীবাসের করব কানে আসছে। মুসলমানরা কোনো দিন না ধরে নিয়ে যায়। তাই হিঁহুর মেয়ের হিঁহুর সঙ্গেই বিয়ে দিয়েছি।"

এর পরে গিনীর সঙ্গে আড়ি।

গুলিকে আমি একটার পর একটা কয়লার খনি কাঁচা আমার মতো ভালোবাসে নিয়ে কোচড়ে পুরুচি। কয়লার পর মাইকা, মাইকার পর মাজানীঞ্জ, মাজানীঞ্জের পর লোহাটা, খেঁড়ে যা পাই ইংরাজ নিয়ে। টাকা চালি। লোকসান যায়, তাও সই। কিন্তু আমার পালিস হচ্ছে ভারতের খনিজ প্যাকেজ ভারতীয়দের হাতে আনান। বিদেশীদের হাতে পড়তে না দেওয়া। এর দক্ষ সাহেব মোলে আমার শক্তির সংখ্যা নেই। তারা জানে যে আমি যদি বেচে ধাক্কি দেও একদিন আহত নির্মাণ করব।

কিন্তু এদিকে আমার তীর্থ সঙ্গেই শক্তি। বাইরে শক্তি ঘরে শক্ত। বল মা তারা, ভাড়াই কোথা! পাগলামির লক্ষ্য দেখে আমি তাকে ভয়ে ভয়ে বললুম, চল, আমারা কিছুদিন রাতিচে কাটিয়ে আসি। তিনি কোনো করে তোড়ে এলেন। বললেন, "বেটে রে! আমি পাগল। না তুই পাগল?" তিনি রাগ করে তার বাপের বাড়ি চলে গেলেন। সেখান থেকে আলাদা হতে
গিয়ে দরখাস্ত করলেন যে তাঁর খানা পাগল। পাগলের সম্পত্তি পাগল নিজে
দেখাশোনা করতে অপারগ। অতএব আদালত থেকে উপযুক্ত ব্যক্তির উপর
তাঁর অর্পণ করা হোক। দরখাস্তের সঙ্গে হংসজন বড় বড় ভাজারের সাইটিকিটে
দাখিল করা হলো। হা ভজবান! এরা আমার ফাযামিলি ফিজিশিয়ান।
আমার শিল আমার নোভা আমারই ভাঙে হাতের গোড়া।

কী আর করি! পাঁচ জন ভর্ষলোকের পরামর্শ নিয়ে শ্রীপুত্রের নামে,
কাটারের নামে, বিষয়সম্পত্তির অধিকাংশ লিখে দিই। ওরাই এখন
কোম্পানিদুলোর মালিক। আমি ম্যানেজিং এজেন্ট। এতিম মিটিং আমার
উপর চোখ রাখায়। আমিও তেমনি খুশি। পাই পয়সার হিসাব রাখি।
বাংলা খ্রচ করতে দিইনে। তাতে ওদের খুব যে সুবিধে হয়েছে তা নয়।
তবে হুমার হোটেলে বাঢ়ে, অনবরত মৌজর ইন্টার্নেট যে বড়াচ্ছে, উপকার
লোকাতে ঘুরে যখন যা খুশি কিনেছ, মাসহারার টাকা এই ভাবে
উড়িয়ে দিচ্ছে। দেখলে চোখে জল আসে, কিন্তু উপায় নেই। কী
আর করি!

সব চেয়ে দুঃখ হয় যখন তুমি আমি ওদের শক্ত। হায় রে! আমি শক্ত,
আমি ওদের শক্ত! যে আমি এক দিন অস্তিত্ব ছিলমুর সেই আমি আজ
আমার পুকুরকালি শক্ত। ওরা আমার মূখ দেখতে চায় না। দেখে যখন
টাকার সরকার হয়। অথচ এই আমাকে দেখে আমার পাড়ার চেলেছেলের।
লুট করে নিয়ে গেছে চালার আলোর হাত ধরে নাচতে। রাসূলীন বৃষ্ট
আমি, বৃষ্টিবনে সর্বজনগোপি। আর সেই আমি আজ বাড়ি অধিকাংশ
হয়েও সকলের অগ্নিশয়, সকলের শক্ত। মূলধর্মের শীর্ষে আমি,
মনের আদর্শীতে বুদ্ধি দেখেও অসহায়। অর্জ্জীত তো তীর মেরেছে
আমার সারা গয়ে, মরণেরও বেশী দেরি নেই।

মাননীয়ের কাহিনী শুনে আমাদের অন্তর আলোড়িত হতে থাকল।
আমাদেরও তো ঐ একই সমষ্টা। চেলেরা বাড়ু, মেয়েরা বিবি, শ্রীমা
বেল্টরোয়া করতে ওঠায়। ওরাও খুশি হবে না, আমাদেরও খুশি হতে
দেবে না। তুমির পরিবর্তে সাফল্য নিয়ে আমরা কী করব, কার সঙ্গে ভাগ
করব। তার মতো ব্যবস্থা। আর কী হতে পারে।

“কিন্তু,” প্রশ্ন করলেন এই বাহাদুর কারোকি, “সব হলো, আসল কথাই
তুই হলো না। আপনার নিফলতার সীকেট কী? তা তো খুলে বললেন না।

“আর কত খোলসা করব!” হাসলেন, হেসে বললেন মানুষর। “আমার নিফলতার সীকেট আমার বিয়ে।”

“উহ। হলো না। হলো না।” বলে উঠলেন প্রিলিপাল দত্ত। আপনার নিফলতার সীকেট আপনার ঝালারিণের পড়া।

সেদিন আমরা কেউ কাছে সঙ্গে একত্র হতে পারিনি। তার পর থেকে ভাবছি। মানুষের সীকেটটা প্রকৃতপক্ষে কী? যাই হোক, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সফলতার সীকেট হচ্ছে বিফলতারও সীকেট।

(১৯৪৫)
রূপদর্শন

সেদিন নয়নমোহনের সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা। এসেছিলেন এক দিনে-বার্ষিকে বরসালী হয়। আমি ছিলুম কঠিনগুলিকে নিপীড়িত। দেখা হতেই দুঃখ হয়ে বলেন, "মনে পড়ে?"

আমি তার হঠাৎ হাসি বুঝানি দিয়ে বললুম, "না, মনে পড়তে কেন? মনে পড়তে তো কারণ নেই। মনে পড়তে তো কথা নয়।"

তিনি দুঃখে প্রকাশ করলেন। "ইচ্ছা ছিল তোমার ওখানে উঠতে। কিন্তু আজ নাই তো বরসালীর। শান্তনূর নয়। এসবই একটা দলের সঙ্গে সফল হয়ে। সেইজন্যে—"

"সেইজন্যে একবার। চিঠি লিখেও জানাতে নেই যে আসবার কথা আছে ময়মনসিংহে। না, নয়নলা, তোমাকে আমার মনে পড়ে না। মনে পড়তে যদি তুমি এখনে। আমার ওখানে ওঠ।"

"না, ভাই। এ যাত্রা নয়। এর পরে আবার যদি কোনো দিন আসা হয় তো নিজে। এবার আমাকে মাফ করতে হবে। বুঝে?"

তার কণ্ঠের কারণে আমাকে স্পর্শ করেছিল। আমি তাকে পীড়াপীড়ি করলুম না, শুধু একবার চা খেতে ডাকলুম। তিনি রাজি হলেন। পরের দিন চা খেতে এসে বলেন, "তুমি আমাকে একবার কী বলেছিলে মনে আছে?"

বিশ বছর পরে দেখা। কী করে আমার মনে ধাক্কে কী বলেছিলুম কবে। আমি মাথা নেওয়া জানালুম, না, মনে নেই।

"বলেছিলে, রূপ ভগবান সবাইকে দিয়েছেন, দেখবার চেষ্টা দেননি সবাইকে। বাদের দিয়েছেন তারাই শিয়ালী, তারা সকলের রূপমূর্ত।"

"তাই নাকি? কই, আমার তো মনে নেই।"

"তোমার মনে ধাক্কার কারণ নেই, আমার মনে ধাক্কার কারণ আছে। তাই সেদিন ভাবছিলুম, তোমার কথাই অবশেষে সত্য হলো, কবি।" তিনি আমাকে কবি বলে ডাকতেন।
“বিকেল সভা না হলেই ভালো হতো।” তিনি সেই নিঃসাপে বললেন।
“এ বা হলো তা আরো মর্মান্তিক।”

আমি জ্ঞানমূল নয়নদার বিদেশের গল্প। জ্ঞানমূল না তার পরিষ্ঠ।
নয়নদার বিদেশে আমি বর্ধিত হয়েছিলুম, বহিরা লিখে ছাপিয়েছিলুম।
বেধ হয় বৌদ্ধ রূপাণিক করে সামনে ছাড়লে বলেছিলুম, রূপ ভগবান সবাইকে দেখেছেন, সেখানে চোখ দেখিনি সবাইকে। তার মানে, রূপ ভগবান সবাইকে দেখিনি, যাকে দেখিনি সেও রূপবতী কবির চোখে।

আমি তো রিয়ালিট নই, হলো সাফ কথা অনিয়ে দিতে মিথ্য নিতুঁর ভাবে।
কিন্তু দ্বার বিদেশে তিনি ছিলেন বাছু বড়ভাই। রূপ বাড়তে তাকে কালিয়ে ছাড়ল।
বিদেশে পরে তিনি আমাদের কাছে। কেনা কাছে চোখের জল ফেলে বলেছিলেন, “তাই, এ যে পোড়াইকাঠা।” দীর্ঘনখ ছেড়ে বলেছিলেন, “ধীর বাদ করা, নাক চাপা, এ যে করালি।”

নয়নমোহনের নিজের মত ছিল না, তিনি শায়ের রেখেছিলেন অস্থিতী হবেন।
কিন্তু তার শায়ের তার মাঝে পুরুষের যে দিকের হাত থেকে সম্পত্তি রক্ষা করতে হলে দিকের হাত থেকে সম্পত্তি রক্ষা করতে হবে।
নয়নমোহন, “সম্পত্তি যদি মায়ে তো কে তোকে হস্তির মেয়ে দেবে। কোথায় তখন তো সেই কালো মেয়েই বিয়ে করতে হবে।”

এর উত্তরে নয়নদার বলেছিলেন, “তা কেন হবে! তার যদি বিয়ে না করি।”

“শোনো, কথা! যদি বিয়ে না করি। তা কি কথনা হয়! বিয়ে না করলে তোকে রেখে পাওয়া যে কে?”

নয়নমোহনের ঠাকুরা। তখনো বেঁচে। তিনিই নামির নাম রেখেছিলেন নয়নমোহন।
নয়নমোহন থেকে বিবর্তন হয়ে নয়নমোহন। বুড়ি বললেন, “তোর বাপকে বলত বিয়ে করব না, সবাই হব। কোথা চলে গুলে, কো আনন্দ।
বিভাগ আনন্দ। বাপ বিয়ে না করলে তুই হতিদৃষ্টি করে। বল আমাকে।
বল।”

বৌদিরা বললেন, “বেঁধে তো আমাদের দশ। রূপ থেকেও নেই,
কেনা রূপো নেই। গণনা পর্যন্ত বড়ক। আসল জিনিস হলো টাকা।
তোমার বাড়ীর তা আছে। এমন পাঁচ হাতেছাড়া করতে নেই। করলে তোমার বলব লক্ষাতাজ্জান।"

নয়নমোহন বাড়ির অবস্থা জানতেন না। বৌদ্ধদের কথায় হঁস হলে। তিনি ছিলেন রিয়ালিস্ট, তাই শেষ পর্যন্ত মত দিলেন। কিন্তু অন্তর থেকে তো দেখেনি। অন্তর কেন তা মানেব? সেইসময়ে বিষয়ের পরের দিন তাঁর কাঠামো। এবং সেই উপরকে আমার সামনের দৃষ্টান্ত।

আবার ধীরে তাঁর অন্তরে চিন্তা তাঁর জানতুম এ বিবাহে তিনি তখন হবে না। হতে পারেন না। কারণ আর সব বিষয়ে বাড়ীবাহী হলেও বিবাহ সত্ত্বেও তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। তাঁর পরম কাম্য ছিল তরী স্নান পূজা প্রতিষ্ঠান। কখন কাউকে ভালবেসেছিলেন কি না বলতে পারব না, কিন্তু যাকে তিনি ভালোবাসবেন সে কেমন হবে তা তিনি তাঁর অন্তরের মাঝে মাঝে শোনাতেন।

বিষয়ের পরে রসিকতা করে কে একজন তাকে বলেছিল,—"তুমিই জিতেছে। যা চেয়েছিলেন অবিকল তাই পেলে। তবী মানে রোগা, আমার স্নান কালো, পাহাড়ের মতো ধাত, আর পক্ষ বিবাহ মতো মানে ফাটা তেলাকুচার মতো। এটা দুটির মাঝখানে অনেকটা কাফ।"

নয়নাদা বেচারার চোখ দিয়ে জল পড়িয়ে পড়েছিল ও কথা শুনে। তাঁর সবচেয়ে মনে লেগেছিল আরেকজনের বক্তব্যই, "নয়ন, তুমি চোখে অন্ধকার বেঁধছ।"

আমরা তাঁর বিরুদ্ধে তাকে নানাভাবে সামনে দিয়ে প্রক্তিস্থ করি, নইলে তিনি হতে বিশ্বাসিন কিছু একটা করে বসতেন। আমি যে ঠিক কী কথা বলেছিলুম আমার মনে ছিল না। তাঁর মনে ছিল দেখেছি।

"তোমার কথাই অবশেষে সত্য হলো, কবি।" তিনি বললেন, "কিন্তু সত্য না হলেও ভালো হতো। এ যা হলো তা আরো মস্তিষ্ক।"

আমি উত্তর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কো হয়েছে, নয়নাদা? ধারাপ কিছু নয় তো?"

"না। ধারাপ কিছু নয়। সমুদ্র কুশল।"

আমি নিষ্ঠুর হলুদ, কিন্তু নির্জন হলুদ না। জানতে চাইলুম, "তা হলে আরো মস্তিষ্ক কেন?"

তিনি বললেন, "শোনে তা হলে।"
সত্যেন দত্তের একটি জাপানী থেকে অমূল্য মনে পড়ে।

"অতি বড় অভাগা যে আমি একটি
আমি কিন্তু পেয়ে গেলুম মন ব্যাগটি।"

বিয়ের পরে আমার মনোভাব হীরে হীরে দাড়াল ঐ জাপানীটির মতো।
আর কিছু না পাই টাকার খিলতে সেটা পেয়েছি। এই বা কোথায় পাওয়া।
জীবিকার জন্যে আমাকে পরের চাকরি করতে হবে না, থাকী ব্যবসায়ে মূলধনের অভাব হবে না, ব্যবসা ফেল মারলেও সংসার অচল হবে না, সন্ত্রাস হবেন অচল। এ কি করবেন? এটি যে দুঃখিতা ছিল এমে এদের করে তার পরে করবে, কোথায় ঠিক পাবে, সব দুঃখিতা জল হবে গেল।
সমবয়সীদের কেউ কেউ এখন চিন্তা পাওয়া, বছর রাখে। বোধ হয়। বিশ বছর পরেও তাদের জীবনযাত্রা অস্থির। আর আমি সব কিছু থেকে গুরুত্ব নিয়েছি।
থাকার আমার এত ভালো যে এক দিনও অনিঃসার হয় না। আর 
তোমার তো ছাড়ি কোনো দিন সুখিন্দা হয় না। তুমি কুপার পাত্র। কালো 
মেয়ে বিয়ে করলে ভালো ধাকতে।

জানো তো আমাদের কেমন খানদানী বংশ। আগেকার দিনে সুন্দর 
মেয়ে আমরা লুট করে বিয়ে করতুম। তার পরে কোলীশ্বর এতে হয় নেঃ কোলীশ্বর মেয়ে যে আমি। বর্ষকোলীশ্বর যখন উঠে গেল তখন কাঙক্ষ- 
কোলীশ্বর আমাদের ঐ কাছে লাগল। আমার পণ নিতুম না, দোষুক 
নামমাত্র নিতুম, কিন্তু তাঁর আনতুম সুন্দর দেহে। এর ব্যতিক্রম যে হতে 
না তা নয়। এমন কোন নিয়ম আছে যার নিরাপত্তা নেই কিন্তু তা বলে 
আমার নিজের বেলা ব্যতিক্রম হবে এ আমি করেনা করিনি। আমার দাদারা 
সুন্দরী বিয়ে করেছেন। আমার ধারণা ছিল আমার অজ্ঞতা সুন্দরী 
ভাষা। বাবার হাতে মায়া না যেতেন, সম্পত্তি যদিও মৃতের রেখে না 
যেতেন, তা হলে এ অস্থির ঘটত না। বংশের ব্যতিক্রম হবে নাম 
হাসাতুম না।

তোমাকে আমি হিংসা করি। তোমার মতো ভাবানন্দ বন্ধুদের সবাইকে 
হিংসা করি। যেদিন তোমার বিয়ের খবর পড়ি সেদিন যেন বুকে গল 
বাঁজল। বিশ বছর দেখা হয়নি বলে আশ্চর্য হচ্ছ। এ জীবনে দেখা হলো 
এইটেই আশ্চর্য। তুমি জিতেছ, আমি হেরছি। তোমার সঙ্গে কোন মুখে 
দেখা করতুম। আমারি মতো যারা দুঃখিতা তাদের সঙ্গে দেখা হয় বছরের
ছবিবছের একবার। কেউ কেউ আমার এমন হতভাগা যে সেই আপানী
বেচারার মতো মনিব্যাগ্টা তুলে নিয়ে দেখে—

"হীমগাড়ী চাপাপড়া ব্যাট চাপাট।"

গোপেনকে মনে আছে তোমার? আবগারি সপারিন্টেন্ডেন্ট হয়েছে
এখন। গোপেন আমাকে রামপ্রসাদী গান গেয়ে শোনাত। বলত, কালো
তুমি আলো। তেমনি তার সাজা গেটে হলো নিজেকে। বিয়ে হলো
কালো মেয়ের সঙ্গ। আশা করেছিল খুব তাকে অর্ধেক রাজন্য দিয়ে
যাবেন, কিন্তু বিবাহ পত্নী বিয়ে দিয়ে দিয়ে গেলেন আরো।
কয়েকটি কৃতকরণ অভিভাবক। গোপেন কিন্তু আমাকে বীচার সরণ দিয়েছিল। তাকে
বলতুম, আচ্ছা, কালো না হয় আলো, কিন্তু খুবা কী করে টিকলা হবে?
সে
বলত, চীন দেশে খুব নাকের উপর তিন হাজার বছর ধরে করিত। লেখা
হবে আসছে, ও দেশের রামপ্রসাদী গান কালী ভক্তির নয়, খাঁড়ী ভক্তির।
তা যেন হলো, কিন্তু দাত বার করা। কি সুখ হয়? যেন তাতে আসছে।
গোপেন বলত, এর উত্তর দিয়ে গেছেন অনেক কবি। বলুন বিবি কিঞ্চিতগুলি
সত্যরুচি কোয়ুচী। তোমার আসছেন না, বলতে আসছেন যে তুমি আমার প্রিয়,
আমি তোমার প্রিয়। চাঁদের উঠালে জ্যোৎস্নাম মতো ছুটে উঠছে দশন।

মাঝের বাইরেটা কিছু নয়, ভিতরটা আলো। রূপ কিছু নয়, গুণই
আলো। এ কথা আমি কত লোকের মুখে শুনেছি, বিখ্যাত করেছি, মূখ ছুটে
বেলেছি। কিন্তু সাজনা পাইনি। রূপের বাদ কি গোনা মেটে? রূপ
ক্ষণকালের, গুণ চিন্তকরার। তা বলে কি ক্ষণের মূল্য কিছু কম? যখন
অন্তঃ বোট বড় গোনের তখন খুশি হতুম খুবই, কিন্তু তার চেয়েও খুশি
হতুম যদি অন্তঃ চোখ ছুট তো বেশ। গোনের প্রশংসা যত অন্তঃ রূপের
স্বাভাবিক তার সিকীর সিকীর নয়। রাগ ধরত যখন ওরা বলতে বৌমাহিকের
রূপের প্রয়োজন নেই। রূপের প্রয়োজন নাকি রূপোশীরিতনীর! তবে
বোধকদের আনা হয়েছিল কি দেখে? তাদের রূপবন্দায় পক্ষমূখ যারা
তারাই আমার রূপের অসারতা গোষ্ঠী করত আমাদের আনে দুনিয়ে শুনিয়ে।

মাঝে মাঝে মনে পড়ত তোমার উকি। রূপ বজবান সবাইকে দিয়েছেন।
সবাইকে দিয়েছেন তো কৃষ্ণকে দিয়েছেন। তা হলে আমার চোখে
পড়ে না কেন? লোকের চোখে পড়ে না কেন? এর উত্তর, দেখবার চোখ
তিনি সবাইকে দেননি। আমাকে দেননি। লোকেরকে দেননি। কৃষ্ণের
রূপ আছে, আমাদের চোখ নেই। একি সত্য? অনেক ভেবেছি, কিন্তু সত্য বলে মনে নিতে পারিনি। ধরে নিয়েছি এটা একটা সত্যচেতন। এ বলে তুমি আমাকে সাধনা জানিয়েছ। ওটা তোমার বিকৃত। কিন্তু বক্তানির্দেশ খুব সত্য নয়। তোমার বিষয়ের পরে মনে হয়েছিল তুমি আমাকে পরিহাস করে ওকথা বলছিলে। ওটা তোমার শেষ। কিছু কাল তোমার উপর বিবেচনা হয়েছিলুম। তোমাকে আরম্ভ করে একটি ঘটনা লিখে মানসিকপত্রে পাঠিয়েছিলুম। তারা ছাপ না। ভাষ্যের চাপের।

কেম আমার প্রতিভাতি হলো যে রূপ-বোধ একটি সংস্কার। জন্য অর্থ আমি রূপ নির্দশন করেছি, সেই জন্য কৃষ্ণকে মনে হচ্ছে কৃষ্ণ। ধরে, যদি শিক্ষকের ধরায় কৃষ্ণ নির্দশন করতুম তা হলে কি কৃষ্ণকে মনে হতো কৃষ্ণ! না, তা হলে তাকে মনে হতো আর সকলের আগ্রহ। এই প্রতিভাতির পর আমি একাকীতার পরিবার থেকে পৃথিবী হতে চাইলুম। কেন, সে কথা খুলে বললুম না। মৌলিকতার মূলধন করে তার পরে কৃষ্ণের মূলধন করলে কৃষ্ণকে কৃষ্ণ দেখাবেই। এর একমাত্র প্রতিকার মৌলিকতার না করা। যে বাড়িতে বেলে কৃষ্ণই একমাত্র নানা সে বাড়িতে সৃষ্টি কৃষ্ণের বৈষম্যে নেই। দেখলুম কৃষ্ণকে আমার তত্ত্ব ধারণা লাগলে না। তার চোখ ছুট সত্যি একটার। তার প্রকাশের ফলে নিয়ে দেখা গেল মনে মানার না। রূপ বলতে আমরা ষোড়া গায়ের রঙ আর মুক্তের নোটিব রুঝি। এতে কিন্তু অনেকের প্রতি অবিচার করা হয়। কৃষ্ণ কৃষ্ণময়, এখানে তার জিক। সে দৃষ্টি, এখানে তার জিক। তার তুষ্টরো বস্থিত গুহিত, এখানে তার জিক। তার গভীর মাংসল নয়, দীপল, এখানে তার জিক। হাতের আঙ্গুল, গায়ের পাতা, অপূর্ব ব্যাখ্যায়। এখানে তার জিক। এ ভাবে বিভ্রম করলে কৃষ্ণ জিক অনেক বিখ্যাত। কিন্তু সৌধীনতা তো বিখ্যাত করবার বস্তি নয়। আর আিভিও নই সম্পূর্ণ নিরাকরণ সমালোচন। ও যদি আমার না হয়ে পরের হতো। আমি ওকে রূপের পরিবর্তন পায় মার্ক মিত্তুম। কিন্তু ও আমার হয়েই কেল করেছে। এইটুকু মূঢ়তার।

একটি চেলে একটি মেয়ে হবার পর আমি বাইরের বালাবান পৃথক শিখার পাতলুম। কৃষ্ণ ভেবেছিল ছবিনের বৈরাগ্য। একটি হেসেছিলো। কিন্তু মালের পর মাল কাটে, আমার সংকলের পরিবর্তন হয় না। আমার মনে কোনো দ্ব্য ছিল না, আমি মন মিসর করে ফেলেছিলুম। শুদ্ধকে কৃষ্ণকে
চললা। সে একা স্বে শান্তি পায় না, অথচ আমার কাছে একে বাইরে শুধু তাহলে সাহস পায় না। একদিন শেষ রাতে সে এলো। আমার কাছে।
এলে লুটের পড়ল। তার কঠোর দুর্বল কন্নন। ধরা গলায় বলল, “বুধির কি আমার আমার সঙ্গে শোক নে না?”
তাকে অনেক বোঝালো। কিন্তু বুধি চেষ্টা। শেষে রাগ করে বললো,
“আমি কোথাও চলে যাব, হিমালয়ে কি পতিতেরীতে।” তা থেন সে কেবলে আবুল। পরের দিন জেনে ধরল, “আমাকে আমার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। এ বাড়িতে যেই আসে সেই জানতে চাচ্ছি আলাদা বিছানা কেন? লক্ষ্য মারা যাই।” বাপের বাড়ি থেকে কয়েক মাস পরে আপনি ফিরে এলো। বাপের বাড়িতেও সকলে জানতে চাচ্ছি আলাদা ঘাঁটার কারণ কি।
লক্ষ্য মারা যায়। ফিরে এলে আবার সেই একই সময়। লক্ষ্য বাঢ়ে না।
এক দিন আমাকে মিনতি করে বলল, “অন্তত এক বিছানায় শোক। মাঝখানে হেঁটে যে। লোকজন থেকে বীচাও।”
তাই হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে জুড়ের মধ্যে সেই যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল সে আবুল বুঝল না। এ দেখে নেইঠা একটা লোক দেখানো সেভুবচ্ছ। সকলে জানলে যে আমরা একটি সুখী ও সম্পত্তি দশতী। আমরা জানলো যে আমাদের মাঝখানে ঘটন ব্যখান। অন্যজুড়ের সাগর।
ভগবানকে ভেদে কতবার বললে, “এখন, ওকে একটি দিনের জন্য রূপবান করো, দিনের আলাদা মতা রূপ দাও। চিত্রাল্পাকে দেয়েছিল একটি বছরের জন্য, কুষ্ঠকে দাও একটি দিনের জন্য।”

ঠাকুর ঘরের দিকে নজর পড়িয়া নয়নমোহন চমকে উঠিলেন।
“তোমরা ওঠা কি ঘড়ি না ঘোড়া হে?”
আমি বললো, “ও ঘড়ি ফাট চলেছে।”
“কিন্তু আমার আমার বেশীকাল থাকা চলবে না। মেয়াদ ঘুরিয়ে আসছে।”
আমরা আজ রাতের টেনে যাচ্ছি। বেটা দশটায় চালো।”
“আর একটা দিন,” আমি অনুরোধ করলুম, “এখানে থেকে গেলে পারতে। তোমার তো চাকরি নেই।”
“চাকরি নেই, কিন্তু যা আছে তা চাকরির বাড়া। মজাবরা কর্মচারী?
নোটিস দিয়েছে, এখন গিয়ে তাদের মানসিক করতে হবে।”
এর পরে তিনি তার কাহিনীর কথা ধরলেন।

কুফা জানতে যে তার রূপের অভাব আমাকে প্রতিনিধিত্ব পীড়া দিচ্ছে, সেই অনুভূতি হলে সে প্রাণপণে দেখা। করত রূপের অভাব গুণ দিয়ে পূরন করতে। অন্য কেউ হলে সে পাওয়ার মধ্যে সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা, নানা রকমের সাহিত্য ব্লাউজ পরে স্বাধীনতা সাজে। কিন্তু সাজের উপর আমার অভাব গুণ ছিল না। তার সাজ ছিল গুণের উপর। সে তার সায়ের করেছিল। তবু আমার মন পায়নি।

এর কারণ রূপের অভাব গুণ দিয়ে পূরন করা যায় না। রূপের অভাব রূপ দিয়েই পূরন করতে হয়। তা যে পেরেছে সে অসাধারণ সাজের করেছে।

এই অসাধারণ রূপ সাজে ছিল না। অন্য কোনো সাজে এর স্বাভাবিক পারে না। তাই তার সাজের সাদৃশ্যে আমাকে গ্রহণ করে।

উদ্দেশ্য শিবের মতো বিশ্বাসের জন্য। আমার মতো স্বরূপের জন্য নয়। আমার সাধারণ সারি সায় যা দেখা দেয় তা মন সায় দেয় না। মন যদি সায় না দেয় তা তে তে সাদৃশ্য পাই দেয় না। গুণ দিয়ে কি বিকার দূর করা যায়?

আমি যে বিকার বোধ করি এ কথা তাকে মুখ অতীত বলিনি। সে বুদ্ধিমতী, নিজেই বুঝে নিয়েছিল, তাই একদিন আমাকে পাঠিয়েছিল, "তুমি আমার একটি বিয়ে করো, যা বেঁধে আছে যাদের।" এমন করে কোনো চাইলাম।" এর উত্তরে আমি বলিনি, "পরিবারে অশান্তি ঢেকে আনতে চাইলাম। বেমন চলছে চলুক।"

বস্ত্ত আমার একদিন খুসুন ছিল না, বিনাকাল কাজ আর কাজ।

হোসিয়ারীর কারখানা খুলেছিলুম, দেখাশোনা করতে হতো আমাকেই, নীলিঙ্গ পাঁচালির আমার তিন সর্বস্তু, ওয়ার্কিং পার্টনার আমি। কখন কখন তাই কথিত কথা নেয়। শুধু এই কথা যে বছরের শেষে লেখার শুরুতে হবে।

লাভ বদ্ধ না দেখাতে পারি তে সম্ভাব্য। বাকা তুলে নেয়ন। তখন আমি

মূলধন পায় কোথায়?

কুফা যখন উপলক্ষ করল যে তার গুণের সায়ের ব্যবহার হয়েছে, রূপের

সায়ের ব্যবহার গ্রহণ, তখন আমাকে এক বছর চেলেমেয়ে সমেত বাজেলিঙ

চেলে গেল। সেখানেই তারা লেখাপড়া শিখেন ও সাজের হয়ে। আমি

ছেড়ে দেয়, কিন্তু বাজা দিলে না। কেন এই ভাবে শীতের দেশে বাজলে রক্ষা এক পোঁচ করলা হতে পারে।
অক্ষরাং খাদেনীতা পেঁয়ে আমার অবহ্রা হলো। সৈলন্তিক। যেমন হতে
যাছে তারভর্ষের। কী যে করি খাদেনীতা নিয়ে, বছলারের সক্রিয়তা নিয়ে, বক্তি জালা নিয়ে—কী যে করি! কী যে করি!

তুমি তোমার অবাক হবে যে কিছুই করলুম না। তার কারণ যাই করতে
যাই তাই মনে হয় তুচ্ছ। মনে হয় এমন কিছু কর। উচিত যা কেউ 
কোনোদিন করেনি। যা উচিত উচ। তেমন কিছুর নাগাল পেলে হয়।
কাব্যের নারীকারা হোসিয়ারার কল পরিসর্ণ করতে এলে হয়। তুমির 
গেলেন, বৃদ্ধসবের রাধা, ইরানের লায়লা, চিত্রারের পন্নিন—কোথায় দেখাক 
পাই এদের। কেউ কি এদের পথ তুলে বক্তিরাগের আসক না।

তোমার মনে আছে কি না জানি, কলেজে আমার প্রিয় কবি ছিলেন 
টেনিসন আর প্রিয় কবিতা। ছিল “সূর্যরায়ের কাব্য”। অবশ্য আরে।
প্রিয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও কলিকদাস, কিছু টেনিসন একটি বিশেষ অর্থে প্রিয়।
ঐ “সূর্যরায়ের” অজেহই। হায়। এত যে তাঁদের নাম জপ করলুম, 
রূপ ধারান করলুম, তবু তো তাঁদের কারণ করলুম হলো না। মনে লাইন 
টেন লাইলেই আমার মনে হতে। এই টেনেই তিনি এসেছেন, এসে আমাকে 
খুঁজছেন। সব কাজ ফেলে সেখানে ছুটে যেতুম, গিয়ে নিরাশ হতুম। 
লোকে 
বলাবলি করত, “কে টেনেই এর জানান আসছেন। বাউরা হয়েছেন।” আমি 
কিন্তু ও সব গায়ে মাকড়ুম না, নিরাশ হলেও যেতুম।

একদিন সেখানে গিয়ে দেখিয়ে টেন থেকে নামছেন ট্রয় দেশের হেলেন নয়, 
বৃদ্ধসবের রাধা নয়, লাজপত্তিগুলো। ছেলেমেয়েদের লাজপত্তিগুলোর বোঝিং 
স্কুলে রেখে এসেছেন, সেখানে তাঁরা স্থানে আছে। আমার না জানি কত 
নিস্তব্ধতা হচ্ছে একথা ভেবে তাঁর অবতী মোহ হলো, তাই চলে এলেন।
যাকু আমাকে বীরচালী। লোকে বীরকার করল, না বাউরা নয়। আমি 
আমি বীরকার করলুম যে খাদীনাতার বক্তি পোশাক না। তাঁর চেয়ে স্বীর 
হাতের মোচার ঘট মিটি।

কিন্তু মোচার ঘট এবার মিটি লাগল না। দেখা গেল কুঁঁড়া কেবল চিঠি 
লিখছে বসে। ধরে নিলুম ছেলেমেয়েদের জন্যে বড় মন কেমন করছে, চিঠি 
লিখে মনের ভাব হলুক। করু কিন্তু প্রতি দিন তাঁর নামে একই মানায়ের 
লেখ। খাম-বন্ধ চিঠি আসতে দেখে সমুহে জাগল, কার হাতের লেখা এসব। 
মেয়েলি হাতের কি না। কয়েকবার ইতন্তত করে চোখ গিলে জিজ্ঞাসা।
রূপদর্শন  

করলুম তাকে। সে বিন্যাকৃকে উত্তর দিল চিঠিগুলো আমার সামনে রেখে।

বিদ্যমান। বিদ্যমানের পর বিদ্যমান। উর্দু ভাষার একজন উদার্থমান কবি দাজিলিঙ্গ বলে গজল লিখেছেন। সাক্ষী বলে যাকে সংবাদ করছেন সে আমার কুক্ত। সাক্ষীর কাছে নিত্য নতুন গজল আসছে বাক্সারিত হয়।

গেরণাও ফুরোয় না, গজলও ফুরে না। বলা বাহান্ন উর্দু আমার হঁজনেই জানতুম। আমিই শিখিয়েছিলুম কুক্তাকে। খ্যাত শিখিয়েছিলুম মুসলমান বুদ্ধিদের কাছে। সে বিষয় যে ঐকাবে কাজে লাগবে করলাম করিনি। হতভাগ হলুম। কবির নাম হাফিজ দিয়ে আরাম। তাকে তাই হাফিজ বলে উল্লেখ করব।

হাফিজ নাকি পতনের মতো রগশনের রূপমাধুর্য। রূপের বর্ণা যা দিয়েছেন তাআমার পক্ষে আবিদার। এত রূপ যে আমার অগোচর ছিল তা বিদ্যমান করা শক্ত। কিন্তু বিদ্যমান না করেও পারিনে। কারণ কবি যা দিয়েছেন তা

পরিহারের স্বরে নয়। তবে কি একখা সত্য যে আমার চোখে সে রূপহীন।

অষ্টের চোখে সে রূপসী। এ কি কথনা সত্য যে কুক্ষা বলে সেই নৈ ওটা দৃষ্টিবিভূত। তা চোখের ধান্তা।

তখন আমার মনে পড়ল তোমার উক্ত। ভগবান রূপ সবাইকে দিয়েছেন, দেখবার চোখ দেননি সবাইকে। যাদের দিয়েছেন তারাই শিল্পী, তারা

সকলের রূপমাধুর্য। এই উর্দু কবি একজন শিল্পী। ইনি তাই কুক্ত রূপ দেখে রগশনের মতে বুলান। করছেন। হায়, আমিও যদি শিল্পী হতে পারতুম।

আমার শিল্পচন্দর দৌড় বক্তিয়ারপুরের গনেশমার্কা গেঁজি ও হস্তমুখ মার্কা

মোজা। ওই চোখে ভগবানের দেওয়া রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না। চোখ

ঝুঁটোকে বলে নেওয়া চাই। ভবলুম, কিছুদিন হস্তমুখ ও গনেশের ধ্যান

ছেড়ে গেলীশ্বর ও কাঙ্কনজ্ঞা। অবলোকন করব। বৃন্দে বললুম, "চল আমরা দাজিলিঙ্গ যাই। দেখে আসি টুবলুকে টুইকে।"

আহ। কাঙ্কনজ্ঞা দেখে হ’চোখ জুড়িয়ে গেল। কী করে তার বর্ণা

দেব। আমি তো কবি নই। কিন্তু এই আমি বুঝতে পারিনে যে কাঙ্কনজ্ঞার

মতো নারী থাকতে কুক্ষার মতো নারী কী করে বন্ধন পায়। কবিদের কি

সাত্বিকার সৌন্দর্যবোধ আছে। আমার তো মনে হয় না।

হাফিজকে নিমন্ন করেছিলুম। জরিসার শেরওয়ানী ও চুড়িদার পায়ঢামা।
পরে তিনি এলেন, জন্মু তিনি নবাব ঘরানা। মুহিদলাবাদে রাজি। পরের
মুখে নিজের স্ত্রীর রূপবর্ণনা তে। পোনোনি, তুমি করে তুমুন্দে আমার
ব্যাখা। আমার বা লাগাছিল আমিই জানি। স্থানীলুম, "আচ্ছা, এ কি ভবে
সবি সত্যে হে আমার স্ত্রীর ভক্ত ..." মনে আছে তে, রবীন্দ্রনাথের সেই
কৌতুকের কথাতটি? "চির ভক্ত" কে "স্ত্রীর ভক্ত" করেছি।

কবি বললেন, "কাবের সত্য জীবনের সত্য এক নয়। যেমন চিত্রের সত্য
ফোটোগ্রাফের সত্য এক নয়। এগুলো, আবার সেই সত্য।"

কুঁড়া সেখানে ছিল না, খালেল হয়েও আমার পেত। ইতিমধ্যে তার
ধারণা জন্মেছিল সে শ্যাবাঙ্গী সুন্দরী। তাই অর্থ। কাবে ও জীবনে।

দগ্ধির দিকে চেয়ে নয়ন। চক্ষুর হয়ে উঠলেন। আমি তাকে অভ্যর্ত দিলুম
তে। মন ধরিয়ে দেবার দায়িত্ব আমার। তখন তিনি পূর্বন্তরুপে করলেন।

দারিণীর আমার চোখ চুলে গেল। দেখলুম কুঁড়ার গায়ের নয় এক
পোষে চলে হয়নি বটে, কিন্তু রোড হচ্ছে ভিতরে। সে যেন এরপর পরে
আপনাকে অবিকার করেছে। অবিকার করেছে সে সুন্দরী। সাতার কি
আঠাশ বছর বয়সে যদি কোনো মেয়ের প্রথম অবিকার করে সে সুন্দরী তা
হলে তার সেই অবিকার তাকে বিখ্যাত আন্তরে দেয়। এ যেন একটা
অপূর্ব বিলম্ব। হিংসার ক্ষমতা নেই বলে দীর্ঘকাল অহিংসা। অচ্ছুন্ন করার
পর অক্ষম অবিকার করা গেল আমার হিংসার ক্ষমতা। রাবি। খেলছ তে
দেশ কেননা রক্ত পিপাসায় অধীর হয়ে উঠেছে। যতক্ষণ না একটা অসমান
বোমা কলাকাতার কি বেঁধে গেছে ততক্ষণ এ পিপাসার নির্ভর নেই।

কুঁড়াকে নিয়ে আমার দেশা হলো মহাকাশের মতো। কী করে তাকে
বোঝাই যে তার অবিকারী কাবের সত্য, জীবনের সত্য নয়। যে একথা
বোঝাতে পারত সে হাফিজ। হাফিজ ক্রমে দূর্ভিক্ষ হলো, তার চিত্রীক এক
সময় বন্ধ হলো। কিন্তু কে যা করে গেল তার পেড়ে চলতে ধাক্কাল।
কুঁড়া বিখ্যাত হাফিজের জীবনবর্ষী সাধা, আমার জীবনবর্ষী রূপ। আমি
তাকে এগাছি দেহ ধরে ঠিকি এসেছি। আমি প্রবেশ করে আমার
মূখের দিকে তালো করে তাকায় না, আমিই কেমন যেন অপরাধী বোধ
করি নিজেকে। একে তো আমাদের দৈহিক সত্য ছিল না, মানসিক সত্যকেও
ভাঙ্গন হয়।
দাঁজিলিং থেকে একসাথে ফিরি। আমি প্রকাশ করেছিলুম, সে যদি 
দাঁজিলিং একা থাকতে চায় তো পারে থাকতে। সে নাকচ করল। বোঝ 
হয় লোকনিদর্শ হয়ে। বিভিন্নপ্রকারে ফিরে আমি আমার কাজকর্মে তুম। 
আর যে চলল উচ্চন বেঁয়ে। বয়স তার দিন দিন কমতে লাগল। 
ঝটার পর ঝটা ঝাঁড়িয়ে কাটায় অায়নার সামনে। চুল বাঁধে, চুল খোলে, 
আমার বাঁধে। ঝাঁড়ি পরে, ঝাঁড়ি ছাড়ে, আমার পরে। সাজপাশাকের 
বাহির ছিল না, মুক্ত হলো। সো পাউডারে মেঝে জুড়ে পালিশের মতো 
চেঘ্রা হলো। তা হোক, তাতে আমার আগ্রহ নেই, যার তাক আছে 
সে যদি দুঃখে ওঠায় তো আমার কী। কিন্তু মাঝখানে চেলেমেয়ে না 
শোরায় সে একবারে আমার কোলে এসে শোয়। অাশা করে আমি 
তার কোন দেখে দুঃখ। কণ্ঠকারের জন্যে তুলিনি যে তা নয়, কিন্তু সেটা আমার 
নিজের দুর্বলতা, তার মাঝরাত নয়। সে কিন্তু ধরে নেয় যে তার মধ্যে অপূর্ব 
মোহিনী শক্তির সংকার হয়েছে। অমনি মোহিনী শক্তির অহুলীলন রত 
হয়। এদিকে আমি বিকার বোঝে অস্পৃষ্ট। কী করে পরিহার করব ভেবে 
পাইনে।

আর একটু দৃঢ় হলো, এটি ভেল। খুব খুঁশি হলুম দুঃখে। আমি 
বললুম, "আর কেন? এখন থেকে পূর্ণ ব্যস্তা বহাল হোক।" সে কিছু 
বলে না, মুখকি হয়ে। ভেলের জন্যে চোটা একটা বেরী কট কেনা হলো। 
ভেলেটি নেইখানে শেয়ার। আর আমি প্রতি রাতে রবীন্দ্রনাথের সেই শোচনীয় 
পঙ্কজগুলি আয়ুক্তি করি—

"রে মোহিনী রে নিল্লীরা ওরে রকলো ভাতুরা। 
কঠোর আহিম্নী।

দিন মোর দিন তোরে শেখে নিতে চাস হবে 
আমার আমানী।"

অগত্যা পদ্মিনীর কথা বলালি করতে হলো। হিমালয়ে মহাগৃহেন 
করতে পারি আভাসে ইতিমধ্ু জানালুম। কিন্তু কে বিশাল করবে ও কথা। 
আমার হোসিনারী ফাঁপতে ফাঁপতে টেক্সটাইনের আকার ধারণ করেছিল। 
কটন মিলের উত্তরে আরো জন্মে জীবনটা মধুর হয়েছিল। কোন না হল পাইনি, 
কিন্তু কোনো তো পেয়েছি অনেক অলেল। কোনোর মায়া আমাকে ধরে রাখতে 
পারবে না, কিন্তু কোনোর মায়া? দেখা গেল কামিনীর চেয়ে কাদেরের আকর্ষণ
কম নয়। থেকে গেলুম কাঁঠনের তানে। কফ্ফা কিন্তু ঠাওরালো। কাফিনীর কাঁঠনে। তার মুখে হানি আর ধরে না। মোহিনী শক্তির জয়।

সেই হাড়কাঠ থেকে উদ্দারের উপর নেই দেখে গুরু ঢেকে এনে মহন্ত নিলুম গার্হস্থ্য সম্ভাবনার। কফ্ফা সাধলুম, “তুমিও নাও!” তার চোখ দিয়ে আগন ছুটল। কী যে হলো তার জ্ঞানে, যখন কাঁঠা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা, পাড়ায় পাড়ায় গল্প করে বেড়ায় আহার নিম্ন তুলে। রাতে খুঁতে পেতে ধরে নিয়ে আসি, বন্ধ করে রাথি। চিকিৎসকের পরামর্শ গুলোর অনুমতি নিয়ে শান্তিতে সন্ধ্যা আবার পাঠাতে যাই। ফল হয় উটে। কাঁচর হয় বলে, তুমি আমার বাপের বন্ধী। তুমি মাননীয় রুদ্র, তোমার কি শোভা পায় এ অধর্ষ! আমি নাকি তার বাপের বন্ধী! হে হরি! আমি নাকি মাননীয় রুদ্র! হে ঈশ্বর! 

নয়নদা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন। কুঠে কুঠে শরন বললেন, “পাড়ার ঘরে ঘরে গিয়ে আমার নামে রটায় আমি নাকি তাকে সুন্দরী তুলি গেয়ে তার উপর বল প্রচোধ করি। রুশো বয়সে আমার নাকি ভীমবিত ধরেছে। হে হরি। আমার আর বাধা মিলিছেন। আমার আর আর! আমার আর বাধা এই। বললেন, আমা। বললে আমার দু'নাথ মিরুি। তৈরি হয়ে গেলেই আমি চোখ রুজ্বব ... সবাই বললে ওকে পাগলা গায়ে পাঠাতে। কিন্তু সেটা হবে ধন্যাধর্ষ অধর্ষ। না, তা আমি গাই না। কিন্তু এ অমার অসহনীয়। আমার মান গেল, আমি আর না গেলুম লোকচে কথা।”

আমি তার চোখ মুছিরে দিলুম সেকালের মতো। এক হস্তেলে এক ঘরে বাস করতুম আমরা। রাতে কেঁদে মেলে সুন্দরী নারীর মন্দি। নয়নদার নিশ্চিত প্রত্যাশা ছিল সুন্দরী নারী তার ভাগ্যে অবধারিত। সেটা তার জ্যোতি। জ্যোতির করুণা হলো। দেখে তিনি কেঁদে আকুল হয়েছিলেন বিশ বছর আগে।

চোখ মুছিয়েছিলুম আমরা কয়েকজন বয়স।

সাধুবাসীদের বলছিলুম, রুপ ভগবান সবাইকে দিয়েছেন, নেবার চোখ দেননি সবাইকে। এখান কী বলব? বলার আচ্ছা কী?

(১৯৪৬)
বারী

সেনাবার আমারা ছুটি নিয়ে উত্তরাঙ্গ বেড়িয়ে আসার পর যেখানে বদলি হই
লেখানকার বাড়ির সামনের দিকটা খোলা। দরজা খুলে রাখলে রেললাইন
থেকে অন্ধ দেখা যায়। পার্দা খোলা পড়ে। পার্দা ছিল মালদাগ্নিতে মালের
লক্ষ। হাতের কাছে ছিল বুদ্ধাবরণ থেকে উপহারের জন্য আমার খানকা
নামাবলী। আমার জন্য দরজায় জানালায় লন্ধনের দেওয়া গেল অপারেন।

কিসের থেকে কী হয়। আশক্ত ছিল লোকে নিজের করতে নামাবলীর
অসম্ভাব্য থেকে। ৪টির আর্করে যেমন পতন
আসে তেমনি নামাবলীর সমৃদ্ধ হলে এলা বাউল বৈধ দরবেশ। হুঃ
মুসলমান দরবেশ। আর এলা বায়াচারী ভাত্রিক। এদের সকলের ধারণা
আমি পরম ভাঙবত।

সে যুগের একসালি যুগ আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। অমনতে ইচ্ছা
করে গৌরবদন এখনো বেঁচে আছে কি না। না থাকাই সম্পূর্ণ। মন্ত্রমাত্র
অধিকাংশ বাউল দরবেশ মরে সাফ হয়ে গেছে। ভিক্ষা যাদের উপাচীবিকা
ছড়িয়ে হলেই তারা ঝরে পড়ে।

রবিবারের সকাল। ঘরে বলে নিজের কাজ করছি, বাইরে উঠল গানের
আওয়াজ। কানে এলা সকল মোটা এক জোড়া গলার বিচিত্র ঝর–
"রাধা নামে নাই অধিকার তবে তার কিসের উপাসনা।
তার কিসের উপাসনা রে বুখা তার আরাখা।"

কাজে মন লাগছিল না। গেলুম দেখতে। চাতালের উপর বলে আছেন
তিন বাবাজী—একজন তো আমার তিন বছরের ছেলে, বাকী হ'ঝুন্ন কোটা
তিলক কাঠ গেলো পরা বৈরাগী। তাদের একজনের হাতে অনন্দলহরী,
আরেকজনের হাতের কাছে লাউ দিয়ে তারি ভিক্ষাপাত। যার হাতে
অনন্দলহরী তারই নাম গৌরবদন। বনস চকচকের উপর। মাঝায় ঝাকড়া
ঝাকড়া চুল। মুখে সোপদান্তির কোপ।

গান চলতে থাকল। আমি এক পাশে আসন নিয়ে নতুনে থাকলুম।

১৬
গল্প

"শক্তি বিনে নাহি মুক্তি বেদতপে আছে মুক্তি
ও সে মূল শক্তি রাধা বিনা সাধনার ফল ফলে না।"

এমন সময় আমার গৃহিণী এসে সাধুদের নিখা ও দক্ষিণা দিয়ে গেলেন।
তাতে তাদের উৎসাহ বেড়ে গেল। একটার পর একটা গান শুনিয়ে চলল তারা।
তখন আমি ক্যামেরা এসে তাদের অ্যাপস্ট তুলে নিলুম।
একটা তারা আশা করেনি।
কোনো নকল চাইল। আর চাইল—বা সকলে চেয়ে
খাকে—এক একবার নামাবলী। এ অ্যার্থা নামঘোর হওয়ায় গৌরবদনের
সহচর বিদায় নিল।

গৌরবদনও উঠত, কিন্তু ইতিমধ্যে আমি তার গান লিখে নিতে আরম্ভ
করেছিলুম।
এমন সাহিত্যিক খেলাল, কিন্তু সে তো জানত না যে আমি
একজন সাহিত্যিক।
ঠাওরাল আমার ধরনে মতি আছে। আমাকে বোঝাতে
চেষ্টা করল গানের মর্থ।
"শক্তি বিনে নাহি মুক্তি—বৃত্তলেন তো, প্রস্তুত।" অ্যামাকে সে প্রস্তুত বলত।
"রামের শক্তি সীতা, শিবের শক্তি তুর্গি, কৃষ্ণের
শক্তি রাধা।
তেমনি পুকুরের শক্তি নারী।
নারীর মধ্যে রাধাশ্বাক্তি বিরাজ
করে।
সকলে তা জানে না।
সেইস্থানে গুরু ধরতে হয়।"

এর পরে তার গুরু গুরিং।
গরম হয়ে পুকুর।
মাঝে মাঝে দর্ষন
দিয়ে যান শিক্ষাদের।
"আবার যেদিন আসবেন আপনার কাছে নিয়ে আসব
তাকে।
তিনি যেমন করে বলোঁতে পারেন কেন তেমন পারেন না।
আমি
কী বা জানি।
কেতুকেই বা রুষি।
প্রস্তুত লিখে নিচ্ছেন বলে ভরসা।
করে নিবেদন করলুম।"

আনন্দলঘরী বাজাতে বাজাতে গৌরবদন চলল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখি গৌরবদন আবার এসে হাজির।
এবার একা।
চারি কথার পরে কোটাখানার কথা তুলল।
সেখানে তখনো তৈরি হয়নি,
পরে নিরাশ হলো।
খান ছিল ভাবনা শোনাবার পরে আমিন এক সময় তার
আবার গৌরবদন পাড়ল।
শহীদের বাইরেই একটা দুরে তার আখড়া।
ভিক্ষা
করে দিন চলে।
চাহি হয়।
অথবা এমন অবস্থা চিরকাল ছিল না।
কিছু 
অভাব ছিল তার।
ঘর গৌরগুলি জোড়ছাড়া হালজারু পুকুরবাগান সবই
ঠে ছিল, এখনো আছে তার ছেলেদের নামে।
কিন্তু আর ওমুখো হবার
জো নেই।

ভালোই ছিল সে তার ঘরগৌরগুলি নিয়ে।
চাবার ছেলে, চাষ থেকে
নারী ২৪৩

হঠাৎ তার একটি আঁটারা মাসের খোঁজ মারা যায়। পরিবার পাগলের মতো হয়। কিছুতেই কিছু হয় না। চিকিৎসার অসাধ্য। বড়ই অশান্তিতে থাকে। একদিন তার পরিবার স্নান কেহল—পরম স্বন্দর পুকুর। কুটো লোকের মত দেখিয়েছেন, তারা দুঃখ শোক তুলে যে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। পরিবার ধরে বসল নেও মনে নেবে। আর কারো কাছে নয়, তারই কাছে। কে তিনি? কী নাম? কেখোয়া বসতি? আঁটা আঁচেন কি না? এ সব বাকিরের উভয় কোথায় পাবে? পরিবার জন্ম না, কোথাও মেল। বললে বা মেহোৎসব হলে জেল ধরবে, চল, গুলচে দেখব। বিভূতি ঘোরায় তুলিয়ের পর সত্যি একদিন দর্শন মিলে গেল। পরিবার বলল, ইনিই সেই পরম স্বন্দর পুকুর। গৌরবন বিখ্যাত করল। বিখ্যাত কবর মতো চেহারা বট। কলুপার সাগর। যে আসে সেই তার কলুপার ধার। পেয়ে বেঁচে যায়।

ধরুগুহ্যী ছাড়তে হবে না। বাড়িতে গোপাল প্রতিষ্ঠা করে নিত্য সেবা করতে হবে। শুধু দেহে শুধু মনে থাকতে হবে। নামকর্তন নামজ্ঞ করতে হবে। স্বত্বের ভগীরতায় সমর্পণ করতে হবে। নারী পুকুরকে পুকুর নারীকে অবলম্বন করে অলঙ্করণের মতো।

এর পরে তার পরিবারের পাগলামি করে করে সেয়ে যায়। তারা ছাঁদে স্বথে না হোক সোয়াটিপে দিনপাত করে। সংসারে থেকেও সংসার নয়, মন পড়ে থাকে গুরুর শ্রীচরণে, কোথাও মেলা কি মেহোৎসব হচ্ছে সালফেই সেখানে গিয়ে জোটে, গুরুবাহাইদের সঙ্গে তাদের পরিবার পরিজনের সঙ্গে মিলে মিশে কিছুদিন কাটায়। এইভাবে বহ অপরিচিত স্নাত-পুকুরের সঙ্গে আলাপ ও আত্মীয়তা হয়। তারাও মাঝে মাঝে তাদের বাড়ি আসে, হুকুমাচনি অন্ত্বি হয়। নামকর্তন করে বড় অনেকে রাত কাটে।

এক দিন এক গুলিভাই এলো, বেশ কিছু দিন স্বাভাবিক হলো। কীর্তন গায় ভালো। লোকে ব্যাক্তি করে। যাবার বেলা উঠেল পাঁচঙ্গে বলে, আর কিছু দিন পরে মেহোৎসব। এই কী দিন থেকে যান। পরিবার কিছু বলে না। সে আশ্চর্যকর নীরব। দেখে জনে গৌরবনের মনটা কী জানি কেন উঠাস হতে যায়। রাতে দুঃখ দেখে। প্রাণণে মন জগ করে। পরিবারকে বলে না। ছাঁদের মারাত্মকে যেন এক অদৃশু প্রাচীর গড়ে উঠেছে। কেউ কাউকে মনের কথা বলতে পারে না। মনে চেপে রাখে।

একদিন ছুক্ষের পর যুম ভেঙে গেল। মন জগ করে করে হঠাঙ
ঠাহর হলো বিছানায় সে নেই। গেছে কোথাও, কিরে অসম্ভব এখনি। কিছু কিছু কিরে অসম্ভব না তো। তবে কি—? গৌরবন্দ শিবলে উঠল। নিজের পাগ মনকে দিবে দিল। মন তার দিকের শনি দিয়ে হলো না। তাকে চালিয়ে নিয়ে গেল বাইরে, চালিয়ে নিয়ে গেল গুল্লাই যে ঘরে শোয় সে ঘরে। সে ঘর খোলা। তবে কি—? গৌরবন্দের সর্বাঙ্গ আস্থা হয়ে এলো।

সে ভাবত পারে না। কি করবে, কি করা উচিত। তার মুখ দিয়ে রা বেঁচে রান। তখন ঠাঁট মনে পড়ল তার পরিবার জেগে ধরেছিল তাকে রুদ্রাবনে নিয়ে যেতে। সে রাখ হয়নি। ইচ্ছা করলেই কি রুদ্রাবনে যেতে পারে।

গোবিন্দ নতুন না ভালোকে নতুন অপেক্ষা করতে হবে।

এটা তা হলো তাঁদের রুদ্রাবন যাত। গৌরবন্দ বেন আধারের মাঝখানে আলোক আধারে গেল। যাক তারা রুদ্রাবন। নতুন করে কুঞ্জ বড়ুক, লীলা কফক। কিলের দারাহুতি, কিলের বিষয়ক শুন। গোবিন্দ তাদের ডেকেছে, ভাবঠাক তো। তাদের অনেকে হবে। তারা গেছে, বেশ করেছে।

জিনিসগতও নিয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে। কেবল ফলে গেছে একটা পুরোনো তোরঙ্গ, বিষের সমাজের সামাজ, বিষের ভারি। ওরে অক্ষরূপে থাকে। পুটকে হুই হাতে তুলে মাথায় করে ঢুটল গৌরবন্দ। ঢুটল ইটশেনের বাংলায়। যা তেরেছিল তাই। কোশিষ্ণুনেক না। যেতেই ওদের সঙ্গে খেদা।

ওই অন্ধায় ওকে দেখে ওরা তো। গেল ভড়ক। গৌরবন্দ বলল, "ভাই, ও বোকা আমি আঠারো বছর বয়ে আসছি। তুমি যখন বেঁচেই নিয়েছ তখন এ বোকার নাও।" এই বলে গুল্লাইয়ের মাথায় তুলে দিল তোরঙ্গ।

লোকটা হতভাগ হয়ে তলজে থাকল।

এই কাহিনী আমার মনের উপর কেমন বেধাপাত করেছিল তার প্রাণে এ সব আঘর। আমার মনে আছে চোদ্দ পনেরো বছর পরে। আমার চোখে গৌরবন্দ বর্ণের জলার চাবি বা কুঞ্জ বাকীর বৈঠার চেয়ে বড় হয়ে দেখি দিল।

কিন্তু করুণাশালী কাহিনীটির এক প্রাঙ্গণে একটি হাস্তক্ষীর আমের ছিল।

সেটা আমার খাস। লেগেছিল। জিজ্ঞাসা। কল্যায়, "গৌরবন্দ, তুমি কি সত্যিই এত বড় একটা তোরঙ্গ মাথায় করে ঢুটলে?"

"হা, এসো। তবে কি আমার বোধহয় ছিল।"

"তার পর এই গল্পশালায় ওর মাথায় চাপিয়ে দিলে।"
নারী ২৪৫

"বিলুম চাপিয়ে। ও কি পারে বইতে! নামিয়ে ফেলল। তানেই বছর
খানেক পরে অন্য বোকাটি নামিয়ে ফেলল বৃদ্ধাবনের পথে। তাতে আমার
কী। তাত বিনে আমি বিষয় সংসার ছেড়ে ভিড়ারী হয়েছি।"

আমার মনের ভিতরটা হায় হায় করছিল তাদের হুঁজনের দেশে।
আমাকেও দোষ দিতে পারিনে, প্রাণের না। আঠারো বছর ঘর করায় পর
কেউ তুমি কারণে ঘর ছাড়ে না। ছিল কোনো গভীর কারণ যা গৌরবনের
অজ্ঞত কিংবা আমার কাছে অপ্রকাশিত। হুমাকার মাঝে আমি তার
দুখটাই দেখি আগে, দেখানো বিচার করি তার পরে, কিংবা আরো
করিনে।

সে রাতে আমার ওখানে ওর আহারের আয়োজন হলো। সমুদ্র ব্যবহার
পেয়ে গৌরবনে কেবল ফেলল। "এছাড়া, আমি একটা নগণ্য লোক।
আমাকে মেয়ের বিধাতার কী লাভ হলো। এ যে কলাপাতে পরিণত।"

আমার চোখের কোণাও দূরন্ত। ছিল না। উজ্জ্বল দূর আসে বললুম,
"বিধাতার কাছে কেউ নগণ্য নয়, কেউ গামাতটি নয়। তার উপর বন্ধ বিখ্যাত
থাকে তবে তোমার প্রেমের উত্তর ভুমি তার কাছেই পাবে। আমার তো
বিখ্যাত নয়।"

নামাবলীর বিখ্যাত সতে আমি সে একজন সংশয়বাদী এ কথা আমি
তাকে কেমন করে বোঝাই। সেও কেন তা বুঝবে! বলল, "আপনি
পরম বৈশিষ্ট। সেইসঙ্গে ভগবান আপনাকে সব দিয়েছেন। তার উপর
বিখ্যাত হারাবেন না, এরূপ।"

দিন কয়েক বাদে সে আমার এসে উপস্থিত। সে জানত যে সন্ধ্যার পর
আমার দেখা পাওয়া তত্ত করা নয়। ভজনের হুর প্রলেপে আমি গলে বাই।
আসত খন্ধ গান দিয়ে ক্ষান করত। এবার শোনা গেল,

"নরতম ভজনের মূল
পুরুষ প্রকৃতি দৌড়ে হয়ে অন্ধকুল
নিজ দেহে আছে হরি শক্তি
কর তো তার ধারণা।"

আবার ওকে নিয়ে বসতে হলোমা। লিখে নিলুম ওর গান।
গৌরবনের ফোটা তৈরি হয়ে এলেছিল। দেখে খুশি হলো। ৩ কিন্নর
ফরোর জন্য আসেনি। এসেছিল অন্য উপলক্ষ। সে কথা তো মুখ ফুটে বলবে না, গৌরচন্দ্রক। করবে না।

"প্রভু, বিষয়জী। বিষয়ের জাল। কী হবে আমার বিষয়! যত দিন এ দেশে ভিক্ষা জুটবে তত দিন এ দেশে থাকব। তার পরে চলে যাব আর কোনো দেশে। কথায় বলে, বহুতা নদী রসেতা সাধু।"

আমি বললাম, "কেন, বিষয় কোথায় পেলে?"

"দিনে একজন। সেও আমার শুভাৰ্ত। আমাকে বাধতে চায় একটাই। আমি বলি নিজের বিষয় ধাকতে আমি উদাসী। পরের বিষয়
নিয়ে কি আমার হাল নাড়ল ধব। বলে, ঘরগোড়া গোঁড়ি সিঁড়ের মেঘ
দেখলে জরায়।"

আমি চূর করে ধাকলাম। সে আরেকটু খুলে বলল। "বিষয়জী।
বিষয়ের জাল। আরেক জালা এই নারী।"

কোন নারী? আমি বিষমত হই, কিন্ত জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ
বোধ করি।

"প্রভু,” সে এক তরফার বকে বায়, "নারী হচ্ছে অবলম্বন। যেমন অক্ষর
নড়ি। অন্যকে সঠিক পোঁছে দেখ তার ঠিকানায়। নারীকে অবলম্বন
করেই আমারা পোঁছেই রসেতে পেলে। তাকেই বলে রাধাশঙ্কি।"

"আর হরিশঙ্কি?"

"হরিশঙ্কি?" সে একটু চিন্তা করল। "অবলম্বন করতেও তো কিছু
শঙ্কিত লাগে। সেটুকু না থাকলে তো অবলম্বনও সবে যায়। গেল তো চলে
বৃষ্টাবনে। প্রভু, আমায় যদি-হরিশঙ্কি থাকত তা হলে কি আমি যেতে
মিলতে তাকে?" বলতে বলতে তার গলা ভারি হয়ে এলে।

আমিও চিন্তা করছিলাম। নারীর সঙ্গে পুরুষের সঙ্গে কি? তারা কি
কেবল ঘরমাছ করবে, বংশরক্ষা করবে? মাঝে মাঝে করবে তীর্থযাত্রা?
দীঘা নিলে দেখলেনবে।? তার বেশী আর কিছু করবে না, করবার নেই?

"নারী বিনা সাধন হয় না প্রভু।" গৌরনন্দণ বলে চলল। "কিছু একে
নিয়ে কোথায় যাই, কোথায় রাখি! আপনি খেতে পায় না, শিক্ষারকে ভাবে। এর জন্যে কি আমি বিষয়জ্ঞালায় জলব?"

সে কি তবে তার পরিবারকে ফিরে পেয়েছে এত দিনে? জানতে ইচ্ছা
করে। সে উভয়ের দেখ, "না, প্রভু। শুনেছি বৃষ্টাবনেই বাস করছে। ছুঁড়ের
নারী

২৪৭

অবন! যার মধ্যে পৃথিবীকে করেছিল, তার তার আস্তান তো। নিজের কর্মফল তো। ভোগ করতেই হবে। যার জন্য করি চূরি তাই বলে চোচ। গোপালের নামে ছেলেরা কিছু কিছু পাঠায়। তাই বিমা কোনো রকমে চলে। ও আমার আসবে না কালো মুখ দেখাতে। লজ্জার মাঝা খেয়ে আমাকেও ঘেঁষে বলে গেধানে। কিন্তু আমার কি যাবার জো আছে? গোবিন্দ আমাকে ডাকলে তো?

এবার আমাকেও লজ্জা মাঝা খেয়ে জেরা করতে হবে। তখন সে বলল সে অন্য নারী গ্রহণ করবে। শুধু আদেশ। সে মহাসাগরের ছেঁড়ে যত তত ধরে বেড়াচ্ছে খবর পেয়ে শুধু তাকে ভেঙে পাঠালেন। বললেন, আমি করে সাধন হয় না। তাকে আবার স্ত্রী গ্রহণ করতে হবে। তার কি সহজে রাখে হয়! ভাঙা কোথায় বেলনগাছ যায়। শুধু তার মনের কথা অচ্ছে করে বললেন, "মায়ে নিজের কেবলই লুঝ পায়। দিয়ে করেছে বলে ভাবে সাব। জীবন ধরে রাখবে। তা কি সম্ভব! জগতে মৃত্যু আছে, তার হাত থেকে হাতে রাখতে পারবে? মৃত্যুর হাত থেকে যদি না পারবে, তবে প্রেমের হাত থেকে কী করে পারবে। প্রেম কি মৃত্যুর চেয়ে কম শক্তিমান।"

গোবিন্দ তার এক দুঃখিনী শিশুর মাঝা সঙ্গে করিপ্রবর্তন করতে বললেন। মেয়েটি বড় ভালো। বিধবা। তার একমাত্র সম্পদ মারা গেছে, আপন বলতে কেউ নেই। নিরাশ্র, সম্পত্তি যা ছিল দেওয়ার চক্ষে নৌকাম হয়ে গেছে।

গোবিন্দ বদ্বাক্য লজ্জা করল না। এ বোঝা মাঝা তুলে নিল। কিন্তু কেবল তাকে রাখবে? নিজের কোনো আবার কিতো আত্মানা নিল। আজ এখানে কাল ওখানে করতে করতে বেচারির কি যে অসুখ করল, অসুখ আমার সাবে। আমি যদি অনুমতি করি তার প্রকৃতির এক দিন নিয়ে অাসবে, আমার প্রকৃতির পায়ের খুলো নিতে। চিকিৎসার যদি একটা প্রয়াস হয়।

ধনি কয়েক পরে ওরা হংসনেই এলে। পৃথিবী আমার প্রকৃতি। মেয়েটির লখি। ছিলাছিলে গড়ে। গোবদ্কেনের মতে বলিত নয়। যোবন গেছে, রূপ বা ছিল দীর্ঘ রোগভোগের পর নিঃশেষ হয়ে আসছে। আমাদের হংসনেকে অসুখ করল কুণ। রাখতে। আমার পৃথিবী আমাস মিলেন যে সরকারি ভার্টারকে বলে দেখবেন কোনো উপায় আছে কি না। সরকারি হাসপাতালে
গৌরবন বোধ হয় অন্য করেছিল লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন। নিদেন পক্ষে তার প্রতি। কিন্তু গৌরীসেন তখন ছাটাই চালাচ্ছেন। আর তার প্রতির সাধ্য অসীম নয়। এর পরে আর সে আসেনি। মাঝে মাঝে যখন পড়ত ওজনের ছট্টনের ঐ করণ অহংকার। মনে হতো কিছু একটা করা উচিত ছিল। করিমী বলে মন কমেন করত।

নরতত্ত্ব ভংনেরি মূল, যদি রোগশোক না থাকে।

( ১৯৪৯ )
অপরা

১

বিশ বছর আগে বিলেত থেকে ফিরছি। জাহাজের ক্যাবিনে আমার সঙ্গে দিয়েছে এক মরাঠা যুবককে। ভঙ্গী, বিধান, কৌতুকশির্ক, সাহিত্য ইত্যাদি অনিবন্ধনীয়। তাঁদের মধ্যে একজন বলা হলো, ক্যাবিনের বলা বন্ধু। তার টেবিলের উপর একখানি ফোটো ছিল। ফোটোগ্রাফার কোনো এক টুকির। তিনি যে বিবাহিতা তা আমার জানা ছিল না। ভেবেছিলুম প্রেমে পড়েছেন। প্রশংসা
করে বললেম, “মেয়েটি তো বেশ সুন্দর!”

যুবকটির মুখভাব মুহূর্তের মধ্যে বললে গেল। অবজ্ঞার ভীষ করে তিনি
বললেন, “মেয়েটি বেশ সুন্দর! না?” এই বলে টান মেরে কোটোবাহাকে
মাটিতে ফেলে দিলেন। “সুন্দর!” না? বললে বললে সেখানকার পা দিয়ে
মাথিয়ে ঘুরিয়ে লাভি মেরে সরিয়ে দিলেন।

আমি তো অবাক। কী যে আমার অপরাধ, মেয়েটির অপরাধ যে কী,
তখন তা নিজেই পারি। পরে শুনলে পাই, তিনি বিবাহিতা। স্ত্রীর সঙ্গে
কেউ কোনো মন্তব্য করলে তিনি ক্ষেপে যান। পরে পুনর্বার চোখে তার স্ত্রী
সুন্দরী, এ তার অসহ। তিনি যে আমাকে অন্য রাখলেন এইখানেই তার
শিক্ষা।

জাহাজের সেদিন বশেতে ডিডল স্ত্রী এসেছিলেন তাকে নিতে। তিনি
ভাড়াতাড়ি নেমে গেলেন, আমার দিকে ফিরে তাকালেন না, বিদায় নেওয়া
তো দুর্দান্ত কথা। আমি ও অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলেম। মনে মনে
বাংলাদেশ নির্দিষ্ট স্থানে জীবনবাহু কথা। আমার জীবনের আর এক
অভিজ্ঞতা।

সেবারেও বিপদ ঘটেছিল এই রকম একটি উপজি থেকে। কবিত্ব করে
বলেছিলুম, “নির্দিষ্ট তুমি কি মানবী। না তুমি অপরা।” পাশের ঘরে
ছিলেন জীবনবাহু। মামলার ভবিষ্যত পড়েছিল। উঠে এসে নির্দিষ্ট গানের
ধ্বনি তুলে নিয়ে চলেন রাখারে। সেখানে অল্প পরে উঠে। খাদে-
খানায় ইলেকট্রিক ছুঁড়ে পড়ে দিলেন আমাকে। তারপর ফিরে এসে বললেন, “আমার
স্ত্রী বাচ্চা নয়, কুলবাণ।” নির্দিষ্ট মৃত্যু এমনিতেই কালো। সে মৃত্যু আরে।
কালো দেখালো। তিনি কী যেন বলতে গেলেন, বলতে পারলেন না, বলব্যব করে কেঁদে ফেললেন।

অথচ জীবনবায়ু লোক মন্দ নন। আমাদের চাদারখাতায় প্রথম স্বাক্ষর করতেন তিনি, তার চাদার অব দেখে অন্তর পাড়াপড়ি। আমাদের খেলাধূলায়, পুজোপার্বণে, নাটক অভিনয়ে, এমন কি সাহিত্য সভায় তাঁর উৎসাহ আর সকলের উৎসাহকে ছাপিয়ে যেত। তা বলে এমন কিছু বড়লোক ছিলেন না তিনি। মাঝারি গোছের উকিল।

নিরুদিত বয়স হয়েছিল। তিনি চারটি ছেলেমেয়ের মা। দেখতে বৃদ্ধরী নন। দোহারা গড়ন। কিন্তু তাঁর বঁধব মুখুর চেয়ে মুখুর। কাজ করতে করতে গুন গুন করতেন। সে কাজ বাণিজ্য মাজাই হোক আর কাপড় কাচাই হোক। গান তাঁর কথে আপনি আসত। সময় অসময় নেই। গুরু লছু আন নেই। যেন তাঁর গলার ভিতর এক অচিন পাথি থাকত, পাথিটা স্বপ্ন তখন গান গেয়ে উঠত।

পাথিটাকে সামলানে। শক্ত, তাই তিনি বড় একটা বাড়ির বাইরে যেতেন না। বাড়িতেও শামী রাগ করতেন, শাইফুল বকতেন। সঙ্গীতের জন্য বলেই রক্ষা, নইলে এত দিনে সীতার বনবাস হয়ে যেত। মাঝে মাঝে কুইল। চড়িটা হামি তা নয়। কিন্তু মৌটের উপর শামী-গৌরীতে বনিবন। ছিল, শাঙ্গরী নৌকাতেও। সেইজন্যে তাঁর সঙ্গীতচর্চা। একবারে বন্ধ হয়ে যামি। আমি তাঁকে নতুন নতুন গান সংগ্রহ করে দিতুম। তিনি লিখে নিতেন। তাঁর গানের গায়ত্রী ছিল তাঁর বড় সাধের সামগ্রী। ও গায়ত্রী বিদ্যা আগেকার।

তখন তিনি ওয়ানদের কাছে গান। শিখেছিলেন। ওনাদ তাঁকে বলেছিলেন, "মা, গান হচ্ছে সারা জীবনের সাধন।" বিদ্যা ব্যাপারে নয়, গান তবে সাধনার ফল পাবে না। উদ্দেশন করে পারা এ সাধন। বাড়িতে রেখো।"

গানের বাড়াবাড়ির সকল স্তোত্রের সাধনাও সহজমত গেল। নির্দিষ্ট আর আমাকে ডেকে পাঠালেন না। আমারও তো মান অপমান বোধ ছিল। আমিও আর ওয়ানদে হৃদি।

কয়েক বছর পরে খাব পাই তিনি মৃত্যুশ্যামায়। গেলে শেখতে।

গিয়ে দেখি অস্তম দশ। যেন আমার জন্যই অপমান। করিছিল।

কথা বলতে কঠোর হচ্ছিল। তবু কোনো মতে বলতে পারলেন, "আমি অপমান।" মুখে হাসির ললাট। চোখে আলার ঝলক। অপরাহী তোঁ
বটে। আমারও তা মনে হলো, এ কোনা অপরা। শাপসেচনের লগ্ন, নিকট হয়ে এসেছে, চূড়ান্ত খণ্ড পড়বে এখনি। তাই যাবার বেলা জানিয়ে বাছু, আমি অপরা।

আমার চোখ তখন রাগলা হয়ে এসেছে, চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। কি যে দেখছি, কাজে দেখছি তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। এত রূপে আগে লঁক করিনি, এমন রঙে আগে নজরে পড়েনি, গড়নটি হাওয়ায় উড়ে বায়োর মতো। হবে হয়তো কেনা অপরা, শাপসেচ হয়ে এসেছিল আমাদের জগতে, যত দিন গৌরবের সাধনা বাইঢিয়ে রেখেছিল তত দিন বেঁচেছিল, সাধনা বাচল না, এং আর বাঁচতে না।

ছেলেমেয়ের নানা স্বর কাঁদল। জীবনবাচু ভাবাত গতির। কিন্তু তিনি কাশায় কারা চেয়ে কম গেলেন না। প্রতিভীর। কাছাকাছি ভাবন করিনি, কাজে মানা করিল পরপরকে। আর অস্ত্র হয়ে ভাবিল কার সত্য শোক। এ কি জীবনবাচু ত্রী! মাদিকের মা! না অপরিচিতা কোনা কিশোরী! তাদের অনেকে পরস্পরে এই প্রথম দেখতে গেল। পরের অন্য পুরুষ প্রথম পাপশূন্যের উত্তেজনায় কেউ কেউ কাপিল। এদিক উদিক চেয়ে মুখার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলিল, আহা! পূণ্যতী। মহিলারা শান্তিকে শান্ত করতে চেয়ে করিলেন। তিনি মাঝে হুঁড়িলেন।

২

ঝামানে জীবনবাচু গেলেন না। উঠানে একটা চেয়ারের উপর বসে আকাশের দিকে একটুফাঁক তাকিয়ে রইলেন। বহুক্ষণ নিমিত্ত করার ফলেই হাক বা কোনা। অলৌকিক কারণেই হাক আকাশে তিনি তার নিন্দকের ক্রম ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যেতে সেখানেন। নিক যেতে যেতে তার দিকে চেয়ে মুখে হাসিলেন। তেমন হাসি নির কোনা। দিন হালেননি। মুক্তিকে উদাসকে সংশ্লেষ করে কারাগারের দিকে চেয়ে মুক্তি বন্ধনী তেমন হাসি হাসেন।

নিকর মৃত্তি আকাশে মিলিয়ে গেল। যেখানে মিলিয়ে গেল সেখানে রেখে গেল মুখ মুখ হাসি। মৃত্তির হাসি। সে হাসি যেন জীবনবাচুকে বলিল, "কেমন, অপরা কিনা এখন চিনলে? না আরে প্রাণ চাও?"

ঝামান থেকে ফিরে ছেলেরা বলল, "জানো বাবা?" তাদের চোখে জলফ, কিন্তু মনে গর্ব। "জানো বাবা, মা'র শরীর থেকে কেমন হৃদপ্রাণ ছেলেছিল?"
"কিসের হৃদয় রে?

"টিক যেন ধূলের স্বাদ। সত্যি বাবা! তুমি জিজ্ঞাসা করো সবাইকে।"

জীবনবারু বিস্মিত হলেন, কিন্তু এতে বিস্ময়ের কী আছে? অপরা। যদি হয়ে থাকে! নির্দেশের অনেকের তিনি নাসায়ের মৃত্যুকরণ করতে চাইলেন, মৃত্যু হলো না। আগেও একথা তাঁর খেয়াল হয়নি, হলে তিনি নির্দেশের অনেকের তাঁর নাসায় ভরে রাখতেন। বলেনো বছরে যে তাঁর সঙ্গে ঘর করল তাঁর গায়ের গন্ধ কেমন সে বিষয়ে তিনি কোঁচুগ্নাই বোধ করেননি।

কেবল গন্ধ কেন, স্পর্শও তে। তাঁর ভ্রমের মৃত্যুর নেই। বোল বছর ধরে রাতের পর রাত যার সঙ্গে জীবন তাঁর স্পর্শের স্বার্থ কেমন অন্ত তে। নিঃসন্দেহ হবার উপায় নেই। তা কি ননীর মতো নরম? তা কি মনির মতো সম্ভব? তা কি ফুলের মতো মুলার্জাম? তবের মতো তাঁরা?

বলেনো বছর একসঙ্গে কাটল, তবু স্পর্শের পরিচয় নেওয়া হলো না।

ছেলের। আরো বলল, "তোন্ন বাবার? গায়ের রঙ, হলো চাপা ফুলের মতো। ঠিক যেন চাপা ফুল ফুটে রয়েছে।"

জীবনবারু আরো বিস্মিত হলেন। নির্দেশ তে বীরতিমতে কালো। উচ্ছল মানবের নয়। তবে এত দিন তিনি তাঁর বীর গায়ের রঙটাও লক্ষ করেননি।

থেকে বললে যে চাপাফুলের মতো, এ কি মিথ্যা! মিথ্যা নয় যদি অপরা হবে থাকে। বলেনো বছর একসঙ্গে বাস করেও তিনি চাপাফুলের মতো। রঙ, চোখে দেখতে পেলেন না।

নির্দেশ ফোটা ছিল না। পরপুরের ক্যামেরার অমূল্য ঘোষায়। থোলা। উচ্চত নয় বলে জীবনবারু বার ফোটার প্রতিপাদ ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ছেলের। স্থধার, "বাবা, মা'র ফোটা আছে?" তিনি বললেন, "না, নেই।" ওরা চোখ হয়। তিনিও অচিরে করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল নির্দেশ ফোটা তোলা।বেন। ছোট বাবাকে দিয়ে, কিন্তু নানা কারণে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। নির্দেশ যে এত দীর্ঘায় চলে যাবে এই বা তা ভেবেছিল। মাত্র তিন দিনের অর্থে বলেনো বছরের ফুলবৃষ্টি এ ফুল ছোট এ কুঁলে গেল। কেউ ধরে রাখতে পারলে না।

জীবনবারু মা প্রতিবেশিনীদের সামনে। বাবুজের উত্তরে বললেন, "বো ছিল রঙে লম্ব্যু গুলে সরসতা।" মা কি তা হলে মিথ্যা বলতেন। মিথ্যা নয় যদি অপরা হয়ে থাকে। জীবনবারু স্নেহশিক্ষা নির্দেশোধ্যা নয়,
ফোটোগ্রাফও নেই, তাই তিনি নির্ভর করলেন তাঁর মায়ের জীবনক্ষীর উপর। ভাবলেন তাঁর স্ত্রীর রূপ ছিল লঘুজর মতো। এতদিন যে লক্ষ করেননি এ তাঁর নিজের অন্যমনস্কতা। দেখেছেন কখন! দিনরাত তো কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। রাতে যখন তুই দান তখন যুম চোখ রুজ আসে। ভালো করে দেখাই হলো না এ জন্য।

জীবনবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁর স্ত্রীকে তিনি যেমন চিনতেন আর কেউ তোমরা নয়। বোলো বছর ধরে চেনা। পরিচয়ের বাকী ছিল না কিছু। বোলো বছর মানে একশো নিরন্তরই মাস, ছয় হাজার দিন। একটি মাসের কিন্তু চিনতে ছয় হাজার দিন কি যথেষ্ট নয়! দিনের সংখ্যা মোটো করতে হয় রাত। একই বিচারনীয় ছয় হাজার রাত কাটানোর পর পরিচয়ের কিছু বাকী থাকে কি? শুভ্রী সচিব সম্ভব শিয়া—না, কোনো পরিচয় গোপন নেই। তবে ললিতকলাবিধি তিনি নিজেই জানেন না, দেখাতে কী করবে?

আর কাছে কাছে শিইতে চাইলে তিনি রাগ করতেন। পরপর বছরের সংখ্যা সংস্কার তাঁর দুঃখচক্রের বিশ। নিকুষ যে বই পড়ে আপনি শিষ্ট তাও তিনি সহজে পারতেন না। লোকে নিশ্চিৎ করবে যে! তারালোকের পরিবার বাল্যজ্ঞানের মতো। গানবাজনা নিয়ে পড়ে থাকবে। অন্তত আসবে চাচ্চার দল। পাড়াল্লু ছিল ছিল করবে।

জীবনবাবুর নিজের আচরণে বিশেষ কোনো দোষ খুঁজে পেলেন না। বোলোতাত বছর যে বেন বোলোতাত মিনিত। এক অপরিচিতা নারী তাঁর সহে মেলানিয়ে বেধে পুতুল নিয়ে খেলা করে গেলেন, চলে গেলেন তাকে ও পুতুল কুটিকে ফেলে। বিয়ের আগে যেমন অপরিচিতা মৃত্যুর পরেও তোমরা অপরিচিত। মাঝারের পরিচয়পত্র দেখতে বোলো। বছরের মতো। দেখায়, আসলে কি বোলো। বছর! জীবনবাবু দাশরানী নন, তবু তাঁর মনে হলো কাল আগেকিন।

নিম্ন যে চিরকালের মতো চলে গেছে, আর কিছু আলেন না, যেমন বাড়ি তাঁর বাগের বাড়ি নয়, একথা ভাবতেই তাঁর বুক ঠেলে কাড়া উঠছিল। কিন্তু লোকটা রাশভাবী। তিনি তাঁর কর্ফ্যু করে গেলেন বড়ির কাটার মতো সাক্ষাতীত।
সকলে অশ্রু করেছিল জীবনবারু আবার বিয়ে করেন। তার বয়স
প্রত্যে কিছু বেশী নয়। চরিত্র একচরিত্র। বাড়িতে অর্কণশীরা কন্যা। তার
বয়স বারো। তাকে যত দিন না পার্থক্য করা হয়েছে তত দিন তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর একটি মা চাই। মার অভাব ঠাকুরমা দিয়ে
মেটে না। জীবনবারুর মা তাকে একবকা বোঝালেন। কিন্তু তিনি উচ্চ,
পথে চললেন! রাতারাতি পাত্র ঠিক করে বড় মেয়ের বিয়ে দিলেন। ছোট
মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন তার মায়ের বাড়ি থেকে পড়াশুনা করতে। কেবল
ছেলে ছুটিয়ে কাছে রাখলেন।

“আমার এখন একমাত্র ভাবনা,” জীবনবারু ব্যক্ত করলেন অন্তর্জনদের
কাছে, “নিঃসের ফিরে পাবার কোনো উপায় আছে কি না। বিয়ে করলে
আর একজনকে পেতে পারি, কিন্তু নিঃসের তেও ফিরে পাব না।”

কথাটা সত্য। কিন্তু অভাবিক নয়। বন্ধুরা তার উপর কড়া নজর
রাখলেন পাছে মজ্জনবিক্ষিপ্ত ঘটে। তেমন কোনো লক্ষ্যে দেখা গেল না।
তবে হঠাৎ তিনি স্বীকারী হয়ে উঠলেন। বাড়িতে জলসার অভাবের
করলেন। জলসার বসে তিনি চোখ বুজে ধ্যান করলেন নিঃসের। কন্যা
cরলেন নিরু ফিরে এসেছে সপ্তাহের আংশিক। অনুভব করলেন নিরুর
আরুণ উপস্থিত।

আমাকেও ভেবেছিলেন জলসার। কাছে বসিয়ে বললেন, “তোমার
নয়নদিকে ধ্যান করো।” জলসার পরে জিজ্ঞাসা করলেন, “কিছু অনুভব
করলে কি?” আমি ভেবে পেলুম, না কী উত্তর দেব। তিনি আমাকে বিশ্বাস
করে খুলে বললেন, “ওকে মর্যাদা বলে গানের ফাড় পেতেছি।” তার পরে
প্রত্যেকের সঙ্গে বললেন, “আমি এ রহস্য ভেঙে করব। মানবী না। অন্যরা?
যদি অন্ধকণ হয়ে থাকে তবে ধরা না দিয়ে পারবে না।”

প্রতি সপ্তাহে জলসার বসে। সেই স্থানে আমার সঙ্গে তার ধনিণ্ডা জন্য।
বয়সের ব্যবধান বিশ বছর। কিন্তু দু'জনের একই ধ্যান। তিনি বলতেন
tিনি অবস্থিতি অনুভব করছেন। আমি বলতুম আমি করছিনু।
tিনি তার শুনে ছুটিয়ে গেলেন। যাতে তার মনে আঘাত না। লাগে সেই স্থানে
আমি যুক্তিরের মতো সত্য মিথ্যা মিলিয়ে বলতুম, হা, না, ঠিক বুঝতে
পারছিনু, একটা কিছু অনুভব করছি। না, অশ্রু করছি।
ক্রমে তার সাহায্যার্থ শিখি হয়ে এলো। জলসাও বিরল হয়ে এলো। তিনি আলোকে পড়লেন স্পষ্টচিত্র লিখেন দিলে। সে ভিত্তিতে আসার বিবাহ ছিল না। তাদের বিবাহ ছিল তোমরা করেছিলেন বিপ্লবী ও পুরুষহার মিলে দেখায় ধরনের একটা ক্লাব করলেন। ক্লাবের বৈধতা আসার মতো সংশয়ীদের ভাস পড়ত না। আসার এক সহপাতীর মাত্র বিবাহ হয়েছিল। সে ঐ বৈধতা পোহ দিয়ে বৈধতার বিষয় তার মুখে শোনা। হ' একজন মহিলাও বৈধতা নাত। তাদের একজনের মুখার্তিত ছিল মিদিয়াম হিসাবে। টেবিল ছয়ে তেম স্বর্গ করতেন নির্ধরে। কাউন্সেল পরে টেবিলে নড়ে উঠত। টেবিলের পায়েরো ঠক ঠক করে কাপত। নির্দেশ এবং টেবিলের এক ধারে আসা নিতেন একবারে চেষ্টায়। কেউ দেখতে পেত না, কিন্তু সকলে টের পেত। জীবনবারু দুর্দন্ত করতেন, নিরদেশ জরায় দিতেন, আর মিদিয়াম লিখে নিতেন মনোক্ষণচালনার মতো অনুযায়ী অলিখে। সে সব লেখা জীবনবারু যথাসাধ্য করে তুলে রাখতেন।

কয়েক মাস এই করার কাছে। ক্রমে তার উৎসাহ করে এলো। একজন অধ্যাপক তার মাধ্যম চুকিয়ে দিয়েন যে মিদিয়ামের লেখা মহিলাটির নিজের অবচেতন মন থেকে আস। নিক্ক অশ্রুরী মন থেকে নয়। আমরা যে হলে কত কথা অনেকের কাছে শুন। নিজেদেরই অবচেতন মনের কাছে। মহিলাটি নিজের স্বল্পচিত্র করে। তবে তার অবচেতন মনের উপর জীবনবারু অবচেতন মনও ক্রয় করতে। সেই অনেকের কথা কথা জীবনবারুকে এত শীর্ষ দিচ্ছে। জীবনবারুর অবচেতন মনের উপর ক্রয় করতে নির্দেশ সংক্ষেপ বলো বছরের অভিজ্ঞতা। সেইজন্য নির্দেশ ছায়া পড়তে সমস্তার উপর। অধ্যাপকের ব্যাখ্যা। সে জীবনবারু ধাবণ গেলেন। না পারলেন খুবক করতে, না পারলেন এভিন্ডে দিতে। কিন্তু তার উৎসাহ করে গেল।

এর পরে তিনি অনেক অস্ত পাঠ করলেন। দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম। কিন্তু তাতে শান্তি পেলেন না। যে মাঝাগো বছর কাল সত্য ছিল সেই মাঝাগো এক দিনেই মিদিয়া। হয়ে গেল এ কি কখনো হতে পারে। আর সে সত্য তার থাকবে তবে তার উপস্থিতি অদৃশ্য করা যাবে না কেন? সাধকের ভগবানের উপস্থিতি অদৃশ্য করেন। ভগবান নিরন্তর। নিকুন্ন নিরন্তর। জীবনবারু তা হলে নির্দেশ উপস্থিতি অদৃশ্য করেন না কেন?
বিষ্ণু কোনো এইচই তাকে আধাতে দিও না যে ইহকালীন মৃত পত্রীর পরম পাগল্যা যায়। আর এ তো কেবল পত্রী নয়, এ অঙ্গরা। অঙ্গরা মর্ডে অবতীর্ণ হয় মহাভারতে তার বহ উদাহরণ আছে।

জীবনবাধু হাঁতের কাছে শাক্ত না পেয়ে তীর্থায়াত করলেন। তার মাত্ তাকে বিশেষ করে ধরে বলেছিলেন তীর্থে নিয়ে যেতে। মাত্র নিয়ে তালি হরিশ্চন্দ্র গেলেন। সেখান থেকে স্বর্ণের লক্ষ লছেনকোলা। লছেনকোলা। তার এর ভালো লাগে যে ফিরে ছিচা করল না। ধরের পর দিন গঠিয়ে তার আন করে বনে-আলেলে ঘুরে সাধু-সংগ করে তিনি কী যে আনন্দ পেলেন তা বর্ণনার অভাব। ধীরে ধীরে তার জীবনে শান্তি করল। তিনি গভীর ভাবে উপন্যস্ত করলেন যে নিজের আছে, কিন্তু তাকে পেতে হল তার গতিপথ থেকে তাকে অজ করা চলবে না, নিজের গতিপথে তাকে আকর্ষণ করা চলবে না। তাকে পেতে হল তার গতিপথেই তাকে অন্তর্মণ করতে হবে। অতচ আপন, গতিপথে অবিচলিত থাকতে হবে। কুস্তাধর পাহা। পদলত্তা হলেই নিকেটে হারাবেন চিবকালের অজ। নয়নটা পাবেন চিবকালের মতো।

বিলেত থেকে ফিরে তাকে সঙ্গে দেখা করার অভিগ্রাম ছিল, সেখান করে বলতুম জাহাজের কাহিনী, বা দিয়ে আরতি করেছি এই গলায়। কিন্তু হয়েগ পাইনি।

বছর কয়েক পরে আমার মহকুমায় সংবা করে বেড়াচ্ছি, অতিথি হয়েছি এক জমিদারের গোষ্ঠ হাউসে। চুপচাপ বসে বন্ধরের কাগজ পড়ছি, এমন সময় জীবনবাহুর আবর্ধ। আনন্দুম না যে তিনি তার বড় মেয়ের বিয়ে বিয়েছিলেন যার সঙ্গে তার বাপের জমিদারি এই গ্রামে। বাপ মারা গেছেন, কাকা। জমিদারি চলাচলে। আমি তাদেরই অতিথি। কাকাদের সঙ্গে মনন্ত্র হয়েছে। তিনি এসেছেন ভিটাম করতে। নিকুলের মেয়ে চিন্তা আমার জন্যে নিজের হাতে রাখছে। কিন্তু কান্তামের ইচ্ছা নয় যে আমার সামনে রেখায়। তাই আমার জন্যে বাবুচি ডাকা হয়েছে। আমি সাহেবলোক কিনো, সেইজনে। সাহেবীর বন্ধুবান্ধ।

আমি তখনি বাবুচি তলব করে সমষ্টি দিয়ে দিলুয়ে যে সাহেবী খানা। আমি সাহেব লোকের অতিথি হলে খাই, বাবুচিতের অতিথি হলে খাইনে,
আর জীবনবারু বললুম, "হোয়াট নানন্দ ম্যাট্রোকো আমি আর কারো হাতে খেলে পারি!"

তার পরে জীবনবারুর জীবনকথা আলোচনা হলো। বড় ছেলে বাপের মতো হয়েছে, কালোটা খালি থেকেছে। ছোট ছেলে হয়েছে মায়ের মতো, অর্থাৎ আমার মতো। উচ্ছাসিত বিলেত যেতে, এদিকে সেকেও কালো অনায়া। আর ছোট মেয়ে ঠিক মা'র মতো ঢেকেছে। জীবনবারু তার বিয়ে দেবেন না স্বয়ং করেছেন। তবে সে যদি বেঁচে যেয়ে বিয়ে করে তার আপত্তি নেই। বিয়ে করলে তার গানের ক্ষুভো হবে। নিকটের গানের ক্ষুভো করে তিনি পরেছেন। খুব ক্ষুভো করলে বেঁচে স্বত্ব থাকবে না। বলতে গেলে বেঁচে আছেন তিনি খুব স্বত্ব। নিকটে যা হতে পারতেন, তিনি হতে পারলেন না তার দেখে, খুব তাই হবে। তা হলেই তার দোষের স্বত্ব হবে।

"নিকটে তুমি কী বেঁচেছিলে মনে আছে? মানবী না অপরামূলে?" জীবনবারু আমাকে অনুভূতি করিয়ে দিলেন। "তেমনি খুব খুব দেখলে আমার সন্তেহ হয়, মানবী না অপরামূলে।"

"ও যদি অপরামূলে হয়ে থাকে," জীবনবারু বলে চললেন, "তবে ওর বিয়ে না করাই ভালো। দেখছ তো আমাদের সমাজের চেহারায়। এখানে বামেই চাই ঘরী। কেউ চাই না অপরামূলে। দেখছ তো দেশের তরঙ্গদেশ। এদের মানবী যদিও ফিরে স্টার তুমি বিনা পরে বিয়ে করেতে রাজি নয়। বিয়ে করলে সেই লাশের বাহনকে, বিয়ের পর তাকে দিয়ে সংসারের ভার বহন করবে।"

এর পরে তিনি তাঁর বড় মেয়ের হাতের কাহিনী শোনালেন। হাজারে ন'শো নিরানন্দই জন বিবাহিতার কাহিনী। তুমি তো এর অসম্ভ্য ভালো। তা হলেও বলা যায় না যৌথ কুপা শেষ পর্যন্ত কত দূর গড়াবে। হাজারিন না অপরামূলে। কুপা'র যদি আর একটু কম কুপা করতেন।

আমি বললুম, "জীবনবারু, ছেলেমেয়ের কথা তো মন্ত্র হলো। এবার নিজের কথা হোক, যদি আপত্তি না থাকে।"

জীবনবারু বললেন এই প্রথমের অবস্থায় ছিলেন। বললেন, "আমার নিজের কথা তুমি জানো।" একথা একজন করে এনেছিলেন আমার ঘরে, ধরে নিয়েছিলেন যে সে আমার বিয়ে করা নে, আমার ছেলেমেয়ের মা, আমার সঙ্গে সব রকমে বাধা। তবে বেঁচেছিল যে এর কাটান আছে। পাথি যখন
উড়ে গেল তখনো আমার কান হলো না, গানের ফাঁদ পেলে বললুম তাকে ধরতে। তা সে ধরা দেবে কোন ছঁদে।”

ললতে বলতে তাঁর গলা ধরে এলো। “আমার ওই পুতুল খেলার সংগায়। হাতকর ব্যাপার। ওখানে ধরা দিতে চাইবে কোন অপর।! তাও যদি খেলা করতে জানতুম। সারাক্ষণ বেত উঁচিয়ে বলে আছি ব্যবসায়ীর মতো। কোন কথায় হুমকি। কথায় কথায় জলুম। পাছে কেউ বলে আমি আমি তৈরিতে একটু বেশী করে প্রস্তুত ফলাই। ওর আলোবিকাশের পথ বলে করে দিই। আমার মতো অত্যাচারী—”

আমি বাধ্য দিয়ে বললুম, “না, না, আপনি অকারণে আমারই বলে। নির্দেশে আপনি যথার্থ ভালোবাসব্দে। ওর সঙ্গে পরামর্শ না করে আপনি কোনো কাজ করতেন না। আপনি দেখে একটু একটু উঠে যেতেন গীত সঙ্গে হাঁটা কথা বলে আসতে। লোকে যে আপনাকে তৈরিতে বলত সেটা নেহাত অসুস্ক্র নয়। জীবনে, যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনার দোষ, আমার মতো—”

তিনি উঁক্ষে হয়ে আমাকে অনুমতি দিলেন, “বলে যাও।”

“পরপুরুষভাতি। নির্দেশের মৃত্যুর পরেও আপনার সে ভাবি গেল না, তুমি ছেলে প্রভাবদম্যের বীঠেকে নির্দেশের আমাকে আপনি জেরা করতেন পরলোকের পরপুরুষের সঙ্গে। জীবনে মরণে আপনিই একমাত্র পুরুষ যার সঙ্গে তাঁর সহকার পরকাল বাধা। বিশেষ কোথাও আর কোনো পুরুষ নেই যার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির রহিততা, কেলের স্বাধীনতা। জীবনে, আর কেন। বলে বে কি যেতেই নয়। মনে করত তাঁর সঙ্গে আপনার ভালো হয়ে গেছে।”

জীবনবায়ু লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর মৃত্যুর আত্মকে বিভাজ ও বিকৃত। উঁচুতে উঁচুতে কি সব বলে গেলেন বোঝা গেল না। আমিও অপ্রতিক্ষ হলুম তাঁর মনে অপার দিয়েছি সেখে। বার বার মাফ চাইলুম।

তিনি আর বললেন না। যাবার সময় বললেন, “আমি যে বেঁচে আছি সে অশু ওর দিকে মুখ রেখে। তুমি ফি আমাকে মরতে বলে।”

(১৯৪৯)
স্বরস্বালা

১

জন্মের শেষ হলে মহিলারা উঠে গেলেন বসবার ধরে। আমার জীবন চলে যাচ্ছেন দেখে অন্তমন্ত্রে আমি তাঁর প্রাক্তন অনুচ্ছেদ করছি, এমন সময় গিনের কথা আমার কোট ধরে টানলেন গুহকন্তা। ব্যারিস্টার মৌলিক।

কানে কানে বললেন, “কথা আছে।”

আমি ধরলে ধাড়ালুম। “কী কথা!”

তিনি মুখ টিপে মূচকি হাসলেন। কথাটা আর কিছু নয়, এটিকেটের তুল।

বলতে হলো। না দে মহিলারা কিছুক্ষণ নিরালায় ধাবকেন, সে সময় পুরুষদের যাওয়া বারণ।

ভার হাসি থেকে অহ্যায় করলুম কী কথা। চোরের মতো চুপি চুপি ফিরে এলুম খানা কামরান্দ।

একটা কাড়া কেটে গেল।

ইতিমধ্যে জনা চারটে অভ্যাগত মিলে জড়িল। শুরু করে দিয়েছিলেন।

হাতে গান পাতল, মুখে চুকুট।

আমার তা ওষুধ চলে না, আমি এক পেয়ালা।

কফি হাতে ওদের সঙ্গে বিড়া গেলুম। বিড়া সেখেলেই বিড়া বাড়ি।

বে যার চেয়ার টেনে নিয়ে ঘরে বসল চার ইয়ারকে।

কেউ কেউ টেবিলে ঠেলে নিয়ে ধাড়াল।

ঝোলসের মধুমোহন দে বললছিলেন একজনীয়ার প্রদর্শককুল্যার লেখনকে,

“তুমি আসাম থেকে আসছ। তুমিই বলতে পারবে আসলে কী হয়েছিল।

আমরা তো নানা মুনির নানা বয়ন শুনছি। কেউ বলে শিকার করতে

গিয়ে দৈব দুর্ঘটনা।

কেউ বলে স্কেপ আবারহত্যা।”

প্রদর্শক মাথা নাড়লেন। “না, ফ্যাকসিডেট নয়।”

সকলে বুখতে পারল বিকলে কী।

তবু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করল বীরেরের

ঘোষাল, ব্যারিস্টার। “তা হলে কী?”

“হুইসাইড।”

“হুইসাইড!” ঘোষাল উত্তেজিত হয়ে বলল, “আমি বিশ্বাস করিনে।

যখন মূখীর এসে হলক করে বললেও আমি বিশ্বাস করব না যে বিখ্যাত অস্তিত্ব করছে।

বিলেতে ধাকতে আমার রক্ত করেছিল কে? কাকে

আমি বিশ্বাসের মতো জন্ম করতুম? জিজ্ঞেসিয়, চরিত্রবান, সত্যনিষ্ঠা—”
আমি বুলে পেচিউল ধার কথা ছিল। তিনি আমার কলেজের বিখ্যাত খেলোয়াড় বিখ্যাত সিংহরায়। বাংলাদেশ রাজপুত। ছুঁড়ল লাহোরর। মৃত্যুচোরা এককুতি। খুব কম চেলের সঙ্গেই মেশেন, যাদের সঙ্গে মেশেন তারা বলে মনটা শান্ত। যাদের সঙ্গে মেশেন না তারা বলে মাথা গরম। আমি ছিলুম বহুস অনেক ছোট, দুঃ থেকে খেঁখলেম আর অন্ধ্যাম করতুম।

"কিছু কথাটা কি সত্য?" আমি চেঁচিয়ে বললুম ঘোষালকে বাণ্ড দিয়ে।

"চুপ। চুপ।" গৃহীতরা আমার পিঠে টোকা মেরে সাবধান করে দিলেন যে ও ঘর মহিলারা রয়েছেন।

ঘোষাল তখনো গাঁথ্যভ করছিল। "কিন্তু কেন? কোন ঘটনে আগামহেত্যা করবেন বিখ্যাতির মতো লোক। একটা নই মেয়েমাঝের জন্য?”

প্রদোষ মশুম করে জলে উঠলেন, "নই মেয়েমাঝের কাছে বলছ?"

"তুমি জানো কাছে বলছি। শী ইজ এ বিচ্ছি।"

"চুপ চুপ।" বলে মৌলিক তার মুখ চেপে ধরলেন।

প্রদোষ বললেন, "যে বিচ্ছি নয় তাকে বিচ্ছি বলে ভুল করেছিল বিখ্যাতি।

সেই জন্যে এ টার্জেডিত। কিন্তু আগে দরজাগুলো ভেজিয়ে দেওয়া হোক। এসব কথা মেয়েদের অনেক নয়।” এই বলে প্রদোষ আরেকটা নিগার ধরলেন।

আমরা যে ঘর চেয়ারে থেকে দাফ দিয়ে উঠে দরজাগুলো ভেজিয়ে দিয়ে এলুম। কে জানে, মেয়েরা যদি আসতে পায় তা হলেই হয়েছে। গৃহীতরা সবাইকে দিয়ে গেলেন যারা যা অভিনন্দন। আমি নিলুম আর এক পেরালা করি। প্রদোষ বলে আর্জু করলেন।

২

ঘোষালকে পাপের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ছিল বিখ্যাতি, কিন্তু বিখ্যাতির অস্কার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ছিল না তেমন কেউ।

বিখ্যাতি হচ্ছে সেই জাতের মাহুষ যারা রামচন্দ্র সাতটা রঙ দেখতে পায় না, যাদের চোখে খুঁটমাট রঙ। শালা আর কালো। মেয়েদের সে চুঁ।ভাগে বিভক্ত করেছিল। ভালো আর মন।

জানেন তো মেয়েরা কত বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি। কেনা চুঁন্ন মেয়ের প্রকৃতি এক নয়। এমন কি কেনা একাক্ষ মেয়ের প্রকৃতি সব সময় এক রকম নয়। সকালে বিকেলে শান্তির রঙ বদলায় কেন জানেন? মনের রঙ বদলায়। এই
আপনি প্রাণের বীচে হলে নাত নাতটা রঞ্জের জলে চোখ খাকে। চাই। যান। রং কান তাদের উচিত নয় বেশী বয়স পর্যাপ্ত অবিভাজিত থাকা। বিষ্ণুকের বাপ তার বিয়ে না দিয়ে তাকে বিয়ে পাঠিয়েছিলেন এই ভরসায় যে বিষ্ণুকের নীতিবাদ নিরভর বোধ। তিনি জানতেন না যে এই ধরনের পুত্রার মরে সকলের আগে। মেয়েদের ওরা চিনতে পারে না। তুল করে। মূলের মাঝে মুক্ত।

বিষ্ণুকের ধারণা ছিল সেই মেয়েরাই ভালো যারা পুত্রদের সঙ্গে মেশে না। যারা পুত্রদের সঙ্গে মেশে তারা খারাপ। যারা যত বেশী মেশে ভালো তত বেশী খারাপ। ওদের বাড়িতে ওরা কেনা পর্দা মানত। বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে ওরা ছিল পুরোনুর্ধ্ব রক্ষণশীল। অথচ বাড়ির নাচ না হলে ওদের বাড়ির কোনো উৎসর পূর্ণিম হতে না। শাদা আর কালো, ভালো আর মৃদু, এর বাইরে যে আর কোনো রং বা রীতি ধারকে পারে বিষ্ণুকের সে শিখা। হয়মী দেখে ধারকে। বিদেশে গিয়ে হতে পারত কিন্তু ঐ যে বলন্ত তেমন কেউ ছিল না যে শেখাবে।

বিষ্ণুকের পাঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল তা ঠিক। তিন বছর বিয়েতে কোনো সে মেয়েদের সঙ্গে খেল। করেনি, নাচেনি, অন্যুক্ত পুত্রবৃন্দের অসাক্ষরতা কথা বলেনি। মেয়েরা পর্দা মানে না বলে ও নিজে একপ্রকার পর্দা মানত। মেয়েদের সামনে তারা একটি বেরোতে না, টেলিগ্রাম বাসে টিউব টেলিগ্রাম না গুলে বসত না। পাণ্ডুর। ওর অন কয়েক শুধু ছিল। যেমন ঘোষাল। তাদের কাছে সেই সকল বাড়ির দেখলে ও তাকে বয়কট করত। শেষ পর্যন্ত ওর ঐ একমাত্র ভক্তই অবশিষ্ট ছিল। এবং মোটাও একটি ভক্ত। মাফ করেনি, ঘোষাল। নয়তো হাতে ইচ্ছে ভাব।

দেশে ফিরে বিষ্ণুকে বিয়ে করলে পারত, কিন্তু ওর এক ধুরগুলো পণ ছিল। যত দিন না নিজের পরমায়ত মোটর কিনেছে তত দিন ও নিজেকে ওর কল্যাণ সকলের সমক্ষে মনে করতে না। সমক্ষে না হলে পারিগ্রহণ করবে না। ও ফরেস্ট সাবিটে বাণী দিয়ে আসামে চাকরি কিনে। চাকরির গোদার দিকে যে মাইনে দেয় তাতে মোটর কেনার চেষ্টা ওঠে না। বিয়ের প্রস্তাব এলে মোটরের অভাব বলে ও নে প্রস্তাব বাণিজ্য করে দেয়। অবশ্য যারা মেয়ে দিতে চায় তারা। মোটর দিতেও বাজে। কিন্তু তা হলে সমক্ষক্ষের গোরব ধাকে না।
শিকারের শখ ও ছেলেবেলা থেকে ছিল। ফরেস্ট অফিসার হয়ে শুরু
হয়ে উঠল ও একমাত্র শখ। বনজমল পরিদর্শন করতে গিয়ে ও শিকার
করে বেড়াত মাসের মধ্যে গেনেরা বিশ দিন। যত রকম বুনো জানায়ার
ও ঘর পরে পড়ত তাদের সহজে নিষ্ঠার ছিল না। নিজেও বিপদে পড়ত
কোনো কোনো বার। ওকে দেখলে মনে হতো না যে ও ঠিক সামাজিক
মানস। অথচ লোক অতি অমানস। শরু বলতে কেউ ছিল না ওর।
কাউকে মাংস, কাউকে চামড়া, কাউকে শিং উপহার দিয়ে ও সবাইকে খুশি
রেখেছিল।

এমন সময় ওখানে শিকারের যৌবনে এলেন হাইজেবাবাদের এক সামাজিক
রাজা ও তাঁর রানী। এরা কিছুদিন থেকে শিংএ বাস করছিলেন।
ইউরোপে এরা পড়ালো করেছেন, ইউরোপের প্রাকৃতিক দৃশ্য এদের ভালো
লাগে, সেদিক থেকে শিং ভারতে অতিশয়। শিকার উপলক্ষে এরা মাঝে
মাঝে বন অঞ্চল ঘুরেন, ফরেস্ট বাংলায় ওঠেন। ফরেস্ট অফিসারদের
সাহায্য নেন। অফিসাররাও এদের সাহায্য পেয়ে কুতুর্ক বাং করেন।
হাইজেবাবাদের সামাজিক রাজাদের ধনের প্রসিদ্ধ আছে। অফিসারদের কৃত্তিতা
অনান্ত গিয়ে এরা গলা থেকে মণিমুকুর্ত হার খুলে দেন। যারা নেয় না
তারা যেন মুহূর্ত হয়ে যায়।

বিশ্বজিৎ নিল না, মৃত্যু হলে। রাজা রানী ছ’জনে তাকে সন্ত্রাস নিয়ন্ত্র
আনালেন, সে যেন শিংএ তাদের অতিথি হয়। বিশ্বজিৎ বারকরেক “না,
না, তা কি হয়” ইত্যাদি বলার পর কেমন করে একবার “আচ্ছা” বলে
ফেলল। লোকটা সত্যনিষ্ঠ। “আচ্ছা” যখন বলেছে তখন শিং তাকে
যেতেই হবে, ছুটিত তাকে নিছেই হবে, রাজা রাজার অতিথি তাকে হতেই
হবে, যদিও সে তাদের সমক্ষ নয়। ওদা তাকে ক্ষেপ নিয়ে গিয়ে হোমরাদের
চোমরাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, গবর্ণমেন্ট হাউসে নিয়ে গেলেন কল
করতে। ওদা ওর পরিচয় দিলেন এই বলে যে বাঙালীকের এত বড় শক্ত
আনাম প্রদেশে আর নেই। এর ফলে লাট সাহেবের প্রেরিতে সেক্টরারী
তাকে ধরে বসলেন তার জড়ে মনে শিকারের আঘাত করা হয়।

বিশ্বজিৎ যখন শিং থেকে ফিরল তখন তার অন্তরে ঝড়ের মাতন। এক
এক সময় তার মনে হচ্ছে কাজটা সে ভালো করল না। রাজ অতিথি হরার
মতো যোগ্যতা তার কই। তার পরে মনে হচ্ছে, যাই বলা এমন সৌভাগ্য।
আর কোনা করেন্ট অফিসারের হয়নি। লাট সাহেবের প্রাইমেট সেক্রেটারীকে গোটা হুই বাঘ মারিয়ে দিতে পারলে অর্থ লাট সাহেব এসে হাজির হবেন। তার পরে প্রশ্ন করে ঠেকায়।

প্রাইমেট সেক্রেটারী নিজে আসতে পারলেন না, এলেন তাঁর মেম্স-সাহেব। আর কে এলেন অনেকে? রানি সাহেব। এবার রাজা সাহেব অন্য কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। দুই ভন্ড মহিলার পার্শ্ববর্তী হলো বিশ্বজিৎ। তার মাথাটা একটু ঘুরে গেল। যদিও সে তাঁদের সমক্ষে নয় তবু সেই একমাত্র অফিসার ধাকে তাঁর। এই সময়ের উপর ধরেন বিচরণ করেছেন। বিদায়কালে দু'জনেই তাঁর আকাশ্মীর শ্রদ্ধা করলেন। রানি তে। লোজানুজি বলে বললেন, "আর কারো সঙ্গে শিকার করে আমি এখান আসছি পাইনি। যত দিন আসামে আছি ততদিন আর কারো সঙ্গে শিকার করব বলে মনে হয় না।"

এসব হলো সামাজিকতার কংস। কিন্তু বিশ্বজিৎ লোকটা অসামাজিক তথা সত্যিই। তাই যেকোনো অফিসকে বিঢ়া করল। ও বোধ হয় অশ্রু করেছিল এর পর লাট সাহেব আসেন অর্থনীতির মাধ্যমে। সে রকম কোনো খবর বিষত এলো না। কিন্তু দিন আসামে তখন সে একাই বেরিয়ে পড়ে। এক মাস তাত্ত্বিক হবে ননা। অর্থনীতি খল ঘুরে। তার পরে সদরে ফিরে এলাকায় হয়ে গেল যখন দেখল রানি তাঁর জন্য সারকার হাসে অপেক্ষা করছেন। এবারেও রাজা সময় পাননি। কোনো মহিলাও নেই তাঁর সঙ্গে, অন্ধকার পরিচারিকা বাকী।

এ এক পরীক্ষা। বিশ্বজিৎ প্রশ্নগুলো উত্তর দিলে গেল না। মাইনের টাকা তুলে, বিল মিটিয়ে, জমে ওঠা। কাইল পরিষ্কার করে দু'এক দিনের মধ্যেই আবার রওনা হলো রানির সঙ্গী হয়ে। খুব যে তাঁর ভালো লাগছিল তা নয়। একে রাখতে তাঁর উপর সম্ভিত। যে মেঝে পরপর সঙ্গে শিকারের বাই নে কি অন্তত চিন্তা হয়ে কি নিষ্পাদ এক ভীষণ পরীক্ষা। তাঁর জীবনে। এর পরে কে সহায়তা বিঢ়া করবে যে সে নিজে অপারেই। রানিকে "না" বলে মতো মনের চোখে তাঁর ছিল না। বলতে পারলে না। যে পরিবারের সঙ্গে শিকার করতে যাওয়া তাঁর বিচারবিচন্ড। কিংবা তাঁর চরীর ভালো সেই, কোমরে বাধা, ভাসারে বিশ্বাস নিতে বলেছে। অন্ধ সমস্ত কণ্ড অন্তত বোধ করল, অপরাধী বোধ করল।
রানি বিলেতে পড়াছিলেন। পুরুষমায়ের সঙ্গে মেলায়ের অভ্যন্তরে। বিখ্যাত বিলেতে ছিল তবে তিনি ওকে নিজের সেটের একজন বলেই ধরে নিয়েছিলেন। অন্তর্দেহর ছল। কখনো বললে দুঃখিত,”

কাদাটি ভাবলি।” এসব মুখের কথা, মনের কথা নয়। কীভাবে বিখ্যাতের
তো অভিজ্ঞতা নেই। সে ভাবল এসব মনের কথা। রানি কি তা হলে তার
প্রেমে পড়েছেন? এ কি কথন? সম্ভব? তার মতো সামাজিক লোকের
সঙ্গে প্রেম! ভাবনায় পড়ল বিখ্যাত। ওদিকে আবার প্রেম কথাটার
উপরে তার বিরুদ্ধ ছিল। জিনিসটা ভালো। নয়। যার সঙ্গে যার বিদে
হননি তার সঙ্গে প্রেম তো রীতিমতো পাপ। বিখ্যাতকে এই পাপের হাত
থেকে রক্ষা করবে কে?

একবার শিকার থেকে সে যখন ফিরল তখন তার অন্তরে সাগর মহানের
মতো একটা ব্যাপার চলছিল। সেও প্রেমে পড়ল নাকি! পরশুরানুর দলে
এর চেয়ে মরণ শ্রেয়। রানি চলে গেলেন সুহু সংখ্যক অন্তর্ধানোয়ার মেয়ে।
জনাতে গেলেন না যে আরো একটি প্রাণীকেও মেলে রেখে গেলেন। এ
রকম আলোড়ন না আর কখন। অজ্ঞত্ব করেনি। তার বিদ্ময় সনেহ
ছিল না যে মেয়েটা খারাপ। কিন্তু সে নিজে কোন ভালো। কী করে সে
তার ভাবে যুক্তকে বোঝাবে যে তার হবে লেশমাত্র অন্তর্গত জ্ঞাতনি!
নিজের উপর তার যে অভিচর্চা ছিল তা যে একটু নড়ল। তাকি
সত্যি সচিত্র, না। সেও ঘুরে ঘুরে জল থায়। তার কি উচিত ছিল না। রানি
সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেড়ে করা? কিন্তু সে তার পারল কই? রানি যখন জানতে
চাইলেন, “আবার করে শিল্প আসছেন বলে,” সে উত্তর দিল, “আপনাদের
অনুষ্ঠান হবে।” রানি সকোচুকে বললেন, “আমরা কি বাধানুভূত 
যে আপনার আলাদা আসাম চেরে পালাব?” ওহেল, ভিয়ার। ভু কাম খাট
ঝাঁক এটা।”

অগ্রণী এক দিনের অর্থ বিখ্যাতের শিল্প যাতা। এ দিনের জায়গায়
ইতিহাস দিন হলো, তবু কেউ তাকে ছেড়ে দেয় না। রাজা ভাবলেন টেনিস
খেলতে, রানি নিয়ে যান সমাজে পরিচালনা করতে। যে চেলে কোনো দিন
নিজেদের সঙ্গে মেশেনি সে রানির সঙ্গে পাশাপাশি আসান বলে। রানির মোটর
চালান। সে দেখে মাঝে মাঝে স্ট্রাইক ধরে। যে মাফয় কোনো দিন বড়
কর্তাদের খোজামোদ করেনি সে একদিন চুপুরে সেকেন্ডারিয়েট গিয়ে চুটির
যৌবনজ্ঞালা

অনন্দ করে আসে। দিন পনেরো দুটি না হলে নয়। সে মোটর চালাতে শিখছে। কথাটা সত্যি। যেমন সত্যি অখণ্ডমূর্তি হত ইত্যাদি গজ্জ। অথচ এটি বিষয়। এমন বিষয় যে বলতে গেলে সারা মুখ লাল হয়ে ওঠে।

বুক চিপ চিপ করে। চোখ আপনি নত হয়। ভয় হয়, ধরা পড়ে গেছে।

ঔদিক তার বিশেষ তাকে এক মুহুর্ত ছুটি দেয় না। পনেরো দিনের দুটি তো। দুরের কথা। যে মেয়ে পরমুক্তির সঙ্গে মোটর বিহার করে সে কি তালো মেয়ে? কিন্তু যে ছেলে পরম্পরের সঙ্গে মোটরে করে ঘুরে ঘুরে বেড়ার সেই বা কেমন ছেলে? একদিন তো সে বিয়ে করবে। সেদিন কি তার স্ত্রী তাকে বিখ্যাত করবেন? ভবিষ্যতের জন্য কী গতির অশান্তির খান কেটে রাখছে সে! সত্যি বিবাহিত জীবনেই খাদে পড়ে চরমার হবে, যদি সময় মতো বেক না কমে। পনেরো দিন ছুটি নিশেও প্রায়েক দিন সে উপায় যোগে পালাবার। কিন্তু পারে না পালাবে। বাইরে থেকে বাধা নেই, পাহাড়া নেই। বেল তাকে ধরে রাখে না। একবার মূখ ছুটি বললেই হলো, "আমার কাজ পড়ে আছে। আমাকে যেতে হবে, রানি।" কিন্তু শুকু বলার মতো ইচ্ছাশক্তি লোপ পেয়েছিল। কিছুদিনই সে মুখে অনতি পারে না ও কথা। বাজার বর্তক। তাবে মোটর চালানো তো শিখছে। এও কি কিংবা একটা কাজ নয়।

আসল কারণটা তার অবচেষ্টা মনে নিহিত ছিল। সেখানে তার ইচ্ছাশক্তি অবশ করে রেখেছিল মন্ত্রণকর। খারাপ মেয়ে, এই দুটি শব্দের যেন একটি মন্ত্রণকর ছিল। উচ্ছারণ করলেই মন্ত্রণকর কিয়া খুল হতো। মনে মনে উচ্ছারণ করলেও নিতার নেই। খারাপ মেয়ে, খারাপ মেয়ে, খারাপ মেয়ে জগ করতে করতে বিখ্যাতি তার নিজের অম্বুতসারে মন্ত্রনুমূহ তুঙ্গকের মতো পরবশ হয়েছিল। এর জন্য সাহী কে। সাহী তার ঐ লাগাতে চোখ।

যে চোখ রামধূরুল সাতটা রং দেখে না। রং বলতে বোঝে শাদা আর কালো। শাদা দেখেতে না গেলে কালো দেখতে।

সে সময় বিখ্যাতির যদি কোনো হৃদয় ধারত তা হলে তাকে তার নিজের তুলের হাত থেকে রেখে সাহায্য। নিজের তুলের হাত থেকে বাঁচলে গেলে সে নিজের গুলির হাত থেকেও বাঁচত। কিন্তু তেমন কোনো হৃদয় ছিল না তার। যা হলে বলতে, যাকে তুষ্মি খারাপ মেয়ে বাঁচে সে খারাপ নয়। জিতে তোমার আগ্রহপ্রকাশিত। খারাপ মেয়ে বেঁচে তুষ্মি ওর কাছে যা আশা।
করছ, কামনা করছ, কোনো দিন তা পূর্ণ হবে না। বিষজিৎ অবস্থ রাগ করত, অন্বীকার করত যে তার কোনো কামনা আছে। কিন্তু অন্বীকার করলে হবে কি! পুরুষমারেরই অবচেতন মনের খুজ যে সব অন্ত কামনা নিহিত রয়েছে খারাপ মেয়ের গল্প পেলেই তারা চরিতার্থতার অন্তে �ählen পায়। সে যদি খারাপ মেয়ে না হয়ে থাকে তবে নিজের গল্পে নিজেকেই পড়তে হয়। তখন মরণ অনিবার্য, যদি না কেউ সময়মতো উদ্বার করে।

শিল্প থেকে ফিরে বিষজিৎ সফরে বেরিয়ে পড়তে এমন সময় টেলিগ্রাম এলো রাইন আবার আসছেন। আঁধুনিক ও উদাস ছুই পর্দার বিরোধী ভাব তার বুক ভেঙে ভাবে বাধিয়ে দিল। একবার সে পালিয়ে গরু ভাবে, পালিয়ে দিয়ে জলকে লুকিয়ে থাকবে। একবার ভাবে, পালিয়ে বাড়ি তা কাপুষের কাজ, পুকুরের কাজ বিদের সম্ভাবনা হওয়া। এক বার মনে করে মিঠা বলাই এ ক্ষেত্রে সত্য বল। পালিত টেলিগ্রাম কর। উচিত, আমি অস্বীকার। একবার মনে করে, সাহস থাকে তো সত্য বলাই উচিত। তুমি খারাপ মেয়ে, আমি তোমার সঙ্গে শিকারে যাব না। আমার যে রাগ করবে, যখন বিদের পর অন্যে।

পালিত টেলিগ্রাম করা হলো না। পালিয়ে বাড়ি হলো না। স্টেশনে গিয়ে রানিকে অভ্যর্থন। করল অন্যায় অন্যায়ের সঙ্গে বিষজিৎ। এবারে সে ফিরে করেছিল শিকারে যাবার সময় আরো তু' একজন অন্যায়কেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। তারাও রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু যাত্রাবালে দেখা গেল কারো চেলের অস্থায়, কারো মেয়ের অস্থায়, কারো দীর্ঘজীবন অস্থায়। অংশাব কার্ত্তার চক্ষু নেই। কোনো মহিলা তার জরিও বিশালি করে পরতীর সঙ্গে শিকারে চেঁড়ে দেবেন না। অগত্যা বিষজিতের আর দোস পাড়া গেল না। হাতীর পিঠে বসতে হলো রানির সঙ্গে তাকেই। পাশাপাশি বলে অণ্ডের স্বর্ণ পায়। একবার স্বর্ণ নয়, পরশ। আমন অবস্থায় পড়লে মুনি ভবিষ্যদ্বাণী মন টেলি। বিশালিত্ব মুনি হলেও বিষিক্ষ মুনির চেয়ে জিতেছি হতেন না, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। বিষিক্ষ মুনি বহুকালে আমাসংবল্প করলেন। হাতীর পিঠে চেঁচে কথনো। চড়াই উত্তরাধিকার না, তখন পাশের লোকের পাশ বালিশ বলে ভুল কর। স্বাভাবিক। কথনো পড়ে যাবার ভয়ে, কথনো। আচার্যা ধাতা থেকে, কথনো। হাতীর অস্বভাবীর সঙ্গে পালিত রেখে হেলে।
হুলে কত্তবার যে মাঝায় মাছের গায়ে টেপে গড়ে তার হিসাব নেই। এর জন্য অবশ্য কেউ লজ্জিত হয় না। মাফ চাই না। এটা আত্মার্পণ।

ঝাল কামরা ও খানা। কামরার মাঝখানের দরজাগুলো চেছোরা ছিল বলে আমরা নিশ্চিত মনে গল্প শুনি নিলাম। হঠাৎ মণিরাহর বলে উঠলেন, "সর্বনাশ! কোথায় দরজাটা? কাঁটা দেখিছে যে!"

ঘোষাল পা টিপে টিপে গেল দরজার কাছে। ছুটে এলে বলল, "মেয়েদের বিষ্ণু নেই। বিষ্ণুদের তৈরি কর্তব্য।"

ঝড়মশুম কর্তবার সময় হাতেনাটে ধরা পড়লে যেমন চেরারা হয় আমাদের স্কন্ধের চেহারা হলো। সেই রকম। মুখে কথা নেই, চোখে পলক নেই, হাতের কাঁধ হাতে, কেবল চুক্তের বোয়া উঠছে চিমির ঘোষাল মতো অনুরূপ কভুড়। তা হলে অন্তরাল থেকে কোথা সমস্ত ঝুঁকেছে।

ভিজে ঘোষাল সেজে আমরা একে একে ঝাল কামরায় চললুম। আরে। আর একে দিয়েফি উচিত ছিল, দেরি হয়ে গেছে বলে কমা প্রার্থনা করলুম।

গল্পটির কথা হারিয়ে গেল বলে মনে মনে মুগলাল করলুম। কে একজন হেন উত্তল, সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল উঠল। হালকা হয়ে গেল ঘরের আবারো ফি।

"বাত্তিক, মেয়েদের না। শুনলে গল্প বলে আরাম নেই।" বানিয়ে বললেন প্রদৌল। "এরা কি গল্প শুনতে জানে, না ভালোবাসে। যে যার পানালার নিয়ে বায় নি। তুলন আপনারা, বাকীটিকে বলে শেষ কর। আমাকে আরেক আশ্বাস যেতে হবে।" গল্প আবার শুল হলে আমাদের মুখের হাসি মুখে মিলিয়ে গেল।

গল্পটি তো হাসির গল্প নয়। আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছিলাম ত্রীরতার বীজ বোনা হয়েছে, যা হবার তা হবেই। সেইজন্য আমাদের কারো মনে শখ ছিল না।

প্রদৌল বলতে লাগলেন—

এককণ আরো গল্প বলছিলুম বেপরোয়া। ভাবে। পুকুরের কাহিনী পুকুরালি ধরলেন। এখন আমাকে ভক্তির মুখোশ পরতে হবে। নয়নো মহিলারা মনে করবেন আমি ভালোর গায়ে পড়ে অপমান করি। না, না,
আপনারা মুখ ফুটে কিছু বললেন না, কিন্তু গলার মাঝখানে উঠে চলে যাবেন। যাক, উপর নেই। শেষ করতে তো হবে।

বেঁচারা বিপ্লবিত! অারহু, আমরা সকলে মিলে তার জন্যে চোখের অনেক ফেলি। আমাদের চোখের জলের বর্ফ পেলে তার আলা তৃপ্ত হবে। বেঁচারা বিপ্লবিত! তার সব ছিল, কিন্তু এমন একজন বদ্ধ ছিল না যে তাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে রক্ষা করতে পারত। আমি থাকলে বলতুম, আনন্দ নিয়ে খেলতে চাও খেল, কিন্তু আজনকে খারাপ বলে তুল কোরে না। যে মেয়ে খারাপ নয় তাকে খারাপ মেয়ে ভাবলে বিপদে পড়বে। এমন কি, যে মেয়ে সত্যি সত্যি খারাপ তাকেও খারাপ ভাবতে নেই। খারাপ ভাবলে খারাপ দিকে মন যাবে। কিছুতেই মনটাকে কেরাতে পারবে না। এমন কি, পাপিয়ে গিয়েও বাচবে। বাচতে যদি চাও তো জগ করা, ভালো মেয়ে, সহজ মেয়ে, ভালো ভালো। তা হলে মনস্থান্ত্র ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবে।

এ পথ বাচবার পথ।

ও যে অন্যসংবর্ধন করতে গিয়ে দাঁড় কট পাঁচছিল রানি তা জানতেন না, আমলে শিকারের শখ সংবর্ধন করে বিদায় নিতেন। তার ছিল শিকারের নেষ। মনের মতো শিকারী সাধী পেলে এ নেষা যেন নিটেই চায় না। তিনি বসলে বড়। তার এমন কৌশল অপূর্ব কামনা ছিল না যার জন্যে বিপ্লবিতকে তার প্রয়োজন। তিনি ভাবতেই পারেননি যে তার সঙ্গে মিলে দিলে একজন বিলকেশকে মনস্থ যুক্ত এত দূর বিভাষা হতে পারে। এ কথা তার মনে উঠল হয়নি যে তিনি খারাপ মেয়ে বললেই সহজে দৃষ্টিতে বিপ্লবিত খারাপ ভেঙে হয়ে উঠেছে। যা সম্ভব নয় তাকেই সম্ভব মনে করে না কট পাচ্ছে। তিনি বিশাল করতেন যে আগনি ভালো। ভালো জগ ভালো। তার সঙ্গে জগ কো ভালো হয়ে দিকে তার ভুক্তে ছিল না।

রানি তা জুটী ছিলেন তা বোধ হয় বলতে তুলে গেছে। দাঁকিয়াণের রূপের আস্থাও উত্তরাধিকারের সঙ্গে মেলে না। আমরা যদি সংক্রমিত হয়ে নিরূপে করি তা হলে দাঁকিয়াণের রূপ আমাদের মনে রেখেছিল হবে। অনেকদিন শুধু কার না মনে রেখেছ। দাঁকিয়াণে আমি মনে করে গেছি দক্ষিণের মূসের রূপ আমাকে মুখ করেছে। আপনি অনন্য উদয় করবেন না। বিখ্যাত করব তখন বাঙালী করব। আগত যে কমিন ধারীন আছি সে কাটো দিন তৈলদু লনাই। রূপ-গান করি। যেমন কালো।
যৌবনজ্ঞালা

তাদের রং তেলমি কালো। তাদের রংথ, তেলমি কালো তাদের চোখ, আর তেলমি কালো। তাদের কালো চোখের কালো। নানা রংয়ের কালো তাদের অকে, নানা রংয়ের শাড়ি তাদের অকে, নানা রংয়ের মণি মাণিক তাদের আকারে। কালোকে পরাঢ়ি করার আজ্ঞা আর সব কুটি রং বেন চক্ষুস্থ করেছে। তাদের দেখে মনে হয় তারা রঙ্গিণী। চিকেন কালো বলে কুকুর যে বর্ধন। আছে তাদেরও সেই বর্ধন। কুকুর মেটাই আশ্চর্য তাদের আকর্ষণ। আমাদের রানি মহাভারতের কুকুর মেটা রঙ্গি। করেক্ট বিশেষণ এলোকেলা তারে আমার মনে আসছে। উদ্ভিজ, মদির, মাসামর, ফাঁজায়, বিলোল।

পাক, আর না। রানি যদি দেখতে গারাপ হতেন বিশ্বজিৎ অতীত। উদ্ভিজ হতো না। গারাপ যদি দেখতে শুশ্রুষ হয়, হুমকি যদি যাতে বায় গারাপ হয়, তা হল তারে সে সমকালে যা দুর্দশ ঘোড়ার মেটা দুর্দশ। বিখ্যাত ঘোড়ায়ার বিশ্বজিৎ কুটি দুর্দশ অপে টানে উদ্ভিজ হয়েছে। সে সব ছিল ফাঁজ হয়। আর এ হলো, মহিলা মাফ করবেন, আমার বিচারে নয়, বিশ্বজিৎের বিচারে ফাঁজ উদ্ভিজ। এর যে টান তা প্রচলনর।

ফরেস্ত বাঙলোর ছাগপের ছাগপের ঘর। মাসামরে গায়ার ঘর ছাগপের এজালি। ঘাওয়াদাওয়ার গোছে তারি বারান্দায় ইচ্ছা চেয়ের পেছে গল করত। তাঁর সেই খুব ঘরে দুই মেয়ে যেত। গল করতে করতে বেশ একটি রাত হয়ে যেত। রানি বলতেন, "ওয়েল, স্নিঝার, আমি আর ভেঙে থাকতে পারছিনে। কাল খুব তোমার উঠে হবে, মনে থাকে যেন।" বিখ্যাত বলত, "বেহারাকে বলা যাচ্ছে, রাত থাকতে ভালবাসি।" তখন রানি বলতেন, "স্বনিজাদের হোক, স্বন পথ দেখ।" বিখ্যাত বলত, "তুমিও।" রানি হেসে বলতেন, "আমি? আমি স্বন দেখে আমার নুতনশুমার বাগানে।" বিখ্যাত আমত আমত করে বলত, "আর আমি? আমি স্বন দেখে আমার--" কিছুতেই তার মুখ দিয়ে বেরোতে না, "বারিনীকে।" তার পর চলে যেত নিজের ঘরে।

শিকার করতে যায় তারা জানে একদিন হয়তো। বাড়ির হাতে জান যাবে। বিখ্যাতেরেও সে জান ছিল। কিন্তু সে কোথায় করত না। এর পরে তার মনে হতে থাকবে, বাড়ির হাতে নয়, বারিনীর হাতে। সে কোথায় করল না। জীবনে তার এক সজ্জন উপস্থিত হয়েছিল। জীবনের কথা।

খারাপ মেয়ে, স্বশ্র মেয়ে! কেন তোমার আসা? স্বশ্র মেয়ে, খারাপ মেয়ে, কেন তোমার থাকা! বেশ বুঝতে পারিছ বিয়ে এ জীবনে ঘটবে না। অতুলে নেই। কেউ আমায় বিয়ে করতে চাইবে না, যখন শুনবে আমার কী কার্যকারিনী। আমার ভিশজি আমি তোমার অঙ্গ বিজ্ঞান দিলুম। তুমি কি আমাকে নিরাশ করবে? নিরাশ করলেও আমি মরেছি, না করলেও মরেছি। বানিনীর হাতেই আমার জন্য যাবে। তুমি যদি আমাকে শিকার করে তা হলে আমার বোঝা থাকাও মরে থাক।

একবার বিশজি নিজের ইজেছারের থেকে নেমে রানির কোলে মাঝ। রেখে বারামার উপর পা ছুঁড়ে বসল। তিনি তার মাঝে টিপে দিতে দিতে বললেন, "মাঝে কথিতে না? পুরুর ভারলিঙ।" সে তার একবার হাত নিজের হাতের ভিতর টেনে নিল। তারপর কী মনে করে ছেড়ে দিল।

রানি বুঝতে পারলেন এ ব্যাপা মাঝামাঝি। নয়। হোবন বেদনা। এ রকম বে হবে এ তিনি করলেন। করেননি। অথচ না হওয়াই বিচিত্র। রানি তার হাত সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা। করলেন না, পাচ্ছে বিশজি জুটু পায়। নিজের সর্বনাশ না করে বন্ধুকে মেয়েকে স্বামী সমর্ব সেরুক মিতে তার অনিচ্ছা ছিল না। তার বেশি তিনি কেমন করে দেবেন? বিশজি বিয়ে করে না কেন? তিনি কি বাথা বিচেছেন?

এদের কথা খোলাখুলি বলে ফেললেই ভালো। করতেন রানি। বিশ্ব মেয়েশি নঞ্চা তাকে নির্বাক করেছিল। ফেলে বিশজি এক এক করে অনেক কিছু পেল। এক দিনে নয়, অনেক দিনে। সব সহ যখন পেয়েছে তখন চরম সহ কেন বাকী থাকে? এই হলো তার অচির জিজ্ঞাসা। এর উত্তরে পেল অত্যন্তরিত উত্তর। তা হবার নয়। সে বিশাখ করল না যে রানি
যৌবনমালা

আর সব বিচ্ছেদ তিনি ওটুকু দিলে পারেন না। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। ইচ্ছা নেই, তাই বলো। কী করে থাকবে, আমি তো রাজারাজ্ঞি নই। আসমান।

একথা জনে রানি বললেন, “তুমি যখন বিচ্ছেদ করবে তখন আপনি বুঝবে যে তোমার জীব এ জিনিস আর কাউকে দিতে পারেন না। এ কেবল নাথীর জন্য।”

নিক্ষেপ উত্তর। বিশজ্ঞাতের জীব যদি এ জিনিস আর কাউকে দেন তবে সে তার নিজের হাতে ঠাকৃ শুলি করবে। এ জিনিস তো দুর্দশার কথা, কোনো জিনিস না। সে বীর করল যে রানি যা বলছেন তা ঠিক। অথচ তার শিরায় শিরায় যে আশ্বাস অতিহাস তারও তো নির্বাস চাই। তখন তার মনে অবজ্ঞা যে সে আর আশ্বাস করতে পারে না, যদিও জানে এবং মানে তার আশ্বাস করা উচিত।

বিশজ্ঞাতের অভাব বিশাল ও মেয়ের ধারাপ মেয়ে। সে বিক্ষিপ্ত কিছু কম ধারাপ নয়। তা হলে তাদের দু’জনের সম্পর্কের আকৃতি পরিণতি কি? এটা ধারাপের বলে সেইটেই তো হবে। না এটা ধর্মাধারে বলে সেইটে?”

প্রতিলিপিত স্থানে যথেষ্ট হতে যেমন এক মূহূর্তে এলো। যখন না ভেবেচিন্তে বিশজ্ঞ বলল, “রানি, কাল আমি বাগ শিকার করতে গিয়ে নিজেকেই শুলি করব। তুমি সে দৃঢ় সহতে পারবে না। তোমাকে হতে। তোমাকেই যোগ দেবে। সময় ধারাপে তুমি সহরে চলে যাও।”

রানি তা জনে খুশি হলেন। বললেন, “তুমি কি পাগল হয়েছ। এত তৃঃক করলে কেউ আশ্বাস করে।” চলো, তুমিও সহরে চলো। তোমাকে আমি শিল্প নিয়ে গিয়ে তোমার মনের মতো একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব।”

বিশজ্ঞ ও কথা কানে তুলন না। এলেটিয়েটাম গিল। “আমি যা চাই তা আজ রাতেই পাব। নয় তো কোনো দিন পাব না!” কানের প্রতি বলল, “এখন তোমার হাতে আমার জীবন মরণ।”

রানি তার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলেন না। পারের দিকে তাকিয়ে চোখের প্রস্তা ঝুলিয়ে। মৌন সম্ভাবলক্ষণ প্রেমে সে তাকে কাছে তেলে নিল। তিনি ফুল ফুল গুলিয়ে বললেন, “বদুন, তুমি কি আমার সর্বনাশ করবে?”

বিচিত্র হতে বিশজ্ঞ বলল, “রানি, আমি কি তোমার সর্বনাশ করতে
বার্তা! একবার আমার দিকে তাকাও। আমাকে দেখে কি মনে হয় যে
কারো সর্বনাশ করতে পারি। তুমি কাল সদরে চলে যেয়ো। আমার বিচিত্র রাত্রি নয়, তখন তাই হবে।

তিনি তার বুকে মাখা রেখে অনেকক্ষণ কাদলেন। কিন্তু কিছুতেই তাকে দিয়ে বলতে পারলেন না যে সেও তার সদরে যাতে। হুঁজনের একজনেরও চোখে ঘূম ছিল না। অবশেষে বিচিত্র বলল, “বাচি, আমাকে ভরবেলা আগতে হবে, জীবনের শেষের ঘূম ঘূমিয়ে নিই।”

রানি তার রাত্রি চুমো দিয়ে বললেন, “কাল আমি তোমাকে চোখে
চোখে রাখব। কোথাও যেতে দেব না।”

পোরের দিন ভোর হবার আগেই বিচিত্র বেরিয়ে পড়ল জঙ্গলে। রাতে
তার ঘূম আসলেন। সারা অঙ্গে যোনিবজ্ঞাল। শীতল জল এত কাছে, তবু
এত দূরে। তবে কি এ জল নয়, মরীচিকা। খালার মেঘে, হুঁজর মেঘে,
আমি কি তোমাকে চিনতে পারিনি। হুঁজর মেঘে, খালার মেঘে, তুমি কি
আমাকে কেুল বুঝতে দিয়েছিলে। কিন্তু বড় দেখি হয়ে গেছে। আমি
যাম মুখে বলি তা কাজে করি। তুমি সে দৃষ্টি সহিতে পারবে না। বিদায়।

রানি তার প্রসাধন শেষ করে বাইরে এসে শেষলেন বিচিত্র রণ। হয়ে
গেছে। তার চাপা হলো না। তিনি হাতীর কোমল করলেন। হাতী
ছিল তাকে সদরে নিয়ে যাবার হয়ে। তিনি ছাপুম দিলেন, সদরে নয়, সাংবাদ
যে পথে গেছেন সেই পথে চালাও। সে পথ কারো জানা ছিল না। সাংবাদ
তো কাউকে বলে দানেন। ঘুরতে ঘুরতে রানির বেল। হয়ে গেল। ঘুর থেকে
কানে এলো। বন্ধুকের আওয়াজ। দিক নির্দেশ করে তিনি হাতী ছুটিয়ে
দিলেন। গেছে রথে। জীবনপীত কিনে গেছে।

এতেন করে তার যোনিবজ্ঞাল অবসান হলো। বেচারা বিচিত্র।
রানিকে বাচাবার অর্থে সে একথান। চিঠি লিখে বেঁধে গিয়েছিল তার ঘরে।
ফিরে এসে রানি সেখানে অবিভক্ত করলেন। জানিনে কি ছিল সে চিঠিতে।
রানি সেখানে কুটি কুটি করে ছিড়ে অগ্নে ফেলে দিলেন।

৪

মোরের অবানবন্ধী শেষ হলো যখন, তখন মেয়েদের সকলের চোখে
জল। পুরুষদের কারো মুখে কথা ছিল না। ঘোষাল তো ছোট ছেলের মতো।
গালে হাত রেখে জন্মিল। বেদর হয় ভাবছিল অমন মাঝারের এমন পরিস্থি
কি সত্যি?

“সেই রানি তার পরে কী করল?” জানতে চাইলেন মিসেস মৌলিক।

“রানি তার পরে সম্বন্ধনী হয়ে গেলেন। তার গলার গোলকোণ্ডার
হীরের হার খুলে দিলেন সিডিভি সোজনের মেমসাহেবকে। তার পাঁচ রকমের
মণি বসানো। পাঁচ আঙুলের আংটি পরিয়ে দিলেন পুলিশ স্পারিস্টেটেন্টের
মেমসাহেবকে। তার প্লাটিনামের ব্রীজলেট দিয়ে দিলেন ফরেস্ট কর্নার-
বেটের মেমসাহেবকে। তা বলে বিখ্যাতের অধ্যক্ষ কর্ষাদীরের জ্যৌরের
বক্তি করলেন না। তাদের বিলিয়ে দিলেন নাকে ও কানে পরবার যুদ্ধ রকম
অলঙ্কার। আন শাড়ীগুলো খুবারা করলেন চাকরবাকরদের জানানাদের।”

“তার পরে?” এটা করলেন মৌলিকের বোন মিসেস গোবাল।

“তার পরে?” সেপ্টেম্বর কমিশনারের তো মেমসাহেবের নেই। তিনি
চিরকুমার। তিনি হাই বাড়িয়ে দিলেন। তখন রানি গিয়ে মৌলাকাং
করলেন লাটসাহেবের প্রাইভেট" সেক্রেটারীর মেমসাহেবের সঙ্গে। খবর
এলো। সেপ্টেম্বর কমিশনার জরুরে সেক্রেটারী হয়েছেন। অবশেষ পরবর্তী।

এর পরে মহিলাদের কৌতূহল লক্ষ্য হলো না। মনিমোহন বললেন,
“সেন, তোমার ঐ রানি মোটেই ভালো। মেয়ে নয়। যা দিতে পারে না তার
অস্তিত্ব দিয়ে ছেলেটাকে বাবুরন্দণা নাচিয়েছে। ছেলেটা যে মারা গেল তার
জন্য দায়ী তোমার রানি।”

“আমার রানি! বেশ, ভাই, বেশ।” এসেলে মহিলাদের দিকে
তাকালেন। “কিন্তু রানি যদি খারাপ মেয়েই হতো, যা দেবার নয় তাও মিল।
তা হলে এই ট্রাজেডী ঘটত কি?” তিনি আগুল করলেন।

দেখা গেল রানির বিক্রমে রায় দিলেন একজন কি ছুঁজন বাঙ্গার আর সব
পুরুষ। আর বিখ্যাতের বিক্রমে মহিলারা সবাই।

(১৯৫০)
দুরের মানুষ

সালটা ১৯৪৭। মালটা অক্টোবর কি নভেম্বর। দিনটা বেশ পরিস্কার ছিল। কিছু বেলা ছোট হয়ে আসছিল। দাজিলিং থেকে শিলিগুড়িতে নেমে দেখি আকাশ থেকে অন্যকার নেমেছে।

প্ল্যাটফর্মে দাজিলিং ছিল দাজিলিং মেল। খুঁজে বার করলুম আমার নাম। একটা ছোট কামরায় দুই ঘাটার বার্ষক নাম। নীচেরটা আমার, উপরেরটা খালি। আমি আমার জনিপন্থী নামিয়ে রেখে বিছানা। পেতে দখল নিচু এমন সময় একজন রেলওয়ে কর্মচারী ও জন। দুই ইঞ্জেলিং এসে উপরের বার্ষকতায় একটা স্তুতিকে চালিয়ে দিয়ে গেলাম। তাদের একজন আমার সহায়তা হবেন, তা তো বুঝলুম, কিন্তু কোন জন তা ঠাহর করতে পারলুম না।

গাড়ি ছাড়তে তখনো অনেক দেরি। প্ল্যাটফর্মে নেমে ঘোরায়ুড়ি করতে লাগলুম। বিছানাটি টেন। বছ লোক ফিরছেন। ভিড়ের মাঝখানে চেনা মূখু ও নজরে পড়ে। কালিম্পাং থেকে ফিরছেন শ্রীমূর্ত রামনীশ্বর ঠাকুর। তার সঙ্গে ছেলেমের ও চাকর। চেনা নামের কার্ড দেখলুম কয়েকটা কামরায় বাইরে আট। কিন্তু মানুষের সান্তা পেলুম না। বেশ হয় তারাও আমার মতো পুরছেন। কুশল বিনিহক করে, শেয়ালদায় পুনর্জন্মের প্রতিক্ষী দিয়ে ও নিয়ে নিচের কামরায় ফিরছি এমন সময় চোখে গড়ে সেই দু'জন ইঞ্জেল প্ল্যাটফর্মের একটি স্তুতিকে কথা বলছেন ও ধূমপান করছেন। কাছে আমার কেউ নেই।

ধূমপান বললুম, কিন্তু তাদের ভাবভঙ্গি থেকে অনুমান করবার বেশি কারণ ছিল তারা আমি কিছু পান করছেন। প্রকৃতিতে অন্যায় কোনো দুজন ইঞ্জেলিংকে একটা মশলা হয়ে চড়া গলায় কথা বলতে দেখিনি বা জনিনি। বার বার তারা বিঘাস নিচু, হাতে হাত রাখছেন, হাত নাড়ছেন। তারপর আমার জমে উঠেছেন। কথা যেন কিছুতেই ফুরায় না। মনে হলো। একবার কি দু'বার পরস্পরকে চূর্ণ করলেনও।

অবশেষে টেন চলতে আরম্ভ করল। তখন তাদের একজন লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠলেন ও অপর জন ঘন ঘন কমাল নাড়তে থাকলেন। আমার সহায়তা ফিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে থেকে তারপরে মরজার কাছ
থেকে সরে এলেন। আমার অশ্নমতি নিয়ে আমার পাশে বসে বললেন, 
“কলকাতা যাচ্ছেন, অন্যমান করি?”
আমি বললুম, “হা।”
“আমি যাচ্ছি কলকাতা হয়ে লাগচার। সেখান থেকে রাওলপিডো।”
কথায় কথা বাড়ে। ভৌলোক আমাকে সিগারেট অফার করলেন।
আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলুম। মাফ চাইলুম। তখন তিনি একাই
ধুমপান করতে লাগলেন। কই, মনে ভো হলো না যে তিনি আর কিছু পান
করেছেন। দিব্যি প্রকৃতপ্রকার ভাব। পানীয়ের গন্ধ নেই।
আমি অবাক হয়ে নিরীক্ষণ করছি তার হাতেহাত, অত্যন্ত করছি খুঁজ
সিগারেটের গন্ধ, আর চিন্তা করছি যা দেখছি তার তাঁপথ কী। এমন
সময় তিনি আপনা হতে বললেন, “সকাল বেলা আমি শিলিগুড়িতে নামলুম।
সন্ধ্যাবেলা শিলিগুড়ি ছাড়লুম। এই বারো ঘটা আমার জীবনে চিরকালীন
হয়ে ধাকবে।”

আমি আশায় চিল ছড়লুম, “হা, দাজিলিং থেকে কাকনজং দেখা
চিরকালীন বটে।”

“না, না। আমি সে কথা ভেবে বলিনি।” তিনি মাথা নেড়ে বললেন,
“না, না, আমি কাকনজং দেখতে দাজিলিং যাইনি। এমন কি, দাজিলিং
শহরটাই দেখা হয়নি।”

“তা হলে —” আমি প্রশ্নচুক্তি দৃষ্টিতে তাকালুম।

“তা হলে?” তিনি আত্মা আত্মা বললেন, “আমাকে যিনি বিদায় দিতে
এসেছিলেন তিনি আমার দাদা।” বিশ বছর আমাদের দেখা হয়নি। এবারেও
হতে না, যদি না মুখ একটা আশ্চর্য ঘটায়ে ওঠত।”

বলতে বলতে তার কথার স্বরে উতেজনার আমেজ এলো। এমন এক
বড় একটা অতিক্রম তিনি চেপে রাখতে পারলে না। তাঁর সংহলের বাঁধ
ভেঙে যাবার মতো হয়েছে।

“গুনগুন! আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে তিনি বলে চললেন,
“সকালে যখন শিলিগুড়িতে নামি তখন কেবল এইটুকু জানতুম যে আমার
কাঁথা থাকেন দাজিলিং জেলার কোনো। এক চা বাগানে। চা বাগানের নাম
আনিন। কী করে যেতে হল সেখানে তাও আমার অহান। হতে সময়ও
নেই। আশ্বেকের টেনে না ফিরলে আমার ছুটি ফাটিয়ে যায়। টেলিগ্রাম
দুরের মায়ক্ষ

করে ছুটি বাড়িয়ে নেবারও উপায় নেই। রাগলিপি এখন অন্ত রাখে।
তা ছাড় মিলিটারি কর্তারা। এসব ক্ষেত্রে ছুটি বাড়িয়ে দেন না, বরং শাস্তির ব্যবস্থা করেন।
সেইসংক্রান্ত বলবলিনুম, দাদার সঙ্গে এবারেও আমার দেখা
হতো না, যদি না খুব একটা আন্দোলন ঘটনা ঘটত। আগেই বলেছি বিশ বছর আমাদের দেখা। হদরি।

তারপরে তিনি শেখালেন কিছু করে তার লাগার সঙ্গে তার দেখা
হল। 
“ভাবলাম দারিংলিং শহরে গিয়ে সেখানকার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে খোঁড়া
করা যায়।” তা হলে অন্তর্গত দাদার ঠিকানাটা গাওয়া হবে।
অন্তত তিনি জানতে যে আমি তার জন্য এত দূর এসেছিলি।
এবার দেখা না হলে আবার করে দেখা হতো কে জানে! আমাদের রেজিমেন্ট ঘর্মালের মধ্যে
ভারত হাড়ছে। আর এদেশে ফিরবে না। আমরা ব্রিটিশ আমির লোকেরা,
চিরকালের মতো ভারত ছেড়ে যাচ্ছি। আপনারা আমাদের চান না।”

ওটুকু অভিমানের কথা। আমি ভর্তা করে বললুম, “এর ফলে ব্রিটেনের
সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক চিরকালের মতো মধ্যম হবে।”

“নিশ্চয়। নিশ্চয়। আর আমাদের রণভূ নেই।” তিনি আবার পূর্ব
প্রদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। “এবার দেখা না হলে আর হতো না। অনেক দিন
পর্যন্ত। কে জানে হয়তো। আমার বিশ বছর। আমরা ব্রিটিশ আমির লোকেরা,
বিশ্বযুদ্ধ ঘুরে বেড়াই। ছুটি পেলে দেশে যাই, দারিংলিং বা কলকাতার আস।
হয়ে উঠে না। দাদার যখন ছুটি নিয়ে দেশে যায় তখন আমি হয়তো। ছুটি
পাইন। এবার ভারত ছেড়ে চলে যাচ্ছি কিনা, দিন করেছে। ছুটি নিয়ে
কলকাতা এলুম মা’র সঙ্গে দেখা করতে। তিনি পাকেন কলকাতাই, দাদা
’থাকেন চা বাগানে।”
কিন্তু এমনি ব্যাপারে আমি, দাদার ঠিকানাটা মা’র কাছ
থেকে নিয়ে টেলিগ্রাম করে আসতে খেয়াল হয়নি। শিলিগুড়িতে দেখে
খেয়াল হলো। যে ঠিকানাটা আমার কাছে নেই, মা’র কাছেই রয়ে গেছে।
কী মুখকলি।”

তিনি তার কাহিনীর থেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিছুক্ষণ ভেবে প্ললেন,
“হা, টাকসিওয়ালাকে বললুম, চলো দারিংলিং। টাকসি চলল। আগে
কখনো এ দিকে আসা হয়নি। বেশ লাগছিল আকাশকারা রাস্তা দিয়ে পাহাড়ে
উঠতে। চা গাছ দেখলেই মনে হচ্ছিল এইবার দাদার বাগান আসছে।
কে জানে হয়তো। হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।” তারপর হলো কী,
গন্নেন? উটে দিক থেকে একখানা মোটর আসছিল। সক অপরিসরণ রাখা। মোটরখানা। সেই আমার পাশ দিয়ে যায় আমি সংকেত করে বললুম, একটু ধাম। আমার ট্যাক্সিওয়ালাকে বললুম ধাম। মোটরের আরোহী ইউরোপীয়। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, আঁখা, ভাগ্যক্রমে আপনি কি জর্জ হাচিন্সন নামে এজন্য চা বাগানের সাহেবকে চেনেন? তিনি তাড়িৎস্পৃষ্টের মতো বলে উঠলেন, কে ও কথা বলছে? জ্যাক? অপরিচিতের মুখে নিজের নাম হলে আমি ভালো করে চেয়ে দেখলুম। একই কথানা সংগ্রহ যে এই লোকটি আমার দাস? লোকটিও আমাকে ভালো করে দেখলেন। দেখতে দেখতে তাঁর মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। আসারও, ধূংসেই গদ্য থেকে নামলুম। নেমে পরম্পরকে আলিঙ্গন করলুম। কে আমার কর্তক্ষণ কেটে গেল এইভাবে। তারপরে অপরের হর্ষ ঝল্লা চীৎকাশ হলো। জর্জ আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে তাঁর চা বাগানের দিকে চললেন। ট্যাক্সিকে বকশিস দিয়ে বিছানা করলেন। তাঁর বাগানে গিয়ে সারা দিন হুক করে বাধায় দিলুম। এখানে মনের তিনটি তার জের চলতে। আমরা যেন বিষ বছর আগে ফিরে গেলুম। জর্জ আর আমি। তাঁর দুই অতি চমকার মেয়ে। তাঁর বাস্তবারও কী অনন্যময়। কিন্তু আমাকে গেয়ে জর্জ ওদের তুলে গেলেন। শুধু তাই আর ভাই। আলোক গ্রাণ। বলতে পারেন জগতে অভাবের মতো আর কী আছে? এইটেই বোধ হয় একমাত্র সম্পূর্ণ বোটা গোলো। আনা নিস্বার্থ। আমি মুখ হয়ে গন্নেন। মনে অনেক কথাই জাগেছিল, কিন্তু হতাশ হলুক করার মতো অন্তরঙ্গ তথ্যেন গড়ে ওঠেনি।

বললুম, “তারপর?”

“তারপর?” তিনি সর্বনা করে বললেন, “তারপর আমার বিদায়ের সময় আসল হলো। জর্জ জানতেন এটা অবশ্যই। ছুটি বাড়িতে নেবার বিদায়ের অনুষ্ঠান নেই। আমাকে ঘুঁষি করাই হলো তাঁর একমাত্র ধ্যান। ত্রীয়ে আমার জন্মে কিছু করতে দিলেন না, নিজে সমস্ত করলেন। চাঁদের পট থেকে চা চেয়ে তাঁর মতো তাঁর যায়। সঙ্গে দিলেন বাগানের বাছাই করুন। সেই চা পাতা। নিজের হাতে গাড়ি চালিয়ে গেলেন দিয়ে গেলেন শিল্পিয়ে। সিঁপাতের বিঢ়ে কুঁড়ে গলায় জিরিস যা কিছু পাওয়া যায় অর্থায় দিয়ে আমাকে বলতে থাকলেন। আমি যে বিষ বছর পরে এসেছি, বিশ্বাসঘাতক।
টিমিতের মধ্যে অনুষ্ঠ হয়ে যায় এই ভাবনাই তাকে অশির করেছিল। আমি জানতুম আমার নিম্নিতি আমাকে টানছে, সেইজন্যই অতটা অশির হিন্দু। নইলে আমিও কিছু কম সেটিসেটাল বোধ করিনি। জগতে আত্মস্বরূপের মতো আর কিছু কি আছে? মাই বাণ্ডার! ও মাই বাণ্ডার।”

ভললুম নিঃশব্দ হয়ে আবেগ ধমনি করতে লাগলেন।

আমিও নিশ্চিন হয়ে তার প্রেরের উত্তর ভাববিলুম। আত্মস্বরূপের মতো কিছু কি আর আছে? তাই মনি হবে তবে আমরা হিন্দু মুসলমান শিখ এমন করে আলাদা হয়ে গেলম কেন? পূর্বে কি আলাদা হওয়া? লক্ষ লক্ষ ভাই ভাইয়ের হাতে খুন হয়েছে, হাজরার হাজার বোন ভাইয়ের ঘারা ধসিত হয়েছে। হা বিদায়! ইংরেজ আমাদের ভাই নয়, পর। সে কি কোনো দিন এমন শব্দ করছে?

বললুম, “ভাইয়ের মতো বন্ধু আর নেই। ভাইয়ের মতো শক্রও আর নেই।”

তিনি চমকে উঠে রখালেন, “কি মনে করে ও কথা বলছেন?”

যা ভাববিলুম তা খুলে বলতে হলো। একই পরিবারে এক ভাই শিখ হয়েছে, আরেক ভাই মুসলমান, আরেক ভাই হিন্দু আট বা রাজপুত। এ রকম দৃষ্টান্ত একটা হুটো। নয়, শত শত সহস্র সহস্র। শত শত বছর পরে এই ব্যাপার চলছে। তথাপি—

তিনি বিশ্বাস হয়ে বললেন, “বুঝেছি আপনার ব্যবহার। পাঞ্জাবে থাকি, দেখেছি তো সব নিজের চোখে। ও এমন বীভৎসতা আমি জীবনে দেখিনি। বিশ্বাস করে আমাকে, পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশে আমি লড়েছি, যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহত। আমি হাড়ে হাড়ে যান। কিন্তু পাঞ্জাবে যা দেখলুম তার তুলনাই হয় না। একেবারে অন্য জনিম।”

তার মুখে শনলুম চৌদহই অগাস্টের পরবর্তী ইতিহাস। সে অনেক কথা। সব মনে নেই। মনে তো সব কথা সংগ্রহ করতে রাজি হয় না। এত স্থান কোথায়! তা ছাড়া যা বিষাক্ত, যা হিংসা, তার প্রতি আমার মন বিমুখ।

বললেন, “একটা অভিজ্ঞতার কাহিনী অনন্দ। এটাতে আমার কিছু দোয় ছিল। তার জন্য আমি লজ্জিত এবং দুঃখিত। আমাদের রেজিমেন্ট আর হুমায়ের মধ্যে করাচীতে আহার ধরে এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আগে
ঝেড়ে হিসাব নিকাশ করে পাওনাগুলো চুরিয়ে দিয়ে যেতে হবে। তার পড়েছে আমার উপর। কয়েক মাস ধরে আমি খাটি। আমাকে সাহায্য করতে গায়ে এমন লোক বেশী নেই। সেই জুটি আমি হীরালালকে ছেড়ে দিতে বাজে হিসাব নিনি। চৌদ্দই অগাস্টের জুটি দিন আগে সে এলে আমাকে বলল, ওন্নি ভীষণ কাও হবে। পাকিস্তানে হিন্দু বলে কেউ থাকবে না। আমাকে সুটি দিন, সময় থাকতে আমি হিসাব চলে যাই। আমি বললুম, হীরালাল, তুমি যদি আমাকে সাহায্য না করো। আমার হিসাব নিকাশ করা হবে না। সময় থাকতে আমি ভারত হাড়তে পারব না। রেজিস্টেট আটক। পড়বে। আমাদের হাজি কামান্দু তা সহ করবে না। হীরালাল, তোমাকে আমি অভিয় দিছি। আমি থাকতে কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পারব না। কাজ সারা হল। আমি গ্রাস তোমাকে নিরাপদে হিসাব চলে যাবে দিয়ে আসব। সে বিশ্বাস করল আমার কথা। কিছু তার পরিবারের লোক বিশ্বাস করল না। করবে কী করে! চৌদ্দই অগাস্টের দিন থেকে যেবাস কার ঘটতে থাকল সেসব তা তাদের চোখের উপরেই। তারা হীরালালকে এক মূর্তি পাছিল দিল না। হীরালালও দিল না আমাকে। একদিন সে এলে আমাকে বলল, একটি কন্ধ যাচ্ছে কাশ্মীর। কাশ্মীরে আমাদের ব্যবহার হচ্ছে। অন্যতম দেন তো। আমরা সেই কন্ধের সঙ্গে কাশ্মীর যাত্রা করি। একবার সেখানে যদি পোুঁচিয়ে পারি তা হল আমরা নিরাপদ। আমি বললুম, আচ্ছা, কিছু একটি শর্ত। তুমি নিজে তাদের সঙ্গে যাবে না। নেতারূপে তাদের। কিছু রাজি হবে গেল। কন্ধ রাখল হল। পরের দিন ভোর বেলা। ছুপুরের দিকে আমার কাছে বললে এলো—ও সে এক রেজিস্টেট ব্যাপার।

তিনি কিছুক্ষণ কথা বলতে অক্ষম হলেন। তার মুখের উপর করাল কান্না ছায়।

আমাদের গাড়ি হাড়াল জলপাইয়েড়িতে। লোকজনের সোরগোল বন তিনি একটি চাকলা বোধ করলেন। ধীরে ধীরে তার ভাষা ফিরল। কান্না ছায়াটা সেরে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তারপরে কী হলো?"

"তারপরে যৌজ নিয়ে জানতে পাই কন্ধের অবশিষ্ট চলিশ ধুঘাছ অন প্রান নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে। প্রাণ ছাড়া বিশেষ কিছু বাকী ছিল না তাদের। এমন অস্থি হয়েছে যে তাদেরের অসাধ্য। কন্ধের ছিল প্রায় ধূঘাছো।
নাম হিন্দু ও নিয়ে। তাদের বেশির ভাগ হিন্দু ও মুসলমান। যে মিলিটারি এসকার ছিল সকল। আর মাইলস তার আট ধারার পর তারা বাতির গাঁথা যে কুড়ুল আর বেলচা আর অরাজস্থ হাতিয়ার হাতে মুসলমানরা আগছে। কাছার করে কোনো ফল হলো না। বরং তাদের রোথ বেড়ে গেল। কন্ধুকে ষামিরে তারা এমন বেপাকায় ভাবে চুন এর আখায় চালালে। যে মিলিটারি এসকার দাকরমতে এই পেটে হলো। তারা পিছু না হটলে চুক্কাটা হয়ে। পিছু হটতে হতে তারা অবশিষ্ট জীবিতদের নিয়ে রাগুলিপিত পৌছুয়। এর জলে ডুপুটি কমিশনার বিশেষ অনুস্মরণ। তাই তো দায়িত্ব। চমৎকার মাহরি মিটার।—মুসলমান হলে কি হয়, সাদাচারিকতার ধার ধারেন না।”

ডুপুটি কমিশনারের প্রথম চল। তুলে গেলেন হীরালালের কন্ধুকের কথা। মনে করিয়ে দিতে হলো।

“হা, যা বলছিলুন। বেচারা হীরালালের সে কী কাটা। তার মা সাংঘাতিক অতভাব। মাধার ঘুরে দিকের হয়েছে কুড়ুলের অবাদত। তার বোধিদিদি মারা গেছেন। বোধিদির শিক্ষা সমাপনারও বৃদ্ধি। বলল, সাহেব, তোমার অস্তো আমার পরিবারের লোকের এ দশা। তুমি বড় আমাকে যেতে দিতে তা হলে কি এমন হয়। আমি বলিয়াম, হীরালাল। তোমাকে আমি যেতে বিচিত্র তুমি ও কথা বলবার অস্তো বেড়ে আছ। সেই তুমিও কাটা গুলে। বরং আমার অস্তোতপ হচ্ছে এ কথা তোমার কথা, কেন আমি তোমার অস্তীয়েরও আত্মীকরিতে কেন তোমার অস্তোতপ সে তাদের যেতে দিয়েছি। হীরালাল, যাও, তোমার কর্ম্য করো। পুরুষের জীবনে অন্য কথা আছে। কাছার করা পুরুষের কাছ নয়। চলো, তোমার মায়ের চিকিত্সার ব্যবস্থা করেন হচ্ছে সে বার যাক। অন্যান্যের অন্যের বাবাদের ব্যবস্থা দেখতে হব।’ তোমাকে আমি কথা বিচিত্র হচ্ছি বাবার আমার। ডুপুটি কমিশনারকে সে তার দেব না। যদি হীরানের পরে আমি নিজে এরোরে করে তাকে নিজে পৌছে দিয়ে এলুম। এই তখন তার কি অন্যদল।”

আমি জানতে চাইলুম রেলপথ এখনো খেলা আছে কি না।

টেন ততক্ষনে জলপাইগুড়ি ছেড়ে আবার মুখ দিয়েছে। খেয়াল ছিল না কখন। তিনি আমার এখন চুনে বললেন, “না, মাঝামাঝি কথক
রাজ্য নির্মাণ নয়। এক রাজ্যের ছেন আরেক রাজ্যে প্রবেশ করে না। অকাশগতীয় রাজ্য চলচ্ছে। আমিও অকাশগতীয় ফিরব।

আমি বললুম, “আমরা কিছু রেলগতীয় রাজ্য থেকে। এই ছেন চট্টগ্রাম পাকিস্তানের বিভাগ দিয়ে বাংলাদেশ যাবে। রেল হয় ইতিমধ্যে পাকিস্তানের সীমানা সরভার হয়ে এটি এখন পর রাজ্য।”

“এদিকে যে ছেন চলচ্ছে এই একটা দৌড়ায়। ওদিকে তো ছেনই ভালো করে চলচ্ছে না। চলবার মধ্যে চলচ্ছে শরণার্থী স্পেশাল ছেন। তাতে গভর্নমেন্টের বাড় নেই। যাতে লাভ হয়, সেনে প্যাসেঞ্জার ছেন, শুভস ছেন, এসব ছেন চললে তো রেল লাইন চলু রাখা গোষ্ঠী। এখন মার্ক একবারও ছেন রাওলিপিত দিয়ে গেল না। শরণার্থীদের স্পেশাল ছেন বাজ। বিভাগ মার্ক গেল একবার মার্ক মালিগাড়ি। আমন করে কি একটা রাজ্য চালানো যায়? রাজ্য চলে ব্যবসায়ীদের আয় দেয়।”

আমি এই কথা জানতুম না। বিষ্ণুত হয়ে বললুম, “তা হলে আপনার দরকারী সংস্থাগুলো পাচ্ছেন কি করে?”

“পুরোনো কিছু ছিল। তারেই কোনো রকমে চলছে। বাজারেদের উপর নির্ভর করলে অচল হতে।”

“আপনাদের কিছু আছে। কিন্তু সাধারণের তা নেই। তাদের অবস্থা?”

“তাদের অবস্থা অপরিচিত। ছেনের দরকার হলো। ভালু হাতে চলল দেহাতে। গিয়ে বলল, ও ভাই, দিতে গাড়ো এক পোশা ছু? শহরে বেল থেকে সকালে বিকেলে ছু পাড়ো, সে ভরসা নেই। চার্যের ছু অঞ্চল শহরের বাজারে যেতে হবে।”

“আমি বললুম, “এ ভো বেশ মজা!”

তিনি বললেন, “মজা।” মজীর কথা যদি শুনতে চান তো আমার একটা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করি। আমাদের বিপ্লবিয়ারের বেয়ারা থাকে আপনাদের এই বাংলাদেশে। পূর্ববাস না পশ্চিমবাস, ঠিক জানিনে। মনিসাল্টার করে তাকে একরা টাকা পাঠাতে চাইলেন শেষ দান হিসাবে। ডাকঘরে মনিসাল্টার নিয়ে না। রাওলিপিত থেকে মধ্য দিয়ে পোশা আসি তখন বিপ্লবিয়ার আমার ছু একবারা একরা টাকা নেট দিয়ে বললেন দিয়ে থেকে মনিসাল্টার করতে। বিপ্লবীর ডাকঘরে মনিসাল্টারের কর্ম পুরনো করে যেই নোটখানা। বাড়িতে দিয়ে মনিসাল্টার অর্থনীতি গুরা বলল, এতে লাঠোর ছাপা রয়েছে। এ নোটা এ রাজ্যে অচল।
দুরের মানুষ

অন্য নোট থাকে তো দিন। অন্য নোট ছিল তা আমার পাঠের। মনিব্যায় করল হলো না দিলো। সেদিন দিনের কাছে একটা ডাক্তার নোটখানা লুপ্ত বিদায় করতে। ছোট ডাক্তার। কোম্পানী হয়তো অপ বোঝ খবর রাখে না। হয়তো নোটখানা রাখবে। বেশ খাতির করে একখানা মনিব্যায় ফর্ম দিল আমার হাতে। আমিও বেশ খাতির করে বললুম, এই মনিব্যায়-খানা দিয়ে করে পাঠের দিতে আজ্ঞা হোক।

আমি কোনোতের হয়ে ব্যাখালুম, “তার পরে?”

“তার পরে বাজিয়ে দিলুম সেই একখানা টাকার নোটখানা। ছোট মাদারটি সেখানে নিয়ে আরেকজনকে দেখাল। তিনি বোধহয় ডাক্তারের বীরত্বিত। উঠে এসে বললেন, খুব জানি হলুম। এ নোট তো এ রাশ্যে চলবে না। আমি অগ্রতর হয়ে নোটখানা পকেটের করলুম। তারপরে সেখানের পাস করার জন্য আরে দু'এক অবকাশ চেষ্টা করেছি। কেউ সেখানে ছিলেও নেবে না। এই হলো আপনার দিশা তাব করার মন।” কোনোকোরা আমার মতো বিশেষ মানুষের উপর দিয়ে না হলেই ভালো হতো। এখানে সেখানে আমার পকেটে যেচে। কাল কলকাতায় পৌঁছেই সেটার একটা সুদৃঢ়তির উপর খুঁজতে হবে। নয়তো চলে ফিরে আমার সঙ্গে রাওলিনি। বিচিত্রিত অবশেষ খুশি হবেন না। ভাবেন আমারই গাফলি। সময় থাকলে বেয়ারাখে টেলিফোন করে কলকাতায় আনিয়ে তার হাতে নোটখানা দোরে দিয়ে। আপনি একটা পরামর্শ দিয়ে পারেন?”

আমি টাকার বিস্তার ব্যাপারে অনাথতা করেতে পরামর্শ দিলুম। তিনি ঘটনাবাদ দিলেন।

তারপর আমাদের গলা ওজনের পুঁজি ফুরিয়ে এলে। রাতেও হয়েছিল। কাপড় ছেঁড়ে বে যার বার্ষে গা মেলে দিলুম। ছুঁজনেই ফাস। যুবমীয়ে গড়তে মাথারর লাগল না।

যুব বাঙাল তখন দেখি সেটা রাণাটি স্টেশন। কখন এক সময় পাকিস্তান অতিক্রম করে এসেছি। আর যুব এলা না। বলের হলো। রাতের পোশাক ছেঁড়ে লিনের পোশাক পরলুম। কোনো মতে বাড়ি কামিয়ে নিলুম। তিনিও প্রতীয় হলেন। তারপর আমার আমার বার্ষে আমার অন্ধকার নিয়ে বলেন। লিনের বেলা যদিও অন্ধকারের অবশ্যক করে না।

“তা হলো চলে এলা আপনি রাওলিনি?” বিদায়ের হয়ে বললুম।
“হা, কলকাতা থেকে দিল্লী। সেখান থেকে লাভের হয়ে রাগলপিতু। কিন্তু একটা ভাবের কথা তারাছি। কাল আপনাকে বলতে তুলে গেছি যে দিল্লী লাভের এরোপেন সাবিত্র বোধ হয় বন্ধ হয় এবং আজকালের মধ্যে।

তা যদি হয় তা হলে আমাকে স্পেশাল গ্লেন ভাড়া করতে হবে। তাও পাবকি না কে জানে! দিল্লীতে আটকা পড়ব কি না ভাবছি।”

(১৯৫০)

সমাপ্ত